শহিদের মা

সলিল ভট্টাচার্য

‘‘রাত যে শেষ হতে চলল। কই, বুবুন তো এখনো ফিরলো না। বউমা, গেটের আলোটা নেভাওনি তো? অন্ধকারে খানা-খন্দ সাপ-খোপ কত কী-ই না আছে। বুবুন রে, কোন্ সকালে বেরিয়েছিলি, সারাদিন দু-মুঠো জোটে নি নিশ্চয়ই, বাড়ির কথা ভুলে গেলি বাপ্? তোর সঙ্গে হরেনও তো ছিল। দুপুরে এখানে বাড়ি ফিরে খাবি বলে পোস্তর বড়া, মাছের টক রান্না করে হা-পিত্যেশ করে বসে রইলুম। বুড়ো মা-টা তোদের খেতে না দিয়ে কেমন করে খায় বল্? ও বউমা, ওরা নিশ্চই বাইরে যা হোক্ খেয়ে নিয়েছে। তুমি বাপু আর উপোস করে থেকোনি।’’ আপন মনে একটানা কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে ডুকরে কেঁদে উঠছিল বুবুনের মা। সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। নির্মল ডাক্তার এসে ঘুমের বড়ি দিয়ে গেলেও শোভারানী খেতে অস্বীকার করে। নাতনি সংহিতা বারবার বলে—‘‘ও ঠাম্মা, ডাক্তার বলেছে ওষুধটা না খেলে তোমার কষ্টও কমবে না, ঘুমও আসবে না।’’ ‘‘তোর ডাক্তারের নিকুচি করেছে। বুবুন হরেনরা এখনো ফিরল না কেন—একটু ফোনটোন করে জানার চেষ্টা করিছিস্? আর বৌমা, তোমরাই বা কী বলিহারি আক্কেল—দু-দুটো মানুষ বাড়ি ফিরে খাবে বলে এখনো ফিরলো না, আর তুমি কাঠ হয়ে বসে আছো?’’ বুবুনের বৌ অঞ্জনা আর তার মেয়ে সংহিতা ভালোভাবেই জানে যে এখন শোভারানীর যন্ত্রণা, ভুল বকা, স্মৃতি-বিস্মৃতির ঢেউ উঠতেই থাকবে। এর কোনো উপশম নেই। অঞ্জনার স্বামী আর সংহিতার বাবা বুবুন যার ভালো নাম সাগ্নিক, আর অনেক আদর-শ্রদ্ধা ভালোবাসার মানুষ হরেন জেঠু—এরা যে আর ফিরবে না, সে কথা সবাই জানে। অঞ্জনা শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিল। সবাই যখন কাঁদছে, তখন তার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়েনি। কী এক নির্মম বাস্তবতার অগ্নিবাষ্পে তার চোখের জল যেন শুকিয়ে গিয়েছিল। সে আর হরেনদাদার বৌ শেফালি গলা জড়াজড়ি করে প্রায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায় রক্তের অক্ষরে যেন সত্যের রূপ দেখে নির্বাক আর নিষ্কম্প বাতির মতো। অথচ না কাঁদলে এত বুকভরা যন্ত্রণা হয়তো তাদের উন্মাদ করে দেবে। সাগ্নিকের আদরের মা-মণি সংহিতা মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে। আবার যখন পরিচিত অপরিচিত বর্ষীয়ান মানুষরা কিংবা কাকী-জ্যেঠি-পিসি-মাসি স্থানীয়রা, তার বাবার আপনজন কাছের মানুষরা তাকে নানাভাবে যেন একটা শোক আর সান্ত্বনার বলয়ে আশ্রয় দিচ্ছিল, তখন তার ঠোঁট দুটো কঠিন প্রত্যয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। মনে মনে বলছিল—তোমাদের রক্ত ব্যর্থ হবে না।

এরপর ক্ষতবিক্ষত দুটি মৃতদেহ, পুলিশি পরিভাষায় যাকে বলে ‘লাশ’ যখন তাদের সামনে নিয়ে আসা হল, তখন সংহিতা এক ছুটে সব বলয় ভেদ করে মাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। অঞ্জনা আর শেফালি আর নিজেদের

সামলাতে পারল না। তাদের কান্নার রোলে সব সান্ত্বনা, সব সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল। অবস্থা দেখে মুহ্যমান একজন সহমর্মী বললেন—''আমার লর্ড টেনিসনের সেই ইংরেজি কবিতার কথা মনে পড়ছে—'Home They Brought Her Warrior Dead'। শোকে পাথর স্ত্রীকে কাঁদাবার জন্য কত চেষ্টা—কিছুতেই এক ফোঁটা জলও পড়ল না। তারপর যখন তার সন্তানটিকে কোলে বসিয়ে দেওয়া হল, তখন সেই বীর যোদ্ধার স্ত্রী সশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়ল।'' কিন্তু এর পরে সেই যোদ্ধার স্ত্রী কান্নার সঙ্গে বলেছিল—তোর জন্যই বাঁচতে হবে বাছা (Sweet my child, I live for thee)। পাশ থেকে অস্ফুটে আর একজন কথাটা মনে করায়।

সেই দিনটার কথা কেউই ভুলে যায়নি। সরকার পরিবর্তনের পর চারপাশে তাণ্ডব শুরু হয়েছে। দেওয়াল-লিখন ছিল—'বদলা নয়, বদল চাই।' আবার কোনো কোনো দেওয়ালে এর পাশাপাশি বন্দুক-রিভলবার-পাইপগানের ছবিও আঁকা হয়। সেগুলো সম্ভবত এখনও মুছে যায়নি। তবু ভয়ে, জুজুবুড়ি থেকে মরণের আশংকায় অনেকেই দূরে পালায়নি। জামাও বদল করেনি। ইন্দ্রপুর-কাকুলিয়ার বুকে সেদিনও উঠছিল এক আশ্চর্য পতাকা—যার রঙ দেখে ভিরমি খায় আঁধারের বাসিন্দারা। এই এলাকায় প্রতিটি মাঙ্গলিক কাজে, তা সে বড়ো মাপের ইস্কুলই হোক, লাইব্রেরি হোক কিংবা কো-অপারেটিভ, খেটে খাওয়া মানুষের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা হোক্—এ সব কিছুর মূলে যার অকুতোভয় দুর্বার প্রাণশক্তির প্রবাহ ছিল—তারই নাম সাগ্নিক, যাকে আদর করে ডাকা হতো—বুবুন। আর সাগ্নিকের সমস্ত কাজের প্রেরণা ও পরামর্শ দেওয়ার মানুষটির নাম হরেন। হরেন কেবল কর্মী-নেতা নয়, গান বাঁধা, ছড়া লেখা, গরিব আদিবাসী কিংবা নাম-না-জানা গ্রামীণ শিল্পীদের নিয়ে নতুন দিনের স্বপ্নে মশগুল একজন মানুষ। কেউ কেউ বলতো—''হরেনদা, অজাতশত্রু।'' হরেনের উক্তি—''ওরে যে পতাকাটা হাতে নিয়ে হাঁটছি, যার রঙ দেখে আঁধারের বাসিন্দারা আঁতকে ওঠে, সেই পতাকা বুকে নিয়েই মরতে চাই। আমরা কখনও অজাতশত্রু হতে পারি না। তাহলে তো ইতিহাসের শিক্ষা, শ্রেণি-সংগ্রাম—এসব কিছু মিথ্যে হয়ে যায়।'' রসিক সহকর্মী সিরাজ বলে ওঠে—''তুমি দেখছি দাদা 'রক্তকরবী'র বিশু পাগলের মতোই। দিব্যি আছো রসে বশে।'' সাগ্নিক বলে ওঠে, ''যাই হোক, এখন চলো দেখি, ইন্দ্রপুরের মোড়ে নাকি আমাদের আপিসটায় ওরা হামলা করছে। পতাকা টেনে নামিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে দাপাদাপি করছে। চলো, মোকাবেলা করতেই হবে। নয়তো, এলাকাটা ওদের দখলে চলে যাবে।''

হরেনের উপদেশ বা নির্দেশ—''ব্যাপারটা কিন্তু নিরামিষ হবে না ভাই। ওরা কেউটের ভ্যাঁকের মতো। অ্যাদ্দিন গর্তে সেঁধিয়েছিল। এখন রাজ কায়েম হওয়াতে ওদের কাছে বসন্তের বাতাস এসেছে। গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে। কাজেই গোঁয়ার্তুমি করে প্রতিরোধ নয়, মানুষকে সঙ্গে নিয়েই চলো এগিয়ে যাই।'' কোলকাতায় সমাবেশে যাবে বলে যে-সব মানুষ বাস-লরি করে আসছিল, পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে শাসকদলের মস্তানদের নিয়ে সেগুলোকে ফেরৎ পাঠাচ্ছিল। এরই প্রতিবাদে সাগ্নিক-হরেনরা মিছিল করে আগুয়ান হতে থাকে। দিনের আলোয় ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর অনুচরেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল মিছিলের ওপর। মিছিলটা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাওয়াতে এলাকাও সুনসান। সাগ্নিক আর হরেন ছিল সামনের সারিতে। তারা পালায়নি। পালাতে পারে না। টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বল্লম, লাঠি, তরোয়ালের আঘাত করতে করতে শেষ পর্যন্ত রাস্তার ধারের বোল্ডার দিয়ে মাথা মুখ থেঁতলে মৃত্যুকে নিশ্চিত করে শ্লোগান দিল—''বন্দেমাতরম্, পরিবর্তন—জিন্দাবাদ। শালারা আর নেতাগিরি করবি?'' তারপর দিন-দুপুরেই পুলিশব্যবস্থাকে কাঁচকলা দেখিয়ে, বীরপুঙ্গবরা নিজের নিজের আস্তানায় ফিরে গেল। তারিখটা ছিল—ফেব্রুয়ারি মাসের ২২। আগের দিন ২১শে ফেব্রুয়ারি—ভাষা দিবস। সেদিনও সাগ্নিক-হরেনরা বেঁচে ছিল। ইতিহাসের পাতা ওলটাতে ওলটাতে ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষাশহিদদের স্মৃতি-তর্পণ করার পরের দিনই তারাও ইতিহাস হয়ে গেল।

''অবস্থাটা এখন মৎস্যাবতারের মতো। কমণ্ডলু থেকে পুকুর, পুকুর থেকে নদী, নদী থেকে সাগর, সাগর থেকে মহাসাগর, তারপর মহাপ্রলয়। মহাপ্রলয়ের লগ্ন আসছে কিনা জানা নেই, তবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় সব প্রাণীরা যেন টাইম-মেশিনের বেড়ায় ভর দিয়ে আবার ফিরে এসেছে।'' সাগ্নিক-হরেনদের স্মরণসভায় বলছিলেন এই সময়ের একজন বক্তা। ব্যাপক জনসমাবেশ—অনেক ভয়তরাস দু-হাতে ঠেলে ওদের সহকর্মী-সহযোদ্ধারা সেই আশ্চর্য পতাকার ঢেউ তুলছিল। লড়াই-এর গানে মুখর ছিল আকাশ বাতাস। 'আমরা তো ভুলি নাই শহিদ/আমরা তো ভুলিব না' কিংবা 'তোমার পতাকা তুলেছি ঊর্ধ্বে' এইসব গানে ইন্দ্রপুর-কাকুলিয়ার আকাশ বাতাস গম্‌গম্ করছিল। অঞ্জনা, শেফালি আর সংহিতাকে মঞ্চে তুলে একজন বক্তা প্রশ্ন তুলেছিলেন—'শহিদের রক্ত ব্যর্থ হবে না তো? বলুন, 'স্বজনহারানো শ্মশানে তোদের, চিতা আমি তুলবই।' জনকল্লোলের প্রতিধ্বনি আকাশের এ প্রান্ত থেকে সে-প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল।

বুবুনের মা তখন প্রায় অপ্রকৃতিস্থ—অস্থির। তার আদরের বড় ছেলে আর নেই, একথা বিশ্বাস করতে পারছে না। ''আচ্ছা, সেই ছোটোবেলায় যেমন শুনেছি মরার পরে যারা সৎ, ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ, তারা নাকি তারা হয়ে আকাশে জ্বল জ্বল করে। আমার বুবুন তো লোকের ভালো করতেই চেয়েছিল। নিজের ভালোমন্দ, সুখ-দুঃখের কথা তো কখনো ভাবেনি। আর হরেনের মতো সোনার টুকরো ছেলে, তারও তো তারা হয়ে আকাশে ফুটে ওঠার কথা। কই, এই মেঘলা আকাশে কোনো তারাই তো দেখছি না। ওরা কি তাহলে মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেল?'' শোভারানী মাঝে মাঝেই জ্ঞান হারায়, আবার বৌ, নাতনির লালনে ভালোবাসায় চেতনার জগতে ফিরে আসে।

এভাবেই চলতে চলতে দু-বছর গড়িয়ে গেল। মাঝে মাঝে খবরের কাগজের পাতায়, কখনও বা টেলিভিশনের খবরে শোভারানী আঁৎকে ওঠে—''ওঃ, এতো রক্ত, এতো কান্না আর যে সহ্য করতে পারছি না গো। আর আমাদের মা-বুনেদের ওপর যা চলছে, তাতে মনে হয় সীতার মতোই বলি—হে মা ধরিত্রী, দ্বিধা হও, তোমার ভেতরে হারিয়ে যাই।'' শোভারানীকে কারা যেন খবর দিয়েছে যে বাবুন আর হরেনের খুনিদের কোর্ট থেকে জামিন দিয়েছে। পুলিশ সরাসরি খুনিদের আড়াল করছে। আর খুনিরা ফিরে আসার পর দিব্যি চুল্লু-মাংসের ফিস্টি করছে। কত মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে। কত মেয়ে সব হারিয়ে মরছে আবার কেউ বা যন্ত্রণায় খাক্ হয়ে শেষ হতে চলেছে। শোভারানী চিৎকার করে ওঠে—''ভগবান, তুমি কি আছো, তাহলে তোমার ন্যায়বিচারের এই কি নমুনা?''

বুবুন বেঁচে থাকার সময় মায়ে-ছেলেতে ঠাকুর-দেবতা-ধম্মো-কম্মো নিয়ে কতই না ঝগড়াঝাটি খুনসুটি হতো। বুবুন বলতো, ''মা, আমরা মানুষকেই পুজো করি। দেখছো না, বিদ্যাসাগরের মতো মানুষকে নিয়ে কত্তো বড় ইস্‌কুল আমরা তৈরি করলুম।

লাইব্রেরিতে রামমোহনের জীবন নিয়ে কত চমৎকার আলোচনা হলো। মানুষের মঙ্গলের জন্যে যারা নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দেয়, তাদের শ্রদ্ধা না করে অহেতুক পুজো-আচ্চা না-ই বা করলুম না। তুমি বারব্রত করছো বাধা দিচ্ছি না। পুজো-পাব্বন নিয়ে আনন্দে থাকছো, তাতে তো কোনোদিন আপত্তি করিনি, রাগও করিনি। কিন্তু আমার ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ো না।''
শোভারানীর সকাল-সন্ধে-রাত বুবুনের স্মৃতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। একা একা তার সঙ্গে এখনও যেন প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত কথা বলেই বেঁচে থাকা।

বুবুন তাকে গোর্কির 'মা' পড়িয়েছিল। ভালো লেগেছিল। তবে কি সব বিদেশি নাম, অপরিচিত পরিবেশ আর পুরনো দিনের লড়াই-এর বিষয়বস্তু ঠিক মাথায় ঢোকে না। তবু নিজেকে পাভেলের মায়ের মতো ভাবতে পারার মধ্যে এক ধরনের আনন্দ আছে। পুলিশি অত্যাচার, শাসকের দলবলের মালিকের দালালদের হামলার বিরুদ্ধে পাভেলের মা রাজনীতির মানুষ না হয়েও শেষ পর্যন্ত সুতীব্র প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে সকল লড়াকু মানুষের মা হতে পেরেছিল। শোভারানী কি পাভেলের মায়ের মতো অগণিত মানুষ, যারা বুবুনের সহকর্মী, সহযোদ্ধা হিসেবে এখনও বেঁচে আছে, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলবে—আমি তোমাদের সকলের মা। এক গভীর ঘৃণা, ক্রোধ নিয়ে তার ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। প্রতিকার কি হবে না কোনও দিন? মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে বৌয়ের সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়ে মেয়ের ভালোবাসার বাপটাকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিয়ে যারা এখন উল্লাসে, মদমত্ততায় বিভোর, তারা কি এভাবেই চিরকাল দাপিয়ে বেড়াবে? শোভারানীর ঘুম আসে না। ঘুম আসে না অঞ্জনা আর সংহিতারও। দিনের পর দিন চলে যায়। রাতের পর রাত অন্ধকারের দানোগুলো খিল্‌খিলিয়ে হাসতে থাকে। শোভারানী অন্ধকার আকাশের দিকে তাকায়। আকাশে অনেক তারা ফুটে আছে। কে জানে হয়তো বুবুন আর হরেনও তারার মতো তাকিয়ে আছে এই পৃথিবীর দিকে।

খড়িনদীর কাঁদড় থেকে ঝিরঝিরে বাতাস আসছে। কারা যেন ফিস্‌ফিসিয়ে বাড়িটার চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। শোভারানী জানে ভূত নয়, যারা তার বুবুনকে আর হরেনকে খুন করেছে, তারাই এখন শেয়ালের মতো, হায়নার মতো বাড়ির চারপাশে ওঁৎ পেতে থাকে। ও বাড়িতে কে যাচ্ছে, তার খবরাখবর করে আবার একটা তাণ্ডব করা

যায় কিনা, তারই সুযোগ খুঁজছে ওরা। রাত আর কাটতেই চায় না। দিনের বেলায় পাখির ডাকে, সূর্যের আলোয় খানিকটা সম্বিৎ ফেরে। বুবুনের পড়ার ঘরে থাকে থাকে সাজানো বই, কত ছবি, বিরল মুহূর্তের চিহ্ন যেন নীরবে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। মনে হয়, উঁচু গলায় চিৎকার করে বুবুন বলবে—''বড্ডো খিদে পেয়েছে মাগো।''

জীবন একটা বহতা নদী। আর সময় হলো সেই নদীর ঢেউ। কোনো নদীতে জোয়ার ভাঁটা খেলে, কোনো নদী মজে যায়—আর জলের স্রোতে কলকল করে ওঠে না। শোভারানীর জীবন এখন মজা নদীর মতো খট্‌খটে বালুস্তূপে মন্থর আর দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে। ভাঙা বুকের পাঁজরের ভেতর হা-হা করে বাতাস যেন কেঁদে ওঠে। ''বুবুন রে, আমাদের ছেড়ে কোথায় গেলি?'' ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। কাঁদতে পারে না।

পরিবর্তনের গণতন্ত্র এখন শ্মশান-পিশাচের বিকট হাঁ করা মুখের ভেতর তলিয়ে যাচ্ছে। শয়তানের খিদে যে এত প্রবল, সবকিছু ভেঙে চুরে চিবোতে চিবোতে নরকের কীটের মতো কিলবিল করতে করতে বলবে—আমি এখনো ক্ষুধার্ত, আমাকে সবকিছুই গ্রাস করতে হবে। তবেই না গণতন্ত্র। কাপালিকেরা, শ্মশান ভৈরবেরা তাথৈ তাথৈ করে নাচবে। পঞ্চায়েত ভোট পুরভোট। দখল করতে হবে সবকিছুই, তবে না গণতন্ত্র।

এই সময় এবং এই রাজ্যের মানুষ হয়তো ঘুম থেকে জেগে উঠে বলবে—আমরা জানি। এগিয়ে চলার গানও তারা গাইবে। শোভারানীর এই হাজা-মজা জীবনে হয়তো একটু সান্ত্বনা, হয়তো একটু যন্ত্রণার উপশম ঘটবে। কিন্তু রক্তের সোয়াদ পাওয়া বাঘ আর সরীসৃপরা সে সুযোগ দিল না।

ভোটের দিন। পুত্রহারা মা-জননী শোভারানী যেন মহাভারতের জনা। কোনও রকমে বুথ-জ্যাম করে দাঁড়িয়ে থাকা গণতন্ত্রপ্রেমী পরিবর্তনপন্থী বাইক-বাহিনীর বাধা সরাতে সরাতে বুথের ভেতর ঢুকে পড়ল। আঙুলে কালির আঁচড় দেওয়া হলো। তারপর ব্যালট পেপার নিয়ে যখন ছাপ দেওয়ার সময় এলো, চিল-বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে কেড়ে নিল একজন—''অনেক হয়েছে বুড়ি, বাড়ি যাও। তোমার ভোট আমরাই দিয়ে দিচ্ছি।'' শোভারানীর দু-চোখে আগুন যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে। এরা কারা? তাইতো, এরা তো আমার ছেলের সেইসব খুনী, যারা পুলিশের ভালোবাসায় আবার ফিরে এসেছে। বাহাত্তরের ভোটের ভয়ঙ্কর নকশাকেও ছাপিয়ে দিচ্ছে। আমি শহিদের মা, আমাকে তাড়িয়ে দিল! বুথের ভেতরেই প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং পার্টি এবং পুলিশেরা শুনতে পেলো আকাশফাটা চিৎকার—''তোরা আমার ছেলেটাকে কেড়ে নিয়েছিস্, আমার ভোটটাকেও কেড়ে নিলি? আমি অভিশাপ দিচ্ছি—তোদের এই পাপের রাজত্ব ধ্বংস হবেই।'' চিৎকার করতে করতে শোভারানী বাইরে এসে অজ্ঞান হয়ে গেলে কয়েকজন ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। সেই থেকেই শোভারানীর ভেতরের যন্ত্রণার তাড়সে সবকিছু যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। রাত যেন ফুরোতেই চায় না। ''বুবুন এলো না রে, এখনও ফিরল না কেন? তোরাও কি ঘুমিয়ে পড়েছিস?'' নানা কথার বুনুনিতে শোভারানীর মনে হয়—বুবুন আবার ফিরে আসবে। হঠাৎ একটা গানের কথা যেন ঝাঁকুনি দিতে থাকে—'শহিদ তোমায় ভুলি না আমরা/ভুলবে না সংগ্রামী জনতা।' বুবুনরা মরেনি, মরতে পারে না'। শোভারানীর দু-চোখ জুড়ে ঘুম আসে।

With best compliments of

ELCON ENGINEERING

ELECTRICAL CONSTRUCTION, ELECTRICAL CONSULTANCY & TESTING

5/9, Guru Nanak Road, Durgapur-713204
Mobile : 9434388560, 9832167426
E-mail : elcon.engg@gmail.com

Sl. No. 120

With best compliments of

GULSON CONSTRUCTION

CIVIL, REFRACTORY, MECHANICAL & GENERAL ORDER SUPPLIERS

In Front of Hindustan Refractories
Sagarbhanga (Near 112 No. Rail Gate)
Durgapur-11, Dist. Burdwan

Sl. No. 137

সুকান্ত ভট্টাচার্যের বন্ধু

কৌশিক লাহিড়ী

বছর দশেক আগের কথা।

বালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর মোড়ে একটা চেম্বারে বসতাম তখন। কৃশ, দীর্ঘকায় এবং কৃষ্ণবর্ণ এক ভদ্রলোক দেখাতে এলেন। সম্বিৎদার রেফারেন্সে। সম্বিৎদা মানে ডা. সম্বিৎ মজুমদার কার্ডিওলজিস্ট।

ভদ্রলোক ওনার মেসোমশাই।

বম্বেতে থাকেন। সেই বাহান্ন সাল থেকে প্রবাসে।

—আ ম্যান ইজ নোন বাই দ্য কম্প্যানি হি কিপ্‌স। জানেন তো? অ্যান্ড আই ওয়াজ অলওয়েজ ইন রং কম্পানি।

—মানে?

—মানে কিছুই নয়, সারা জীবন রংবাজি করেছি। বার্জার থেকে ব্রিটিশ পেইন্টস থেকে ড্যুলাক্স। কালার কনসালটেন্সি। এখনও কাজ করি। আসাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম। ঘুরে বেড়াই। পেশাদার রংবাজ বলতে পারেন। হাঃ হাঃ হাঃ।

প্রথম দর্শনে (বা শ্রবণে) যেটা মনে থাকল সেটা ওনার কণ্ঠস্বর। দেবদুলাল আর বচ্চন মেশানো অমন জলদমন্দ্র ব্যারিটোন আগে কখনো শুনেছি বলে মনে পড়ল না।

আবার পরে একদিন এলেন।

নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছুটা পরে।

একটু রাগ করব ভাবছিলাম। ওনার কথা শুনে সেটা আর করা হল না।

ওনার বয়স আশির দোরগোড়ায়। কিন্তু বাড়ি ভর্তি নাকি অসুস্থ আর বয়স্ক মানুষের ভিড়। সংসারে উনিই নাকি একমাত্র সুস্থ এবং কর্মক্ষম মানুষ। তাই সকলকে ডাক্তার দেখানো, ওষুধ এনে দেওয়া, বাজার করা, বিল জমা দেওয়া সব ওনার দায়িত্ব।

কাষ্ঠাহরণের জন্য নবকুমারের অভাব কোনো কালেই ছিল না, কেবল এই নবকুমারটি বয়োবৃদ্ধ, এই যা। পুরু কাচের আড়ালে ভদ্রলোকের চোখদুটি ভারি মায়াময়। লক্ষ করলাম।

পরিচয়টা পেলাম তৃতীয়বার।

—আমরা সেই গোড়া থেকেই সি.পি.আই. বুঝলেন তো? না, দিল্লি থেকে এলো গাই নয়, অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টি। তবে পার্টি তখন নিষিদ্ধ ছিল।

—ঊনপঞ্চাশ? না আটচল্লিশ?

—ওই রকমই হবে। তবে সুকান্ত তার আগেই চলে গিয়েছে।

—সুকান্ত মানে?

—ভট্‌চায্যি! কবিতা লিখত না? আমার বন্ধু তো।

—বন্ধু?

—কাঁধ দিয়েছি। পনেরোই আগস্ট দেশ স্বাধীন হল তো? সেদিনটা ছিল সুকান্তর জন্মদিন। একুশ হতো। হল না। চলে গেল তার মাস তিনেক আগে। ফর্টি সেভেনের মে মাস। টিবি হয়েছিল। তখন তো টিবি হলেই ...

—আপনি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের বন্ধু?

—এই রে! গোপন কথাটা বেরিয়ে গেল রে! ভদ্রলোকের মুখে দুষ্টু হাসি।

তারপরও বেশ ক-বার এসেছেন।

সারাক্ষণ ব্যস্ত।

হাজার কাজ।

কী আর করা যাবে! পরিবারে একমাত্র

কর্মক্ষম যুবক বলে কথা। কাষ্ঠাহরণের ব্যাপারটা কি আর সকলে পারবে?

এলেই গল্প হতো।

বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, নবান্ন, তেভাগা আন্দোলন, গণনাট্য সংস্থা, পঞ্চাশের দশকের বম্বে, রাজকাপুর-দিলীপকুমার-দেবানন্দ-মধুবালা-সুরাইয়া-গীতা দত্তের বম্বে, পার্টি ভাগ, এইসব গল্প।

সমকালীন রাজনীতি নিয়ে বীতশ্রদ্ধ। বিশেষ করে দুর্নীতি নিয়ে।

একদিন আর এলেন না।

ভুলেই গিয়েছিলাম।

সেদিন বাড়ি ফেরার পথে বিজনসেতুতে উঠছি আমার সেই পুরোনো চেম্বারের দিকে তাকিয়ে সেই ভদ্রলোকের কথা হঠাৎ মনে হল।

সম্বিৎদাকে ফোন করলাম। ব্যস্ত ছিলেন। তাও নিজেই ফোন ধরলেন।

—কে বড়মেসো? উনি তো নেই। মারা গিয়েছেন।

—কবে?

—এই তো গত আগস্টে। তা পাঁচ-ছ-মাস হয়ে গেল।

কী বলব ভেবে পেলাম না।

—আমি মাসিকে বলব তুমি ফোন করেছিলে। ঠিক আছে? গলা শুনেই বুঝলাম চেম্বারে। ব্যস্ত আছেন।

—আচ্ছা সম্বিৎদা, ওনার নামটা যেন কী ছিল? ব্যক্তিগত স্মৃতিতর্পণের জন্য হলেও নামটা জানা জরুরি।

—মেসো? এস.এস.ডি.। সমরেন্দ্রশেখর দাশগুপ্ত। মনে পড়ল পার্টি নিষিদ্ধ থাকার সময় শেখর দাশ নামে আত্মগোপন করে থাকতেন কেশব সেন স্ট্রিটের একটি মেসে। আর ইন্দ্রগুপ্ত ছদ্মনামে লিখতেন। পুরোনো 'স্বাধীনতা' পত্রিকার পাতায় ওনার দু-একটা লেখা ছাপাও হয়েছিল সোমনাথ লাহিড়ীর সম্পাদনায়।

সেই রাতেই গল্পটা লিখে ফেলি। নাম দিই 'সুকান্ত ভট্টাচার্যের বন্ধু'। গল্পটা কয়েকমাস পর একটি বাংলা দৈনিকের রবিবারের পাতায় ছাপাও হয়।

আরো বেশ কিছু বছর পর।

গত সপ্তাহে চেম্বারে শেষের দিকে রোগী দেখছি। এয়ারকন্ডিশনারটা কাজ করছিল না। গুমোট। তার ওপর দুপুরে একটা টিভি চ্যানেলে যেতে হয়েছিল উপরোধের ঢেঁকি গিলতে। তাই একটু অতিরিক্ত চাপ।

একটা অচেনা নাম্বার থেকে বারবার ফোন আসছিল।

তৃতীয়বার ফোনটা ধরলাম।

—নমস্কার। আমি কি ডাক্তারবাবুর সাথে কথা বলছি? একটা খুব চেনা ব্যারিটোন।

—বলছি।

—আমি দাশগুপ্ত কথা বলছি। ডা. মজুমদারের কাজিন ব্রাদার। উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপুর থেকে ফোন করছি। আপনি কি ব্যস্ত আছেন? মিনিট পাঁচেক কথা বলতাম।

—আপনি কি কাইন্ডলি আধঘণ্টা পরে ফোন করতে পারবেন?

—সার্টেনলি।

ডা. মজুমদার, উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপুর, কিছুই রিলেট করতে পারছিলাম না।

চেম্বার থেকে বেরিয়ে দেখলাম বাইরেও গুমোট। বোধ হয় বৃষ্টি আসবে।

ঢাকুরিয়া ব্রিজে উঠেছি আবার ফোন।

—আমি দাশগুপ্ত কথা বলছি ডাক্তারবাবু। সুর্য দাশগুপ্ত। একটু আগে আপনাকে ফোন করেছিলাম। আপনি কি এস.এস. দাশগুপ্ত নামে কোনো পেশেন্টকে মনে করতে পারেন? বেশ কয়েক বছর আগে কার্ডিওলজিস্ট ডা. সম্বিৎ মজুমদারের রেফারেন্সে আপনাকে দেখাতে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ অবশ্যই মনে আছে। সম্বিৎদার মেসোমশাই। সমরেন্দ্রশেখর দাশগুপ্ত। আপনি ...

—পুত্র। একমাত্র সন্তান। আপাতত উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপুরে একটি বিস্কিট কারখানায় পোস্ট রিটায়ারমেন্ট কনসালটেন্সি করছি।

—ও আচ্ছা, নমস্কার।

—নমস্কার।

—বলুন।

বড্ড জ্যাম, দক্ষিণাপণের সামনের রাস্তাটায়। গাড়ি এগোচ্ছেই না। গুমোটটাও বাড়ছে।

—একটি বিশেষ কারণে আপনাকে ফোন করেছি ডাক্তারবাবু। সেটা কীভাবে যে বলব সেটা ঠিক করতেই এতগুলো বছর কেটে গেল। বাবা যে আপনার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন, এটা আমি জানি।

—ওই অসমবয়সের একটা বন্ধুত্ব বলতে পারেন। টেলিফোনে আপনার গলাটা শুনে চমকে উঠেছিলাম প্রথমে।

—হাঃ। হাঃ। হাঃ। হ্যাঁ ওই কণ্ঠস্বরটাই পেয়েছি। বাবার আর কোনো গুণ আমাতে বর্তায় নি। আচ্ছা, বাবাকে নিয়ে আপনি একটা লেখা লিখেছিলেন। মনে পড়ে?

—হ্যাঁ তা লিখেছিলাম। একটা গল্প। 'সুকান্ত ভট্টাচার্যের বন্ধু'। ছাপাও হয়েছিল একটা কাগজে। অপ্রত্যাশিত সাহিত্যযশে বেশ একটু খুচরো আত্মপ্রসাদ হাওয়ায় ভেসে এসে মনটাকে ফুরফুরে করে দিল।

—সেই গল্পটা এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে ডাক্তারবাবু। মন্দ্র ব্যারিটোনে একটু যেন কাঠিন্যের ছোঁয়া। ভদ্রলোক কি কোনো কারণে আমাকে কোনো অপ্রীতিকর কথা শোনাতে চান? বা অপমান করতে? কিন্তু আমি তো যথেষ্ট সম্মান দিয়েই সমরেন্দ্র দাশগুপ্তের গল্পটা লিখেছিলাম।

—কোনো মিসইনফরমেশন? আমি কিন্তু আপনার বাবার অরিজিনাল নামটাও ইউজ করিনি। বদলে ইন্দ্রগুপ্ত করে দিয়েছিলাম। যে নামে উনি লেখালিখি করতেন।

—একজ্যাক্টলি! আর সে জন্যই বাবার মৃত্যুমাসটা যে আগস্ট নয়, মার্চ, সেই ব্যাপারটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ব্যাপারটা অন্য জায়গায়।

অজানা একটা অপমান আশংকায় মনটা ভারি হয়ে উঠল। গাড়ির কাঁচ উঠিয়ে, এসিটা চালিয়ে দিলাম। এটা আমি সাধারণত করি না। রাতে বাড়ি ফেরার সময় গাড়ির কাচ নামানোই থাকে। হু হু হাওয়া আসে। সারাদিনের ব্যস্ততার পর স্নায়ুগুলো আস্তে আস্তে শিথিল হতে চায়। কিন্তু আজ একটু অন্যরকম পরিস্থিতি। আর বাইরের রৌরবে, কোলাহলে দূরভাষের কথাও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল না।

—অন্য জায়গায়? আমি কিন্তু যথেষ্ট সম্মান দিয়েই... আর তাছাড়া... ওটা তো একটা গল্প, তাই...

—ডাক্তারবাবু! আপনি প্লিজ ভুল বুঝবেন না। আপনাকে কোনোভাবে দোষারোপ করার জন্য আমি ফোন করি নি। সত্যি বলতে কি, লেখাটা পড়তে পড়তে বাবার চেহারাটা বারবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। বাবার কথা যেন শুনতে পেয়েছি। বাবাকে এমনভাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, আপনার কাছে আমি, আমাদের পুরো পরিবার কৃতজ্ঞ। অ্যাকচুয়ালি আপনি জানেন কিনা জানিনা, বাবার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে আপনার এই লেখাটি আমার কাজিন, আপনার সম্বিৎদা পাঠও করেছিলেন।

—আরে তাই নাকি? কী কাণ্ড! জানতাম না তো? সম্বিৎদা আমাকে বলেনও নি কখনো।

—যে জন্য আপনাকে ফোন করা, ডাক্তারবাবু, এবার সেই প্রসঙ্গে আসি।

আমার বাবার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলাম আমি। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, আমার স্ত্রী, রীণা। যত গপ্পো, আড্ডা সব আমাদের দু-জনের সাথে। মা চিরকালই ইনট্রোভার্ট। ছোটোবেলা থেকে প্রবাসী হলেও, আমাকে বাংলা পড়িয়েছেন বাবা। বাংলা বইয়ের নেশা ধরিয়েছেন, যদিও স্কুলে আমি কখনো বাংলা পড়ার সুযোগ পাইনি।

—বাঃ। তাহলে তো আপনার স্টকেও অনেক গল্প আছে।

—তা আছে। দেশভাগ, রায়ট, নৌবিদ্রোহ অনেক ইতিহাসের সাক্ষী ছিলেন তো। সেসব শুনেছি।

—আর সেই সুকান্ত ভট্টাচার্যের সাথে...

চোখ ঝলসে দিয়ে আকাশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত একটা বিদ্যুৎচমক খেলে গেল।

—ঠিক এই জায়গাটাতেই আসতে চাইছিলাম। ডাক্তারবাবু! অনেক গল্প বললেও, সুকান্ত ভট্টাচার্যের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারটা বাবা কিন্তু কক্ষনো আমাদের বলেন নি! এমন কি মাকেও না।

—সে কি? তার মানে?

—ইয়েস! এই মানেটাই এত বছর ধরে খুঁজে চলেছি ডাক্তারবাবু। আর এইজন্যই আপনাকে ফোন করতে এত দেরি হয়ে গেল। বাবা মানুষটা, একটু নাটকীয় ছিলেন, এটা আপনি জানেন। তবে মিথ্যাভাষী ছিলেন না। অসম্ভব পরোপকারী। দুর্ভাগা পিতাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করা থেকে অজ্ঞাতকুলশীলের শবদাহ করা সবকিছুতেই বাবার ছিল অদম্য উৎসাহ। আপনার কাছে ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করার জন্যও সুকান্তর সাথে বন্ধুত্বের গপ্পোটা ফাঁদার কোনো দরকার ছিল না। তাই যে সম্ভাবনাটা এসেই যায়, সেটাকে এক্সক্লুড করার জন্যই জিজ্ঞাসা করছি, অপরাধ মার্জনা করবেন, বাবা কি সত্যিই এটা আপনাকে বলেছিলেন, নাকি সাহিত্যের খাতিরে আপনি ...

—একেবারেই না মি. দাশগুপ্ত। সৌজন্যের খাতিরে আমার গল্পে শুধু ওঁর নামটাই বদলে দিয়েছিলাম। নইলে, পুরোটাই নির্জলা সত্যি। আমাকে বিন্দুমাত্রও বানাতে হয়নি। এমনকি ইন্দ্রগুপ্ত নামটাও আপনার বাবার পেননেম। ওই নামেই উনি লিখতেন।

—ব্যস! এই কথাটা জানার ছিল স্যার। তাহলে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়াচ্ছে যে বাবা হয় অনৃতভাষণ করেছিলেন অথবা সত্যিই যে কবি সুকান্তর বন্ধু ছিলেন সেটা কোনোদিনই কারো কাছে, ঘুনাক্ষরেও প্রকাশ করেন নি। **প্রশ্ন** একটাই, কেন? অনেক ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু আপনার অনেক সময় নিয়ে নিলাম। গল্প লেখার পুরোনো অভ্যাসটা এখনো আপনার আছে কিনা জানি না, যদি থাকে, আর যদি সুকান্ত ভট্টাচার্যের বন্ধুর গল্পটা আর একবার লিখতে ইচ্ছে করে, তবে এই এপিসোডটাও জুড়ে দেবেন। চলে আসুন না একবার আমাদের রুদ্রপুরে। আরো বছর দুয়েক আছি। নৈনিতাল এখান থেকে জাস্ট এক ঘণ্টা। দেখুন যদি সময় করতে পারেন। আজ আসি। নমস্কার।

আকাশ চিরে একটা চোখ ঝলসানো আলো আর তার সাথে কান ফাটানো শব্দ। কাছেই কোথাও বাজ পড়ল। আর বৃষ্টিটাও নেমে পড়ল ঝমঝমিয়ে।

এবার গুমোট ভাবটা কেটে যাবে।

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

গোপগন্তার ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লি.

রেজি. নং ৪০, তাং : ১২-২-১৯৪৯
মুখ্য কার্যালয় : গন্তার, বর্ধমান
শাখা অফিসসমূহ : (১) ঘোষ শাখা, (২) মণ্ডলজোনা শাখা, (৩) রাধাকান্তপুর শাখা

আমাদের পরিষেবা

● **আমানত** : সেভিংস, মেয়াদী, পৌনঃপৌনিক), ঋণ ও **দাদন** : স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী, বন্ধকী, ব্যবসায়ী, সাইকেল/মোটর সাইকেল, পিতল কাঁসা বন্ধকী, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ● **ব্যবসা** : সমস্ত প্রকার রাসায়নিক সার, খইল, কীটনাশক। ● **ডিস্ট্রিবিউটর** : উচ্চফলনশীল আলু এবং ধান বীজ, গানিব্যাগ, স্বল্প ভাড়ায় ট্রাক্টর এবং ৪৭টি সাবমার্সিবল কৃষকের সেবায় নিয়োজিত, অ্যারিজ ডিসট্রিবিউটরি সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন। আসুন, আমরা একসাথে এগোই এবং সমবায় আন্দোলনকে দীর্ঘজীবী করে তুলি।

ভবানীপ্রসাদ ঘোষ
ম্যানেজার

Sl. No. 98

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

মোজম্মেল হক

গভর্নমেন্ট কন্ট্রাক্টর অ্যান্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স

উখরিদ, বর্ধমান

Sl. No. 86

Happy Pooja Greetings
from

JAI BALAJI INDUSTRIES LTD.

Sl. No. 117

মায়েরা কিন্তু ঘুমোয়নি

গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী

অন্ধকার আলো-আঁধারি পথ দিয়ে একা একা হেঁটে চলেছে। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখছে কেউ ওকে ফলো করছে কি না। ইদানীং কোথাও প্রকাশ্যে সভা সমিতি করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারি এবং শাসক দলের গুণ্ডাদের ভয়ে আতঙ্কে লোকজন কোথাও আসতেই চাইছে না। আলাদা আলাদা ভাবে যোগাযোগ করতে হচ্ছে। কখনো কোনো গাছতলাতে, আবার কখনও কোনো কালীমন্দিরের বারান্দাতে যোগাযোগ করতে হচ্ছে। আজকে এরকমই একটা মিটিং-এর ব্যবস্থা হয়েছিল। সেখানে কথা বলতে বলতে রাত্রি হয়ে গেল। এখন যত দ্রুত সম্ভব বাসায় ফিরতে হবে। তাড়াতাড়ি পা চালাচ্ছিল অনির্বাণ। আর খানিকটা এগোলেই বাসাতে পৌঁছে যাবে।

সামনের গলিটা খুবই আলো-আঁধারি। রোজ যাতায়াত করতে করতে অন্ধকার থাকলেও অবশ্য খুব অসুবিধা হয় না; অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। আজ সেই অভ্যাসের বসেই হাঁটছিল অনির্বাণ। আর মিনিট খানেক এগোলেই ওর বাসা। বাসা মানে কোলিয়ারির শেষ প্রান্ত আর গ্রামের যেখানে শুরু হয়েছে, সেখানে একজন কমরেডের বাড়ির বাইরের দিকে বৈঠকখানা ঘরে মাথা গোঁজার জায়গা। ঘর ভাড়া নিয়ে এখানেই থাকে অনির্বাণ। সংগঠনের সর্বক্ষণের কর্মী। সারাদিন এখানে ওখানে সংগঠনের কাজ করে রাত্রে এসে আশ্রয়। যেদিন রান্নার সময় থাকে সেদিন রান্না করে, মানে স্টোভ জ্বালিয়ে আলু ভাতে ভাত। আর যেদিন সময় থাকে না সেদিন অভয়ের দোকান থেকে গোটাকতক রুটি, আলু ভাজা, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা নিয়ে চলে আসে। ওতেই রাতের খাওয়া হয়ে যায়। ইদানীং পেঁয়াজের দাম বেড়ে যাওয়াতে অভয় আবার পেঁয়াজ বন্ধ করে এক টুকরো করে মূলো দিয়ে দিচ্ছে। আজও খানিকটা মূলো দিয়ে দিয়েছে। প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগে ওইসব খাবার ঝুলিয়ে নিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে খানিকটা জোরে জোরেই পা চালাচ্ছিল অনির্বাণ।

হঠাৎ করে কারেন্ট চলে যাওয়াতে অন্ধকার ভাবটা আর একটু বেশি হয়ে গেল। ওর বাসা থেকে খানিকটা দূরে একটি

ইলেট্রিকের পোলে ১০০ ওয়াটের বাতিটা কয়েকদিন ধরেই জ্বলছে না। জায়গাটা আরও অন্ধকার। বোধ হয় কানেকশনের কোনো গণ্ডগোল আছে—লুজ কানেকশন। এমনিতেই কারেন্ট থাকলেও বাতিটা কখনও জ্বলে কখনও নিভে যায়। ফলে কারেন্ট না থাকাকালীন জায়গাটা আরও বেশি অন্ধকার হয়ে যায়। আজকে জায়গাটা বেশ আঁধার হয়ে রয়েছে।

ইলেট্রিকের পোলের কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ পাড়ার একটা ছেলে এগিয়ে এসে অনির্বাণের হাতটা ধরে পাশের গলিতে টেনে নিয়ে গেল। খানিকটা অবাক হয়ে অনির্বাণ বললো। ''কী রে টানছিস কেন?'' ছেলেটা বলল, ''আস্তে কথা বলুন। আপনার ঘরের পাশেই ওরা দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে ঢুকতে গেলেই ওরা আপনাকে মেরে ফেলবে, চুপ করে আমার সাথে আসুন।'' কোনো কথা না বলে হাত ধরে হিড় হিড় করে অনির্বাণকে টানতে থাকে ছেলেটি। অনির্বাণ ছেলেটির সাথে এগিয়ে চলে। আর এই টানাটানিতে পলিথিনে রাখা রুটি তরকারি হাত থেকে ছিটকে গলির মধ্যে পড়ে যায়। নিচু হয়ে তুলতে যাবে কি? কোথা থেকে একটা নেড়ি কুকুর এসে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে যায় প্যাকেটটা। যাঃ আজকের খাওয়া হল! উপোস করে কাটাতে হবে রাতটা।

মনে মনেছেলেটির উপর বিরক্ত হয় অনির্বাণ। কিন্তু কিছু না বলে ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে বলে, ''ঠিক আছে চল, কোথা নিয়ে যাচ্ছিস চল। তবে বলবি তো কী হয়েছে। আর এই রাতে যাবই বা কোথায়?''

ছেলেটিকে অনির্বাণ ভালভাবেই চেনে। ওর নাম রাজু। অনির্বাণের ঘরের কয়েকটা বাড়ির পাশেই থাকে। আর ওর বাবার সাথে তো অনেক দিন ধরেই পরিচয় ছিল অনির্বাণের। ওদেরই সাথে পার্টির কাজ করত। কোলিয়ারিতে ইউনিয়নও করত। ছেলেটার বাবার নাম ছিল আব্বাস। কোলিয়ারিতে কাজ করতে করতে পাড়ারই একটি হিন্দু মেয়ের সাথে পরিচয় হয়। তারপর দু-জনে ঘর বাঁধে। ওদের কাগজে কলমে সরকারিভাবে কোনোদিনও বিয়ে হয়নি। কিন্তু ওরা থেকে গিয়েছিল স্বামী-স্ত্রীর মতো। মাঝে মধ্যে ইউনিয়নের মিটিং-এ এসব নিয়ে কথাবার্তা বললে হেসে উড়িয়ে দিত আব্বাস। বলত, ''তোমরাই তো বল বুর্জোয়ারা বিয়ের নাম করে ভণ্ডামি করে। শুধু নিজের বউ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। অন্যেরও বউ ফুসলে নিয়ে আসাতেই তাদের আনন্দ। আমি তো কেবলমাত্র একটা হিন্দুদের মেয়েকে ভালবেসে নিয়ে এসেছি, সেই মেয়েটিকে নিয়ে ভালোবেসে ঘর বেঁধেছি। আর এই ভালোবাসার জন্য সমাজ, সংসার, পরিজন সবাইকে ছেড়েছি, তোমাদের এই কোলিয়ারিতেই আদিবাসী পাড়ায় ঘর করে বসবাস করছি। তোমাদের কাছে কী এমন অপরাধ করলাম যে তোমরা প্রত্যেক মিটিং-এ 'সরকারিভাবে বিয়ে কর', 'রেজিস্ট্রি কর', এসব কথা তুলছো? যার সাথে আমি ঘর করছি সে কি তোমাদের কাছে কোনো অভিযোগ করেছে? তোমরা আমার কোলিয়ারির খাতা, ব্যাঙ্কের বই, ঘরবাড়ির জায়গা, দলিল সব খোঁজ নিয়ে দেখ তো, তোমাদের লালী ভাবী মানে রাজুর মা-কে কাগজে কলমে আমি কী মর্যাদা দিয়েছি।''

অনির্বাণরা কাগজ কলম ঘেঁটে দেখেছিল। সব জায়গাতেই রাজুর মাকে মানে লালী ভাবীকে আব্বাস স্ত্রী বলেই উল্লেখ করেছে। এরপর আর আলোচনা বৃথা ভেবে অনির্বাণরা এই প্রশ্ন নিয়ে আব্বাসের সাথে কোনো আলোচনা করত না। তবে মধ্যবিত্তের মানসিকতা থেকে আব্বাসের বাড়িও যেত না—কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হত। সেই আব্বাসের ছেলে রাজু এখন কোলিয়ারিতে রাজমিস্ত্রির কাজ করে ঠিকা শ্রমিক হিসাবে। রাজু কিন্তু অনির্বাণদের লাল ঝাণ্ডার ইউনিয়নের সদস্য নয়। শুধু রাজু কেন আরও অনেকেই আছে যাদের সাথে অনির্বাণের পরিচয় আছে, কোলিয়ারিতে কাজ করে, বেশির ভাগ ঠিকা মজুরের কাজ—তাদের অনেকেই ওদের ইউনিয়নের সদস্য নয়। ভয় একটাই, যদি রুলিং পার্টির নেতা খগেশ্বর জানতে পারে তাহলে আর কাজ থাকবে না। এখন মজুরদের একটাই ভয়—লাল ঝাণ্ডার ইউনিয়ন করা যাবে না, করলেই চাকরি নট্। কাজেই ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। এই রকমই উপায়হীন হয়ে রাজুর মতন ছেলেরা শুধু সময়ের অপেক্ষা করছে।

রাজুও কোনো উত্তর না দিয়ে ওকে নিজের বাড়ির বাউন্ডারির বেড়ার দরজাটা খুলে সোজা ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে একটা খাটিয়ার ওপর বসতে বলে, বলে 'বসুন'। খানিকটা আবেগ, উৎকণ্ঠা নিয়েই বসে পড়ে অনির্বাণ। এরপর একটা গামছা আর লুঙ্গি নিয়ে এসে রাজু বলে, ''চলুন ওখানে ইঁদারার কাছে গিয়ে হাত পা ধুয়ে আসুন, আমি আপনার সামান্য খাবারের ব্যবস্থা করে আসি। আজ আপনার ঘরে আপনাকে যেতে হবে না। ওখানে গেলেই আপনাকে ওরা মারবে। শুধু তাই নয়, চোর বদনাম দিয়ে থানাতে ধরিয়ে দেবে। আমি দেখে এসেছি ওখানে আপনার বাড়ির বাইরে গুণ্ডাগুলো পুলিশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম লাইটপোস্টের ধারে, আপনাকে দেখলেই সাবধান করে দেব বলে। এখন অনেকটা রাত্রি হয়ে গেল। এই রাত্রে আজ আর কোথায় যাবেন, থাকুন না রাতে আমাদের বাড়িতে। তারপর কাল সকালে দেখা যাবে, যা হোক একটা কিছু করা হবে। যান আপনি হাত পা ধুয়ে আসুন। খানিকটা শান্ত হয়ে বসুন তো।''

সারাদিন পরিশ্রমের পর, অথবা পরিশ্রম নাই হোক সারাদিন বাইরে থাকার পর, রাতের দিকে বাড়ি ফিরে আসার আনন্দ যে কী রকম তা সবাই জানেন। আবার রাতে ফিরে আসার সময় যদি কেউ দেখে তার বাড়িতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে বা ঢুকতে পারছে না, তাহলে তার যে মানসিক অবস্থা কী হয় সেটা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। মুহূর্তে সবটা কেমন বিষণ্ণ লাগতে লাগল অনির্বাণের কাছে। চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে হাতের কাছে গামছা লুঙ্গিটা নিয়ে পাতকুয়ার কাছে গিয়ে খানিকটা জল তুলে হাত মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আবার এসে বসে রাজুর ঘরের মেঝেতে। ততক্ষণে রাজুর মা এককাপ লাল চা করে নিয়ে এসে হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। —''নাও চা টা খেয়ে নাও। আমি তোমার জন্য দু-চারটে রুটি করে নিই। রাজু একবার বাইরে গেল, এখুনি এসে পড়বে।'' রাজু আবার কেন গেল, আবার কি কোনো খবর আনবে, এসব ভাবতে ভাবতে চা খাওয়া শুরু করে অনির্বাণ।

চা শেষ করে কাপটা নামাতে যাবে, ততক্ষণে রাজু এসে হাজির। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে প্যান্ট জামা বদলে একটা লুঙ্গি পরে অনির্বাণের পাশে বসে পড়ল রাজু। এবার অনির্বাণ জিজ্ঞাসার দৃষ্টি নিয়ে বলল, ''কী ব্যাপার?'' খানিকটা রাগতভাবে অনুযোগের সুরে রাজু বলে ওঠে, ''আচ্ছা আপনি তো লাল ঝাণ্ডার পার্টি করেন, কোলিয়ারিতে ইউনিয়ন করেন, ওরা আপনার ওপর কী রকম রেগে আছে তাও জানেন। গতকালই তো খগেশ্বর রতনের বাড়িতে এসে হুমকি দিয়ে গিয়েছে যে যদি আপনি ওই বাড়িতে থাকেন তাহলে মালিককে মারবে আর আপনাকেও বার করে দেবে। আপনার বাড়ির মালিক আপনাকে কিছু বলেনি?'' খানিকটা অবাক

হয়ে অনির্বাণ বলে ওঠে, ''কই না তো, রতন কিছুই বলেনি।'' এবার খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়ে বলে ওঠে রাজু, ''তা বলবে কেন, চাচা আপন প্রাণ বাঁচার মতো অবস্থা আপনার বাড়ির মালিকের। ও তো আপনার ইউনিয়নের নেতা। নিজের জান বাঁচাবার জন্য গতকাল খগেশ্বর যখন ওকে এসব বলছিল তখন আপনার বাড়ির মালিক খগেশ্বরকে বৈঠকখানায় বসিয়ে চা বিস্কুট খাওয়ালো। আমরা তো পাড়ার ছেলেরা সবকিছু দেখলাম। বোধ হয় কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গিয়েছে, তাই আর কোনো খবর দিল না। ভালই হল, আপনাকেও তাড়ানো হল, ওর ঘরও খালি হল। নিজের নিরাপত্তাও বজায় থাকলো। আপনি মার খেলেন কি খেলেন না, জেলে গেলেন কি গেলেন না, তাতে ওর কী? নিজে তো নেতাগিরি করে সবই করে নিয়েছে। মানে মাসে চারটে করে সানডে, আন্ডারগ্রাউন্ডে না গিয়ে আন্ডার গ্রাউন্ড অ্যালাউন্স, সিক ছুটি, আবার কোলিয়ারি না গিয়ে হাজরি—সব সুবিধাই তো ও আদায় করে নিয়েছে। এখন আর আপনাদের দ্বারা কিছু হবে না। সব ওই খগেশ্বরদের হাতে, তাই ওখানে যাওয়াই ভালো। আমরা কিন্তু পাড়ার ছেলেরা কয়েকজন জেনে গিয়েছিলাম যে আজ যদি আপনি ওর বাড়িতে যান তাহলে আপনার বিপদ। আপনার ঘর তো দখল হয়েই গিয়েছে, আপনার জিনিসপত্রও সব লুঠ হয়ে গিয়েছে। খগেশ্বরের ছেলেরা সব মাথায় করে নিয়ে চলে গিয়েছে।''

অনির্বাণ মনে মনে ভাবে গতকাল রাত্রে আসার পরে তো অনেকক্ষণ ওদের সাথে কথা হল, কই একবারের জন্যও তো রতন অনির্বাণকে বলল না যে খগেশ্বর-এর লোকজন এসে অনির্বাণকে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়ার জন্য রতনকে হুমকি দিয়ে গিয়েছে। তাহলে কি রতনের খগেশ্বরদের সাথে কোনো যোগাযোগ তৈরি হয়েছে, না রতন ওদের কাছে সারেন্ডার করেছে? আর যদি সারেন্ডার করেও থাকে তাহলে কম-সে-কম অনির্বাণকে সাবধান করে দিতে ওর কী আপত্তি ছিল? কিছুই বুঝতে পারছে না অনির্বাণ। কিন্তু ওর ঘরের পরিস্থিতি কী, কী অবস্থায় জিনিসপত্র আছে জানবার জন্য মনটা খুবই ছটফট করছিল। তাই রাজুকে বলল, ''দেখ যদি ওখানে একবার যেতে পারতাম তাহলে ভাল হতো।'' সঙ্গে সঙ্গে রাজুর উত্তর, ''খবরদার না। আপনি গেলেই আপনাকে ওরা পুলিশের সামনে মেরে ফেলবে। বরং আপনি এখানে থাকুন। খাওয়া দাওয়া করুন। আপনাকে কাল ভোরে এখান থেকে বার করে দেব। এখন যদি আপনি ওখানে যান আর ওরা যদি জানতে পারে আপনি আমার ঘরে ছিলেন তাহলে আমারও সমূহ বিপদ।'' খানিকটা স্বগতোক্তি করেই রাজু বলল, ''যা করার পরে করবেন। এখন থাকুন, খাওয়া দাওয়া করুন। আমি গিয়ে একটু দেখে আসি ওখানে কী অবস্থা।''

ইতিমধ্যেই রাজুর মা একটা থালাতে গোটা চারেক রুটি, খানিকটা চিনি, আলুভাজা দিয়ে গেল। কোনো কথা না বলে অনির্বাণ খাওয়া শুরু করে। রাজুর মা পাশের ঘর থেকে সবটাই শুনছিলেন। এতক্ষণ কোনো কথা বলেননি। এবার বললেন, ''তা সকালে কোথায় যাবে ঠিক করেছো?'' অনির্বাণ বলে, ''না এখনও ভাবিনি। আর ভাববো কী, এসে থেকে যা শুনছি তাতে আমার সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তুমি দেখ না রতনের বাড়ির পাশে আমাদের যে দু-জন পার্টির নেতা বাস করে, তারাও তো আমাকে জানাতে পারতো যে এ রকম ব্যাপার। ওরাও তো কিছু বলেনি। ভাগ্যিস রাজু ছিল তাই রক্ষে। না হলে এতক্ষণ যে কী হতো কে জানে!'' বলেই ফোনটা বার করে অনির্বাণ এ পাড়ারই একজনকে ফোন করার চেষ্টা করে। উত্তর আসে 'সুইচড্ অফ'। আরও একজনকে ফোনে ধরার চেষ্টা করে। অনেকক্ষণ ফোন বাজার পরে ফোন ধরে ওর স্ত্রী। অনির্বাণ সবটা জানিয়ে বলে, ''দাদাকে একবার দিন না, কথা বলবো।'' বৌদি উত্তর দেয়, ''দেখুন আমরা ছেলেপুলে নিয়ে ঘর সংসার করছি, আর আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন ইউনিয়ন করার জন্য আমাদের ওপর কী রকম হুমকি। আপনার দাদাকে তো রোজই আট ঘন্টা করে ডিউটিতে থাকতে হচ্ছে। ইট ভাটাটা ছিল তাও বন্ধ। বি.এল.এল.আর.ও. অফিস থেকে ফাইন করে দেওয়া হয়েছে। পার্টি করার জন্য আমাদের অনেক হয়রান হতে হয়েছে। আপনার দাদাকে যদি বিরক্ত না করেন তাহলে খুবই ভাল হয়।''

অনির্বাণ হতাশ হয়ে ফোনটা নাড়াচাড়া করতে থাকে, মনে মনে হাসে। আট ঘন্টা ডিউটি করতে হচ্ছে বলে দুঃখ, ইটাভাটা বন্ধ—বি.এল.এল.আর.ও. ফাইন করেছে। রাজুর মা বুঝতে পেরেছেন ওরা অনির্বাণকে কী জবাব দিল। তাই বোধহয় বলে বসলেন, ''যেমন কর্ম তেমনি ফল। তোমাদের যদি এরকম সাজা না হয় তাহলে তোমরা তো বুঝবে না। এখনই তো বোঝা যাচ্ছে কে তোমাদের বন্ধু, কে তোমাদের শত্রু। এতদিন তোমরা সরকারে ছিলে। গুয়ে মাছির মতো অনেকেই লাল লাল চোখ করে ভন ভন করে তোমাদের সরকারের আর তোমাদের চারিদিকে নীল নীল ডানা নিয়ে উড়ে বেড়াতো। গুয়ে মাছিকে সবাই ঘেন্না করে, কেবল করতে না তোমরাই। এই গুয়ে মাছিগুলো এখন ওদের দলে। রতনাটাও কেমন ভিড়ে গেল ওদের দলে দেখলে?''

খানিকটা অভিমানভরে রাজুর মা বলে ওঠেন, ''আব্বাস মারা যাওয়ার পর তোমরা তো আর যোগাযোগ রাখ না। আর আমিও ধর তোমাদের মিটিং-মিছিলে আর যাইও না। তোমরা তো সব সময় আব্বাসকে বলতে কাগজে কলমে আমাদের বিয়ে করতে। আর আমরা তো কাগজে কলমে বিয়েও করিনি।'' লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজুর মা বলতে থাকেন, ''তখন কী পরিস্থিতির মধ্যে ছিলাম তা তোমরা ভাবতেও পারবে না। খানিকটা ঘটনাচক্রে সুদবালাদের হাত থেকে বাঁচতে বাবার সাথে আমরা পালিয়ে আসি তোমাদের এই কোলিয়ারিতে। এখানেও সুদবালারা খুঁজতে খুঁজতে চলে আসে। জোর করতে থাকে বাবাকে। কেউ রক্ষা করতে আসে না—বাবা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় ওদের চাপে। আমি অনাথ, তখন একমাত্র সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল এই আব্বাস। কোনোদিনও জোর জবরদস্তি করেনি। কেমন করে আমরা ঘনিষ্ঠ হলাম জানি না। কোনো মন্দির মসজিদ পুরোহিত নয়, আমরা নিজেরাই কেমন করে ঘর বাঁধলাম জানি না। তবুও আমরা ঘর বেঁধেছি। এ নিয়ে আমাদের মজুর মহল্লাতে কোনো শ্রমিক পরিবার কোনো দিনও কোনো প্রশ্নও করেনি। ছিল না কোনো টেরা চোখের চাউনি। আমরাও কোনো কিছুকেই ভয় পেতাম না। আব্বাস শুধু আমার নয়, এই শ্রমিক মহল্লাতে প্রতিটি শ্রমিক পরিবারের বন্ধু, নেতা হয়ে উঠেছিল। মজুর মহল্লার সাধারণ মজদুররাই কতবার ওর কাছে এসেছে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে—মজুরদের আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনা করতে। আমার স্বামী আব্বাসকে ওরা কক্ষনো জিজ্ঞাসা করতো না আমি ওর বিয়ে করা বউ কি না, আমার জাত কী? কেউ জানতেও চাইত না, আমি হিন্দু হয়েও আব্বাসের সাথে কেমন করে ঘর বাঁধলাম? শুধু মাঝে মাঝে আব্বাসই বলতো, তোমরাই নাকি পার্টি মিটিং-এ এসব নিয়ে হাসাহাসি করতে আর আব্বাসকে রেজিস্ট্রি করতে বলতে। আব্বাস বাড়ি এসে মুচকি

হেসে আমাকে এসব বলতো। আর বলতো, ''রাজুর বয়স তো ষোলো হল, এখন তাহলে তোমাকে আবার নতুন করে নিকা করতে হয়।''

এ পর্যন্ত একনাগাড়ে বলে, পর পর নানা দলের নানা রঙের কয়েকজন শ্রমিক নেতার নাম করে রাজুর মা বললেন, ''এরা তো অনেকে বিয়ে করা বউ ছেড়ে দিয়েছে, গোপনে আর একটা করে মেয়ে রেখেছে। এই নেতাদেরই তো কয়েকজন মারা যাওয়ার পর সেই বউগুলো আর ছেলেগুলো ওদের সম্পত্তি সহ সবকিছুর ভাগ চাইছে। কিন্তু দেখ, আব্বাস সমস্ত কাগজপত্রে ওর স্ত্রী হিসাবে আমাকে উল্লেখ করে গেছে এবং স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিয়েছে, কোথাও কোনো ধোঁয়াশা নেই।'' এরপর উঠে পড়ে বলেন, ''দাঁড়াও রাজু তো তোমার খবর আনতে গিয়ে এখনও ফিরছে না; দেখি কেন এখনও আসছে না?'' বলেই দরজা খুলে বার হওয়ার উপক্রম করতেই দরজা ঠেলে রাজু হাজির হয়ে বলে, ''না, ওরা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। আমাকেও ধমক দিল কেন আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। ওরা কাকার নাম ধরে বলাবলি করছে, শালা আসলেই মারবো।'' নিজেই খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, ''ধুস, পাড়াতে এতগুলো নেতা-কর্মী আছে, এদের মধ্যে যদি জনা-পনের একসঙ্গে বার হয় তাহলে ওদের ক্ষমতা আছে ওরা মারে? নিজেরাই লেজ গুটিয়ে পালাবে। মগের মুলুক নাকি! বলা নেই কওয়া নেই কারও ঘর দখল করব, মারবো। পুলিশ ঠুটো জগন্নাথ। যা নয় তাই চলছে। যে ক'জন হয় হোক, একসাথে প্রতিবাদ করা দরকার।'' খানিকটা রাগতভাবে রাজু বলে ওঠে, ''আচ্ছা মা, তোমাদের মহিলারা বার হচ্ছে না কেন?'' ''মেলা বক্‌বক্ করিস না। আমি কেন বার হব, আমি নেতা নাকি? নেতারা ডাকুক দেখ, বার হতে পারি কি না দেখাচ্ছি,'' —মা উত্তর দেয়। ''ও, নেতারা ডাকলে বার হবে, দাঁড়াও নেতাদের খবর দিচ্ছি,'' বলে মোবাইল ফোন বার করে অনির্বাণের পরিচিত একজনকে ফোন করে রাজু। ওপার থেকে উত্তর আসে, ''আমার কী করার আছে? এখন সহ্য করে চলতে হবে। এটাই ফ্যাসিস্ট শক্তি। কেমন আক্রমণ হচ্ছে তা তো দেখছিস? এখন কিছু করাও খুব কঠিন, তবুও যখন খবরটা দিলি তখন দেখি চেষ্টা করে কী করা যায়।'' এ পর্যন্ত বলে ফোনটা কেটে দেয়।

রেগে গিয়ে অস্ফুট স্বরে একটা খিস্তি করে ফোনটাকে পকেটে রেখে দেয় রাজু। আবার বেরিয়ে যায়, খানিকটা পরেই ওদের পাড়ার পাশের বাড়ির খাস্তি মেঝানকে ডেকে আনে। খাস্তিকে আসতে দেখে অনির্বাণকে পাশের ঘরে ঢুকিয়ে দেন রাজুর মা। খাস্তি রাজুর মা-কে বলে, ''শুনেছিস তো, অনির্বাণের ঘর ভেঙে লুঠ করে ওকে মারার জন্য ওরা দাঁড়াই আছে। পুলিশও আছে। কেউ কিছু বলছে না,'' বলে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে রাজুর মা-এর দিকে খাস্তি তাকিয়ে তাকে। রাজুর মায়ের উত্তর, ''কোনো নেতা লিডার কেউ প্রতিবাদ করতে আসছে না, তা তোর আমার মতো দুই আধবুড়ি আর কী করবে? তবে কাল সকালে দল বেঁধে কোলিয়ারিতে গিয়ে চানকে আমাদের পরিচিত যারা আছে তাদের বলা যেতে পারে। আর আমাদের পরিচিত যারা আছে তাদেরকে ডেকে এনে অনির্বাণের ঘরটা জোর করে দখল করব। যাবি কি আমার সাথে?'' খাস্তি সামান্য সময় না নিয়েই বলে, ''ঠিক বলেছিস, চল কাল সকালে তুই আর আমি যাবো চানকে, আমাদের চিনা জানা যারা আছে তাদের বলবো। কোলিয়ারির অন্য লাল ঝাণ্ডার যে নেতারা আছে তাদেরও বলবো। যদি আসে তো ভাল, না আসে তাহলে তুই আমি রাজু...।'' খাস্তির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রাজুর মা বলে ওঠেন, ''শুধু আমরা তিনজন নই। আমাদের পাড়ার মাঝি আর কোল ধাওড়ার মেয়েগুলোও আছে। খবর পেলেই দেখবি তারাও সাথ দেবে।'' খাস্তি উত্তর দেয়, ''ঠিক বলেছিস, তুই ব্যবস্থা কর, আমরা সবাই তোর সাথে আছি, আমাদের পাড়ার ছেলেমেয়ে সবাই যোগ দেবে।'' খানিকটা সাহস পেয়ে রাজুর মা বলে ওঠেন, ''তাহলে তুই এখন ঘর যা, কাল সকালে যা হোক একটা হেস্তনেস্ত করব।''

খাস্তি চলে যাওয়ার পর রাজুর মা অনির্বাণকে ডেকে নেন। তক্তপোষের ওপর একটা শতরঞ্চি আর চাদর বিছিয়ে মশারি টাঙিয়ে বলেন, ''তুমি শুয়ে পড়। কাল সকালে তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। তুমি আমার ঘরেই থাকবে। আর সকালবেলাতে আমরা যাবো কোলিয়ারিতে। পাড়ার মেয়েগুলোকে নিয়ে যাবো, তোমাদের নেতাদেরও বলবো, এই অন্যায়ের বিহিত করতে। যদি ওদের সাহসে না কুলায় তাহলে দেখবে আমাদের খেল! আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে দুশমনদের মুখে ছাই দিয়ে মুসলমানের সাথে বিয়ে করে সমাজের মুখে ঝাঁটা মেরে নিজের নাম ধরম না বদলেও একসাথে ঘর করছি। কত মস্তান জমিদার, হারামজাদা গুণ্ডা, পুলিশ দেখলাম। তোমরা আবার তোমাদের লালীভাবীকে দেখতে পাবে, দেখবে কেমন নাচন নাচাবো খগাদের। তোমার কোনো চিন্তা নাই। কাল সকাল হতে দাও। দেখাচ্ছি মজা—'' বলেই অনির্বাণের বালিশটাকে দু-চাপড় মেরে ধুলো ওড়ানোর মতো করে সমান করে দিয়ে বললো, ''নাও শুয়ে পড়।'' অনির্বাণ বেশ বুঝতে পারে এই চাপড় মারার মধ্যে দিয়ে লালীভাবী খানিকটা রাগ ঝেড়ে দিল খগেশ্বরের ওপরে।

ঘুম সহজে আসার কথাও নয়। বাড়ির বাইরে থাকার অভিজ্ঞতা অনেক। বিভিন্ন সম্মেলন-সভা-সমিতিতে গিয়ে প্রায়ই বাইরে থাকতে হয়। কিন্তু বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে, জিনিসপত্র তছনছ হয়েছে, সামনে গুণ্ডারা দাঁড়িয়ে আছে মারবে বলে, আর মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ প্রস্তুত হয়ে আছে—এরকম অভিজ্ঞতার কথা লোকমুখে শুনলেও বাস্তব অভিজ্ঞতা এই প্রথম। বিভিন্ন সময় বাড়ি-ছাড়াদের আশ্রয় দেওয়া, তাদের সাহায্য করা, তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য নানাভাবে নানা কথা আলোচনা করেছে অনির্বাণ। তারা কোনো কথা না বলে শুধু চুপচাপ অনির্বাণের কথা শুনতো। কোনো উত্তর দিতো না। অনির্বাণ মনে মনে ভাবতো কমরেডরা কথাগুলো গ্রহণ করছে এবং নিজের মনোবল ফিরে পাচ্ছে। কিন্তু এখন অনির্বাণ মাত্র কয়েক ঘন্টায় নিজের ঘর-ছাড়া অবস্থায় বুঝতে পারছে কী যাতনার মধ্যে দিয়ে কমরেডদের সময়গুলো পার হতো। ওরা কী ভাবতো? আর কী জন্য উত্তর না দিয়ে শুধু সংগঠনের ওপর ভরসা নয়, নিজের চেষ্টাতেও কেমন করে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পারে তার রাস্তা খোঁজার চেষ্টা চালাতো—যেমন অনির্বাণ করে চলেছে।

সাহায্যের জন্য বিভিন্ন জনকে ফোন করেছে। অনেকেরই ফোন বেজে যাচ্ছে। কারও কারও আবার সুইচড্ অফ্। ল্যান্ডফোনও খারাপ। অনেক কষ্টে যদিও বা দু-চারজনকে পাওয়া যাচ্ছে 'দেখি দেখছি' ইত্যাদি বলে আর কোনো যোগাযোগ করছে না। তাদেরই বা দোষ কী, সবাই তো একটা সন্ত্রস্ত পরিবেশের মধ্যে আছে। ইচ্ছা থাকলেও কিছু করতে পারছে না। বরং অনেকে অনির্বাণকে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে উৎসাহিত করেছে। এরকম নানা ভাবনা চিন্তা অনুরোধ উপরোধ শুনতে শুনতে অনির্বাণের মনটা কেমন যেন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ঠিক করে ফেলে, যা হয়

হোক। যদি গ্রেপ্তার হতে হয়, মরতে হয়, মার খেতে হয় তাতেও কোনো আপত্তি নেই, যাবে না এই এলাকা ছেড়ে—এখানেই থাকবে। মানুষের সাথে এমন কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি যাতে ওরা তাকে আশ্রয় দেবে না। যদি না দেয় তাহলে বুঝতে হবে কিছুই করেনি এতদিন, যা করেছে সবই পণ্ডশ্রম। এই মানসিক জোরই অনির্বাণকে বিদ্রোহী করে তোলে। ঠিক করে, যাই হোক কাল সকালে যাবে রাজুর মা আর খান্তি মাঝিদের সাথে কোলিয়ারিতে।

ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে পড়ে অনির্বাণ। দরজা খুলে বাইরে বার হয়ে আসে। দেখে বারান্দায় রাজুর মা, খান্তি মেঝান, রাজু, আরও গোটা দশেক ছেলে। আর সাথে ওদের মহল্লার কয়েকজন শ্রমিক বসে আছে। সবাইকে রাত্রে জড়ো করেছেন রাজুর মা। ওরা ঠিক করেছে আগামীকাল সকালে সবাই অনির্বাণের ঘরে যাবে। রতনের কাছে জানতে চাইবে 'ওর বাড়ি থেকে অনির্বাণের জিনিসপত্র যারা লুঠ করল তাদের বাধা দিল না কেন? রতন কি ভাড়া নেয় না?'' আর এসব করতে গেলে খগেশ্বর দলবল নিয়ে সামনে আসবেই। খগেশ্বর নিজে কোলিয়ারিতে পাঁচটা কোয়ার্টার দখল করে আছে। কোলিয়ারির জায়গাতে মদের দোকানের লাইসেন্স নিয়ে, কোলিয়ারির কারেন্ট নিয়ে মদ ঠাণ্ডা করার মেসিন বসিয়েছে। খগেশ্বর এলে সবাই মিলে এসব নিয়ে ধরবে। দরকারে পাড়ার মেয়েগুলোকে নিয়ে এজেন্ট সাহেবের অফিসে ঝাটা লাঠি নিয়ে বসবে। ওরা যদি পুলিশ ডাকে ডাকবে। পুলিশ যদি জোর করে গুণ্ডাদের সাহস যোগাতে আসে 'তাহলে দেখবি আমার খেল' বলে সবাইকে সাহস জোগায় রাজুর মা।

এদিকে অনির্বাণকে হঠাৎ করে দেখে সবাই যেন অবাক হয়ে গেল। রাজুর মা খানিকটা রাগতভাবে বলে, ''তুমি আবার উঠে এলে কেন, ঘুমোতে পারলে না?''—বলেই সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে, ''আজ বিকেলে ওদের ব্যাপার স্যাপার দেখে রাজুকে আমি রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম সুযোগ পেলেই ওকে সাবধান করে দেবার জন্য। না হলে তো একে মেরেই ফেলতো।'' উপস্থিত সকলে রাজুর মায়ের এই কাজকে সমর্থন করে। ঠিক হয় অনির্বাণ কাল সকালে রাজুদের বাড়িতেই থাকবে। ওরা সবাই কাল রতনের কাছে গিয়ে যেমন করেই হোক অনির্বাণকে ওর বাড়িতে ঢোকানোর ব্যবস্থা করেই আসবে। অনির্বাণ বুঝতে পারে আবার একটা নিশ্চিত পরাজয়ের সামনে উপস্থিত হতে হবে ওদের। কারণ ওই গুণ্ডাদের সাথে এমনিতেই পেরে ওঠা যাবে না। কিছু বলতে যায় অনির্বাণ, কিন্তু সবাই মিলে ওকে চুপ করিয়ে দেয়। বোঝানো বৃথা বুঝে চুপ করে থাকে অনির্বাণ।

ওরা যাবেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই যে যার বাড়ি ফিরে যায়। অনির্বাণও নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ খুট খুট আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল অনির্বাণের। চোখ খুলে দেখে রাজুর মা একটা বাক্স খুলে কী যেন খুঁজছেন। কোনো আওয়াজ না করে মটকা মেরে পড়ে থাকে অনির্বাণ। শুয়ে শুয়ে দেখতে থাকে ব্যাপারটা। রাজুর মা বাক্স খুলে একটা লাল ঝাণ্ডা বার করছে। এবার অনির্বাণ থাকতে না পেরে বলল, ''ভাবি তুমি এটা কী করতে রেখেছ?'' রাজুর মা বলে বসেন, ''ও তুমি তাহলে ঘুমোওনি, শুয়ে শুয়ে সব দেখছো। তাহলে শোনো—এটা আমি রাখিনি এটা আব্বাসের ঝাণ্ডা। তোমাদের পার্টিতে নাকি কোনো সময় ঠিক হয়েছিল সমস্ত কর্মীদের নিজের ঝাণ্ডা রাখতে হবে। আব্বাস এই ঝাণ্ডাটা যত্ন করে বানিয়েছিল। মিছিল মিটিং হলেই এটা নিয়ে যেত। আব্বাস মারা যাওয়ার পরে ঝাণ্ডাটাকে আর কোথায় ফেলবো বল। আব্বাসের স্মৃতি হিসাবে যত্ন করে এই টিনের বাক্সতে ভরে রেখেছিলাম— আজ আবার বার করলাম। কাল এটাই কাঁধে নিয়ে বার হব। আর এটাকে বাক্সবন্দি করে রাখবো না।'' বলেই পাশে রাখা লাঠিটাতে ঝাণ্ডাটা বেঁধে রেখে দিলেন।

অনির্বাণ অবাক হয়ে ভাবে মার্কসবাদের কোন শিক্ষা এদের এত সাহস যোগায়! এদের তো কোনোভাবেই কেউ কেনোদিন কেতাবি মার্কসবাদ পড়ায়নি। কোথাও কোনো রাজনৈতিক ক্লাসেও এরা যায়নি। শিক্ষার মধ্যে স্বামীর সাথে ঘর করতে গিয়ে পার্টি সম্বন্ধে যা আলোচনা, ভাবনা ইত্যাদি। আর মাঝে মাঝে আব্বাসের সমবয়সী বা ওর থেকে বেশি বয়সের নেতাদের কথাবার্তা আলোচনা শোনা—এই আর কি। আব্বাসের প্রতি শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে অনির্বাণের মাথা। মনে মনে বলে, ''ধন্য আব্বাস তুমি, অন্য সবার সাথে নিজের পরিবারটিকেও লাল ঝাণ্ডার প্রতি বিশ্বাসী হতে শিখিয়েছো, আমরা সবাই তা পারিনি।''

অনির্বাণ ভাবে, কত রকম বাধা বিপত্তি তাদের পরিবারে, কত অশান্তি, তার কাহিনি লিখতে গেলে তো বিশাল হয়ে যাবে। নিজের বিশ্বাসকে অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করা তো দূরের কথা নিজের পরিবারের মধ্যেও পারেনি—একই ছাদের নিচে থেকেও দ্বিমত নিয়ে একই বিছানায় বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। আর এই আব্বাস! মারা যাওয়ার পরও তার বিশ্বাসকে এমনভাবে গেঁথে রেখে গেল তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যে ওদের কথাতে রাত্রিবেলাতেও মজুর মহল্লার পুরুষ-মহিলারা জড়ো হয়ে ভয় সন্ত্রাস উপেক্ষা করেও লড়াই-এ যাওয়ার কথা ভাবতে পারছে। ম্যাক্সিম গোর্কীর 'মা' উপন্যাসটা অনেকদিন আগে পড়েছে অনির্বাণ —নিরক্ষর 'মা'—তার সন্তানদের প্রতি অগাধ স্নেহ আর ভালোবাসা, আর স্বামী সন্তানদের কাছ থেকে শোনা কথাবার্তা 'মা'কে টেনে নিয়ে গিয়েছিল আন্দোলনের গভীরে। অনির্বাণ ভাবে, আমাদেরও এরকম মায়ের প্রয়োজন। কেন আমাদের মায়েরা এত শিক্ষা, অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সাহসী হতে পারছে না। কিসের আতঙ্ক? কিসের ভয়? 'মা'-এর মতো মজুরদের কাছে কাগজ ফেরি করতে না পারুক, আমাদের মতো হতভাগাদের কাছে স্বপ্নের ফেরি করতে এত দ্বিধা দ্বন্দ্ব কেন? কেন এত ভয়-লজ্জা! হোক না পরাজয়, হোক না মৃত্যু। অনির্বাণের ইচ্ছে হয় 'লালী ভাবী' মানে রাজুর মায়ের পা দুটো জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেই থাকে।

রাজুর মা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বার হয়ে দরজাটা আস্তে করে ভেজিয়ে দেয়। শুধু ঘরের মধ্যে পড়ে থাকে একরাশ সুখস্বপ্ন। রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকলেও অনির্বাণ বুঝতে পারে খানিকক্ষণ পরেই ভোর হবে।

Happy Pooja Greetings
from

FRIENDS CONSTRUCTION

CONTRACTORS & GENERAL ORDER SUPPLIERS

Civil, Structural & Mechanical Contractor
Gopinathpur, Durgapur-713219, Dist. Burdwan

Sl. No. 118

ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক ও সাম্রাজ্যবাদী নজরদারি

শ্রীদীপ ভট্টাচার্য

সমগ্র বিশ্ব জুড়ে হৈ চৈ পড়ে গেছে। মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তরের কর্মী এডুয়ার্ড স্নোডেন মার্কিন গোয়েন্দাগিরি ও নজরদারির যে-সমস্ত তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন তা রীতিমতো বিস্ফোরক ও উদ্বেগজনক। এর পরিণতিতে স্নোডেনকে অবশ্য দেশ ছাড়তে হয়েছে, অন্য দেশে আশ্রয় চাইতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আপাতত রাশিয়ায় তার আশ্রয় মিলেছে। স্নোডেনের ওপর মার্কিন সরকার বেজায় চটে গেছে। কী ভংয়কর অনৈতিক কাজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করে চলেছে তার সম্পর্কে বহু তথ্য স্নোডেনের স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে জানা যায়।

কী করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র?

সমগ্র বিশ্ব এখন ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়ে গেছে। চিঠি আদানপ্রদান, তা ব্যক্তিগত পর্যায়ের চিঠি হোক বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অন্য এক রাষ্ট্রকে প্রেরণ করা চিঠিই হোক, তা এখন বড় বেশি এই ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভরশীল। এই যোগাযোগের ক্ষেত্রে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্কের ভূমিকা বড় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হল পৃথিবীর বৃহত্তম ফাইবার অপটিক কেন্দ্র (হাব)। বিশ্বজোড়া তথ্যের আদানপ্রদানের এক বিশাল অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে হয়। এই তথ্যগুলির ওপর নজরদারি, তথ্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করা ও বিশ্লেষণ করা—এই সমস্ত কাজ কারুর সম্মতির পরোয়া না করেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পরিচালিত হচ্ছে।

ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের বৃহৎ সংস্থাগুলির অধিকাংশই হল মার্কিন সংস্থা। এদের মধ্যে অ্যাপল (Apple), আমেরিকান অন লাইন (AOL), ফেসবুক (Facebook), গুগল (Google), মাইক্রোসফ্‌ট (Microsoft), পলটক (Pal Talk), স্কাইপ (Skype), ইয়াহু (Yahoo), ইউ টিউব (You Tube)—নয়টি সংস্থা বিশ্বের ইন্টারনেট নেটওয়ার্কিং-এর অধিকাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। উল্লিখিত সংস্থাগুলির সার্ভার পৃথিবীর শত কোটিরও বেশি মানুষ ব্যবহার করে। উপরোক্ত সংস্থাগুলি তাদের নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে তথ্যের যে আদানপ্রদান হয়, তা সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সরবরাহ করে। মার্কিন সংস্থা ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি (এন.এস.এ.) সংস্থার অধিকার আছে এই সমস্ত তথ্যের সংরক্ষণ, নজরদারি ও বিশ্লেষণ করার। এই মার্কিন নিরাপত্তা সংস্থা মার্কিন সরকারের নিজস্ব সংস্থা। এই সংস্থাটির জন্ম ১৯৫২ সালে। তখনকার দিনে মূলত টেলিফোনে আড়ি পেতে তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে এই সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা করা হয়। একদিকে বিশ্বের কোনো দেশের ওপর নজরদারি ও অপরদিকে যে-কোনো মার্কিন নাগরিক যিনি সরকারের সন্দেহভাজন তার ওপর নজরদারির জন্য এই সংস্থাটির সৃষ্টি হয়। কম্পিউটারের উদ্ভাবন ও বর্তমান ইন্টারনেট নেটওয়ার্কিং-এর যুগে এন.এস.এ-র কাজ আরও গভীর ও প্রসারিত হয়েছে। ব্যক্তির নিজস্ব চিঠি ও তথ্য ছাড়াও রাষ্ট্রের সরকারগুলি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (অর্থনীতি, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও সামরিক সংক্রান্ত গোপন তথ্য সহ) এই নেটওয়ার্কিং-এর মারফৎ সংরক্ষণ করে, প্রয়োজনীয় গবেষণা করে ও বিশ্লেষণ করে। এই সমস্ত গোপনীয় বিষয়গুলি মার্কিন প্রশাসনের কাছে অজ্ঞাত নয়। ন্যূনতম নৈতিকতার বালাই না রেখে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের অনুমতি না নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সমস্ত তথ্যগুলি হস্তগত করছে, নিজেদের অধিকারে আনছে।

এন.এস.এ-র কাজের পদ্ধতি

জাতীয় সুরক্ষা সংস্থা (এন.এস.এ.) মার্কিন সরকারের পক্ষে নজরদারি ও গোয়েন্দাগিরির কাজ করে চলেছে। বিশ্বের দেশগুলির সার্বভৌম অধিকারের ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ ও বিশ্ববাসীর গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ পরিকল্পিতভাবে পরিচালনার হাতিয়ার এই সংস্থা।

এই সংস্থার মাধ্যমে (এতদিন পর্যন্ত এই সংস্থাটি সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা ছিল না) প্রতি ঘণ্টায় ২ পেটাবাইট (১ পেটাবাইট-এর অর্থ হল ১০ লক্ষ গিগাবাইট) তথ্যভাণ্ডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংগ্রহ করছে। এর মধ্যে বার্তা, ই-মেল, কথোপকথন, ভিডিও সমস্ত কিছুই রয়েছে। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি ২ শত কোটি ডলার ব্যয় করে নতুন ব্যবস্থাপনা নির্মাণ করেছে যার মাধ্যমে এই পৃথিবীর প্রতিটি পুরুষ, নারী ও শিশু—প্রত্যেকের জন্য ১০ লক্ষ ডিভিডি পরিমাণ তথ্য সংরক্ষিত রাখা সম্ভব হবে। সমস্ত দুনিয়ার টেলিকম নেটওয়ার্কের ওপর মার্কিনি নজরদারি প্রতিষ্ঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন সহ আরও কয়েকটি দেশ মিলিতভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে ইকেলন 'Echelon'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইকেলন ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি সংস্থা—দুইটির কার্যধারা পরস্পরের পরিপূরক। আন্তর্জাতিকভাবে জনপ্রিয় কার্যরত ইন্টারনেটের সার্ভারগুলি (যে নয়টি সংস্থার নাম পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে) একথাই জানিয়েছে যে এন.এস.এ-র চাওয়া অনুসারে তথ্য সরবরাহ করা তাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

ভারতের ওপরও নজরদারি

মার্কিন গোয়েন্দাগিরির অন্যতম লক্ষ্য ভারত। যে দেশগুলির ওপর নজরদারি চালানো হয়, তাদের মধ্যে ভারতের স্থান পঞ্চম। চীন ও রাশিয়া এ-ব্যাপারে ভারতের নীচে। ভারত থেকে সংগৃহীত তথ্যের পরিমাণ ৬৩০ কোটি। এর একটা বড় কারণ

হল গুগল, ইয়াহু, মাইক্রোসফ্‌ট—এইগুলির ব্যবহারকারীদের বিপুল সংখ্যক ভারতীয়। এমনকি সরকারি সংস্থাগুলিও এই সমস্ত ওয়েবনির্ভর যোগাযোগকে তথ্যের আদানপ্রদানের জন্য ব্যবহার করে। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি গোপন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য জি-মেইল-কে ব্যবহার করে। এই জি-মেইল মার্কিনিদের কাছে একেবারেই অবাধ। তথ্যে প্রকাশ যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর, ভারতীয় বিমানবাহিনীও হটমেইল, জি-মেইল মাধ্যমগুলিকে ব্যবহার করে। আমাদের দেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় তথ্য মার্কিনিদের কাছে অবারিত। নজরদারির নামে তথ্য ও সংবাদকে বিকৃত করা, বিনষ্ট করা (হ্যাকিং)-র মতো ঘটনা ঘটছে, যা যে-কোনো দেশের স্বার্থের পক্ষে, নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক।

নিজেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য দেশের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করার অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজে থেকে গ্রহণ করেছে। এটা চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ যা একমাত্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই গ্রহণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেরও নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার চরমভাবে আক্রান্ত, কারণ তাদের সমস্ত ই-মেল ও ইন্টারনেটের ওপর মার্কিন নজরদারি চলছে। সমস্ত ক্ষেত্রে মার্কিন প্রশাসন প্রবেশ করতে পারে। এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ চলছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির চরম আগ্রাসী কার্যকলাপের প্রয়োজনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যকারী ভূমিকার বিরুদ্ধে দুনিয়ার সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রগতিশীল জনগণকে বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসতে হবে। স্বাধীনভাবে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

ইন্টারনেট পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবর্ত প্রয়োজন

বর্তমানে ইন্টারনেট সংস্থাগুলিকে অনুমোদন করে ইন্টারনেট কর্পোরেশন ফর অ্যাসাইন্ড নেমস অ্যান্ড নাম্বারস (ICANN–International Corporation for Assigned Names & Numbers)। মার্কিন বাণিজ্য দপ্তরের লাইসেন্সের অধীনে এরা কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের আন্তর্জাতিক সংস্থার চরিত্র হওয়া উচিত বহুজাতিক। রাষ্ট্রসংঘের কোনো সংস্থার হাতেই বিশ্বের ইন্টারনেট সার্ভারগুলির পরিচালনার দায়িত্ব থাকা উচিত। অথচ দুনিয়ার ইন্টারনেট পরিকাঠামোর ওপর যথেচ্ছভাবে প্রবেশ, বিকৃত করার একচেটিয়া অধিকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিজের হাতে রাখতে চাইছে।

ইন্টারনেট তো শুধুমাত্র বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের একমাত্র সহায়কই নয়, এর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের তথ্যগুলির ভাণ্ডারও গড়ে ওঠে। ইন্টারনেটকে তার সঠিক ভূমিকা পালনে সমর্থ করতে হলে এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের এটা অঙ্গ। ইন্টারনেটকে সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব ও নজরদারি থেকে মুক্ত করতেই হবে।

With best compliments of

M/s BISWANATH SINGHA

SANJIB SARANI, DURGAPUR-713201
MOBILE : 9333927171

Sl. No. 124

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

কৃষি ও কৃষকের সেবায় নিয়োজিত

ভাতাড় সমবায় শস্য উৎপাদন ও বিপণন সমিতি লিমিটেড

ভাতাড়, বর্ধমান
রেজি. নং : ২৩৩১, তাং : ১-২-৬৭

অশোককুমার সাঁতরা
কোষাধ্যক্ষ

নির্মল সরকার
ম্যানেজার

Sl. No. 52

কার্টুন হইতে সাবধান

সুকৃতি ঘোষাল

কিছুদিন আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র ইন্টারনেটে একটি রাজনৈতিক ইঙ্গিতবাহী কার্টুন ফরওয়ার্ড করার জন্য গ্রেপ্তার হন। এ নিয়ে মিডিয়ায় হইচই হয়, আলোচনায় কার্টুন নিয়ে কাটাছেঁড়া হয়, রাজনৈতিক কার্টুন বিষয়টি খবরের শিরোনাম হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে আলোচনা প্রাসঙ্গিক এই ভাবনা থেকেই এ লেখায় হাত।

সুমিত ঘোষের 'ভারতে রাজনৈতিক কার্টুন চর্চা' বই থেকে জানা যায় যে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ীর (পিসিএল বা ছদ্মনাম কাফী খাঁ হিসেবে যিনি সমধিক পরিচিত) কার্টুন যা ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়, তা থেকেই এ দেশে 'এডিটোরিয়াল কার্টুন প্রকাশের চল হয়'। শুরুর যেমন শুরু থাকে, প্রদীপ জ্বালানোর আগে থাকে সলতে পাকানোর কাজ, তেমনি এ-দেশে কার্টুনশিল্পের হাতেখড়ি হয় কালীঘাটের পটুয়াদের আঁকা ব্যঙ্গচিত্রের সূত্রে। পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে 'বসন্তক' নামক মাসিক কার্টুন পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয় নিয়ে রসালো কটাক্ষচিত্র প্রকাশ করতে থাকে। 'নীলদর্পণ' নাটকের মঞ্চায়ন বন্ধ করতে চেয়ে যে আইন তৈরি করেছিল ইংরেজ সরকার, তাকে কটাক্ষ করে যে কার্টুন ছাপে 'বসন্তক' তাতে একটা বাড়ির ছাদে বসা মশাকে তাক করে বসানো কামানে অগ্নিসংযোগ করছেন বড়লাট নর্থব্রুক (চিত্র-১)। ছবি আহামরি না হলেও শ্লেষ উন্নতমানের। কাফী খাঁর উত্তরসূরি শঙ্কর, কুট্টি, আর.কে. লক্ষ্মণ, প্রকাশ-এর হাত ধরে কার্টুন আজ এক পরিণত শিল্প।

কার্টুন কথাটা আজকাল animation film হিসেবে বেশি ব্যবহৃত হলেও, এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আলাদা। আগেকার দিনে দেওয়াল চিত্র আঁকার জন্য কাঁচা প্লাস্টারের ওপর রেখা বা দাগ দেওয়া হতো। মোটা

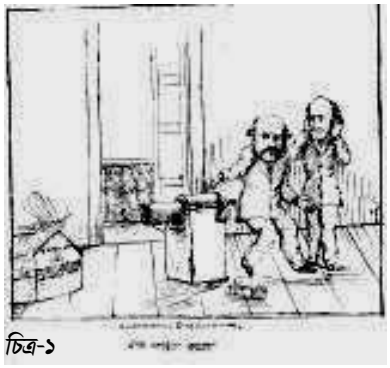

চিত্র-১

পিচবোর্ডের ওপর পিন দিয়ে ফুটো করে চিত্রটির নকশা তৈরি করে সেই ছিদ্র দিয়ে শুকনো রঙ ছেটানো হতো। এই ধরনের পিচবোর্ডকে বলতো কার্টুন। ক্রমে অর্থের রূপান্তর হয়েছে, কার্টুন বলতে এখন আমরা রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয়ে রচিত ব্যঙ্গ-চিত্রকে বুঝি। কার্টুনের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, যদিও সর্বত্র তা সমভাবে উপস্থিত নাও থাকতে পারে। প্রথমত, কার্টুনের ছবি সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে হলেও তা বাস্তবধর্মী নয়। অর্থাৎ আঁকার সময় সচেতনভাবে অবয়ববিকৃতি ঘটানো হয়। নাকটা বেশি লম্বা, পা-টা দেহের তুলনায় বেশি ছোটো বা সরু, চোখটা মার্বেলের মতো গোল বা গালটা বেশি ঝোলা। ব্যক্তির রূপমূর্তির সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই (যেমন হিটলারের গোঁফ, গান্ধীর পা, ইন্দিরার নাক)-এর আকারটিকে বেঢপ বানানো হয়। তবে এটি এমন কৌশলে করা হয় যে বিকৃতি সত্ত্বেও ব্যক্তিটিকে চিনে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না।

দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো কার্টুনে ছবির সাথে কিছু শব্দকে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন দু-নম্বর কার্টুনে। সারদা কাণ্ডের পর চিটফান্ডে যারা সর্বস্ব হারিয়েছিল তাদের আর্থিক সুরাহার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ৫০০ কোটি টাকার একটি ক্ষতিপূরণ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। সরকারি অর্থ যেহেতু জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ, কিছু টাকা ধূমপায়ীদের কাছ থেকে তুলতে মুখ্যমন্ত্রী সিগারেটের ওপর বাড়তি শুল্কের উল্লেখ করেন এবং হাল্কা মেজাজে এমন কথা বলেন যা ধূমপানকে পরোক্ষভাবে উৎসাহদান বলে বিতর্কের সূচনা করে। এই নিয়ে এই কার্টুন, যাতে দেখা যাচ্ছে, অভুক্ত অর্থাৎ আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজন

চিত্র-২

চিত্র-৩

খাবারের অপেক্ষায় বসে রয়েছে। রান্না করছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং, হান্ডার গায়ে লেখা 'Chit Fund Losers Fund'। Speech balloon বা কথাঘরে লেখা 'Hope It is Not Injurious to Health' অর্থাৎ 'আশা করি এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয়'। সুখাদ্য তৈরি হচ্ছে, ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তবু অভুক্ত মানুষগুলোর এ সংশয় কেন? খেয়াল করলে দেখব, জ্বালানি হিসেবে যে কাঠ ব্যবহৃত হয়েছে তা আসলে সিগারেট যার ধূমপান স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। ব্যঞ্জনাকে বাড়িয়ে শ্লেষকে তীক্ষ্ণতর করেছে।

তৃতীয়ত, কার্টুন যেহেতু ব্যঙ্গাত্মক রেখাচিত্র, এর প্রধান উপজীব্য হল বিদ্রূপরস। সামাজিক বা রাজনৈতিক কোনো বিষয় নিয়ে রসকষহীন আক্রমণ তাই কার্টুনের মর্যাদা পেতে পারে না। এ প্রসঙ্গে ভারতের সংবিধান রচনার দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে কুট্টির সেই অসামান্য কার্টুনটার কথা মনে আসে (চিত্র-৩)। অজস্র মানুষ অপেক্ষমান, নেহরু চাবুক হাতে তাড়াচ্ছেন, কিন্তু তবু সংবিধানের রথ এগোচ্ছে না, কারণ গাড়োয়ান আম্বেদকার লাগাম হাতে যে প্রাণীটির পিঠে সওয়ারি হয়েছেন সেটি ঘোড়া নয়, শম্বুক বা শামুক। এই ভাবনাটাই কৌতুককর, আর কৌতুকজাত হাস্যরসই কার্টুনের প্রাণ।

কমিক স্ট্রিপের speech balloon-এর সঙ্গে কার্টুনে ব্যবহৃত শব্দ বা বাক্যের চরিত্রগত পার্থক্য আছে। কমিকস্ট্রিপে, বাংলায় যেমন বাঁটুল দি গ্রেট, হাঁদা-ভোঁদা, নন্টে-ফন্টে বা টিনটিন, speech balloon-এ লেখা সূত্রেই কাহিনি এগোতে থাকে। ছবি লেখাকেই illustrate বা বিশদ করে। তবে ছবিটি কৌতুককর বলে তা আমাদের হাস্যরসকে উদ্দীপিত করে, আমরা না হেসে পারি না। কার্টুন-এ শব্দের ব্যবহার সীমিত ও সাংকেতিক। তা আমাদের একটি সূত্র দেয়, বাকি কাজটা ছবি নিজেই করে। তাই শব্দ বা বাক্য নাও থাকতে পারে। সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে সৃষ্ট চতুর্থ কার্টুনটিতে চোখ রাখলে বিষয়টি বোঝা যায়। Right to Information (RTI) বা তথ্যের অধিকার আইনটির আওতায় রাজনৈতিক দলগুলির খরচ-খরচাকে নিয়ে আসা নিয়ে যে বিতর্ক তা এই কার্টুনের বক্তব্য। এ বিষয়ে যেই প্রস্তাব ওঠে, সব দল রে-রে করে তেড়ে আসে, সবাই সমস্বরে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক দলের আয়ের উৎস প্রকাশে আপত্তি কেন? অবৈধ লেনদেন চলে বলেই কি স্বচ্ছতার প্রশ্নে যৌথ প্রতিবাদ? এই যে দলমতনির্বিশেষে আপত্তি, কার্টুনিস্ট সেটিকে ব্যঙ্গ করেছেন এক অসাধারণ শিল্পকর্মে। ছোটোবেলায় পড়া সেই চেনা গল্প, ব্যাধ পাখি ধরতে জাল পাতল। আটক পড়া পাখিরা সবাই মিলে ঠিক করল যে সবাই একসাথে ডানা ঝাপটালে জাল সমেত উড়ে যেতে পারবে, কিরাতের হাতে মরতে হবে না। এখানেও হয়েছে ঠিক তাই। রাজনৈতিক দলকে RTI-এর অধীনে আনার পরিকল্পনা রূপ জালটিকে সব দল মিলে

চিত্র-৫

উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, হতাশ কিরাত CIC বা Chief Information Commissioner-এর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে। দেখা ছাড়া তাঁর করার কিছুই নেই। কার্টুনটির তাৎপর্য পাঠক-দর্শককে বুঝিয়ে দিতে শুধু RTI শব্দটি জালের ওপরে লেখা হয়েছে।

শব্দের ব্যবহার সীমিত হলেও এই ব্যবহার কখনো কখনো কার্টুনের ব্যঙ্গকে তীক্ষ্ণতর করতে ব্যবহৃতা হয়। যেমনটি হয়েছে পঞ্চম কার্টুনে। ক্ষমতায় আসার আগে এ-রাজ্যে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে খুব সরব ছিলেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু দল ক্ষমতাসীন হবার পর নানা দলীয় ঘটনার মিডিয়া কভারেজ বা গণমাধ্যমে তার উপস্থাপনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিব্রত হতে হয়। কোনো কোনো ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি অপছন্দের গণমাধ্যমের সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন। যেমন কার্টুনকাণ্ডে দলীয় অসহিষ্ণুতা বিষয়ে তাঁর উদাসীনতা ভূমিকা-বদলের নামান্তর বলে অনেকের কাছে বিবেচিত হয়। এ নিয়ে কার্টুনিস্ট কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। কার্টুনটিতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রীকে তুলি হাতে PRESS-এর আগে SUP কথাটি জুড়তে দেখি আমরা। তুলির আঁচড়ে Press হয় Suppress, স্বাধীনতা বদলে যায় দমনে। শ্লেষটি ধারালো হয়ে ওঠে

চিত্র-৪

চিত্র-৬

দুটি কারণে। প্রথম, টেবিলের নিচে বন্দি শিল্পী-কার্টুনিস্ট। তার হাত বাঁধা, অর্থাৎ শিল্পী ভূলুণ্ঠিত, তার স্বাধীনতা শৃঙ্খলিত। তবে সবচেয়ে তীব্র শ্লেষ হল তুলি হাতে ক্যানভাসের ওপর চিত্ররচনার ভঙ্গিতে মুখ্যমন্ত্রী এটা করছেন। নিজে একজন শিল্পী হয়ে গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করতে উদ্যত হয়েছেন তিনি।

কার্টুনের বিষয় যা খুশি হতে পারে, তবে তার একটা সাধারণ ধর্ম হল তার সাম্প্রতিকতা। অর্থাৎ চলতি সময়ের সমালোচনা-যোগ্য ঘটনাই কার্টুনিস্টদের বেশি পছন্দ। যে ঘটনা বিস্মৃতির গর্ভে স্থান নিয়েছে তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ ততটা জমে না। হয়তো তার একটা কারণ সেটিকে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করতে, ইংরাজিতে যাকে contextualize করা বলে, ব্যর্থ হই আমরা। আজ থেকে ২০ বছর পর ৬নং কার্টুনটির রসগ্রহণ করা শক্ত হবে। ছবিটা আপাত নিরীহ, বাবা ঢিল মেরে গাছ থেকে ফল পাড়ছে, ছেলে উল্লাসে ফেটে পড়ছে। একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারি বাবা মুলায়ম সিং যাদব, ছেলে উত্তরপ্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব। বিষয়টা খোলতাই করতে সমাজবাদী পার্টির প্রতীকচিহ্ন সাইকেলও রাখা হয়েছে ফ্রেমে। আরো একটু ঠাহর করলে দেখি গাছের কাণ্ডটি জাতীয় কংগ্রেসের প্রতীক হাত চিহ্নের আদলে অঙ্কিত। এবার বুঝতে পারি গাছটি হল কংগ্রেস নেতৃত্বে চলা ইউ.পি.এ সরকার। এই সরকারের সংখ্যা-সমস্যার সুযোগ নিয়ে মুলায়ম সিং যাদব তাকে ব্ল্যাকমেল করে আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। কংগ্রেসের দলীয় প্রতীকের ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যবহার এই কার্টুনের মাস্টার স্ট্রোক। কিন্তু মনমোহনের সরকার সমাজবাদী পার্টির সমর্থনের ওপর কতটা নির্ভরশীল, আর সেই দুর্বলতাকে মুলায়ম কাজে লাগাচ্ছেন কীভাবে, এই সাম্প্রতিক ইতিহাস বিস্মৃত হলে কার্টুনের আবেদন মাঠে মারা যাবে।

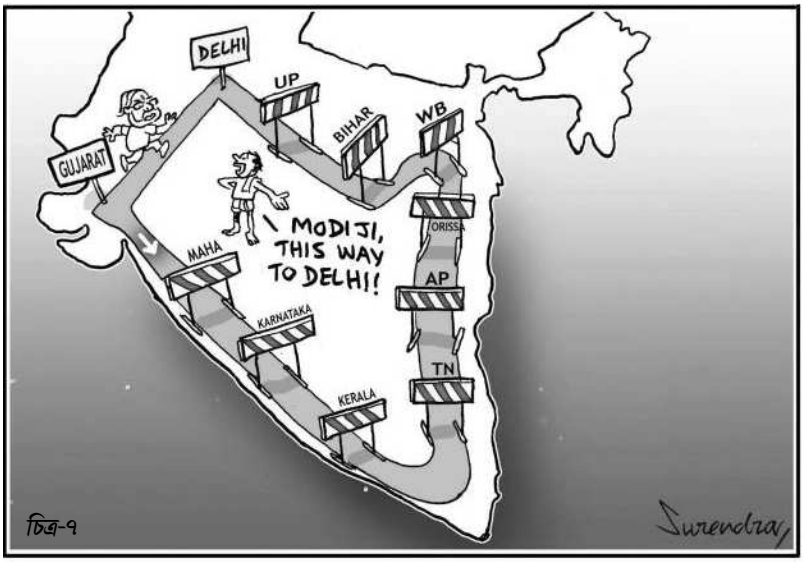

চিত্র-৭

কার্টুনের আর একটি সুপরিচিত বৈশিষ্ট্য হল আলেখ্যনির্মাণ। সোজা করে বললে, এটা ঘটনাকে অন্য মোড়কে ঢেকে রূপকের ভঙ্গিতে উপস্থাপনা। কখনো খেলা, কখনো নৃত্য, কখনো যুদ্ধ, কখনো গান গাওয়া ইত্যাদির রূপকে বিষয়ের উপস্থাপনা বিষয়টিকে হাস্যকর করে তোলে, তার তুচ্ছতাকে, অকিঞ্চিৎকরতাকে, জনসমক্ষে বে-আব্রু করে। সকলের মনে পড়বে কুট্টির সেই বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রটি যেখানে প্রফুল্ল সেন দারা সিং হয়ে প্রতিপক্ষ জ্যোতি বসু ও কংগ্রেসের অরুণ মৈত্রকে ফ্রি স্টাইল কুস্তিতে আহ্বান করছেন। চোখে চশমা ও কৌপীন পরিহিত প্রফুল্ল সেনের এই কুস্তির ভঙ্গিমা, তাঁর এক 'প্যাঁচে দুই পালোয়ানকে চিৎ' করার আস্ফালন, কার্টুনটিকে কালজয়ী সৃষ্টি বলে চিহ্নিত করেছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রী হবার বাসনাকে বিঁধে নির্মিত সুরেন্দ্রর অসামান্য কার্টুনটির কথা (চিত্র-৭)। ভারতের ম্যাপ জুড়ে হার্ডল রেসের ট্র্যাক। স্প্রিন্টার মোদী গুজরাট থেকে সর্টকাট ধরে দিল্লি যেতে উদ্যত। মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে রেফারি 'Modiji, this way to Delhi' বলে তাঁকে কোন ট্র্যাকে ছুটতে হবে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছেন। সে ট্র্যাক পশ্চিমকূলে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক হয়ে কেরল থেকে পূর্ব উপকূল বরাবর তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে উত্তরমুখে বিহার, উত্তরপ্রদেশ হয়ে দিল্লি গেছে। প্রতি রাজ্য এক একটা হার্ডল, যার প্রতীকী তাৎপর্য হল এই রাজ্যগুলিতে অ-বিজেপি সরকার। এতগুলি হার্ডল টপকাতে পারলে তবে মোদীর প্রধানমন্ত্রী হবার শখ মিটবে। ধন্য উদ্ভাবনী বুদ্ধি!

পর্যবেক্ষণ শক্তি আর বর্তমান সময়ের সমস্যাকে, কদর্যতাকে রসকল্পে বাঁধার ক্ষমতা চাই কার্টুনিস্টের। শুধু পর্যবেক্ষণ থাকলে হবে না, ঘটনার মধ্যেকার অসামঞ্জস্যটা খুঁজে বার করার অন্তর্দৃষ্টি চাই কার্টুনিস্টের, আর চাই সীমিত পরিসরে উপভোগ্য করে তাকে তুলে ধরার দক্ষতা। দেশভাগের সময় থেকে ভারত-পাক বৈদেশিক সম্পর্ক দু-দেশের জ্বলন্ত সমস্যা। বহু আলোচনা, বহু চুক্তি, কূটনৈতিক বাক্যালাপ সত্ত্বেও সাত দশক ধরে দু-দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটেই চলেছে। এই বাস্তবতাকে নিয়ে সুরেন্দ্র-র আঁকা একটা ক্ল্যাসিক কার্টুন হল অষ্টম ব্যঙ্গচিত্রটি। কোনো কথা নেই; তিনটি ফ্রেমে তিনটি টেবিল, প্রতি টেবিলের দু-প্রান্তে একটি করে চেয়ার এবং টেবিলের ওপর দু-দেশের জাতীয় পতাকা।

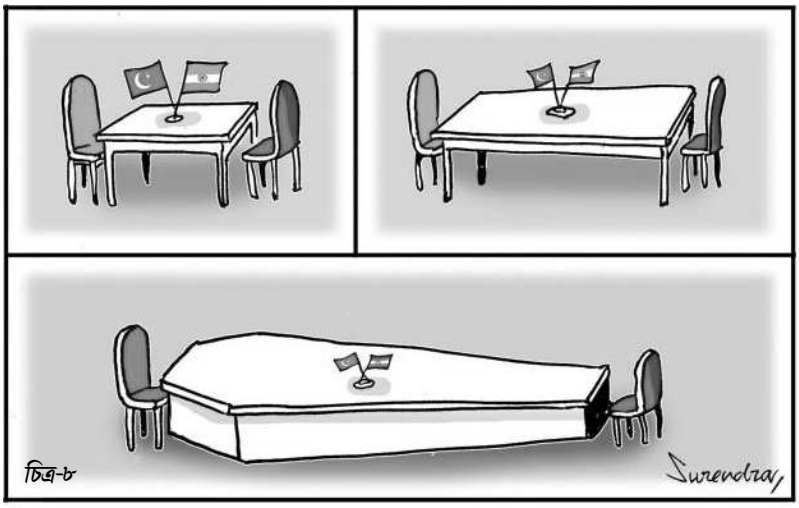

চিত্র-৮

বোঝা যায় টেবিল হল কূটনৈতিক আলাপচারিতার প্রতীক। তবে যেটা মনে দাগ কেটে যায় তা হল প্রথম ফ্রেমে টেবিল ছোটো পতাকা বড়, দ্বিতীয় ফ্রেমে পতাকা তুলনায় ছোটো হয়েছে, টেবিলের দৈর্ঘ্য বেড়েছে। তৃতীয় ফ্রেমে টেবিলের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি আর পতাকার আকৃতি ক্ষুদ্রতম। অর্থাৎ আলাপ-আলোচনা যত বাড়ছে বিশ্বাস তত কমছে। তবে ভালো করে নজর করলে যেটা দৃষ্টি এড়ায় না তা হল তৃতীয় ফ্রেমের লম্বা টেবিলটি আসলে কফিন। পরিহাস ছলে যে কঠিন বাস্তবকে এখানে চিত্রিত করা হল তা হচ্ছে—আলোচনা চলছে, শান্তিপ্রস্তাব নেওয়া হচ্ছে বটে কিন্তু হিংসার বিরাম নেই। আলোচনার ক্ষেত্রের বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে মৃত্যুমিছিল। বাস্তবের এহেন ব্যঙ্গাত্মক নির্মাণই কার্টুনের অমোঘ শক্তি।

কার্টুনে সাম্প্রতিক কালের ব্যাধি-বিকৃতিকে শ্লেষাত্মক ঢঙে চিত্রিত করার একমাত্র উদ্দেশ্য তার সংস্কার ও সংশোধন। এ-প্রসঙ্গে Fischer যথার্থই বলেছেন যে, কার্টুনের লক্ষ্য হল 'to influence public opinion through its use of widely and instantly understood symbols, slogans, referents and allusions.' নির্বাচিত বিষয়টি যত না ব্যক্তিক তার চেয়ে ঢের বেশি সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ সত্য উপলব্ধি করতে হলে নয় নম্বর ব্যঙ্গচিত্রে চোখ রাখতে হবে। সিবিআই একটি স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা হলেও কখনো তা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিল না। বর্তমানে দেশজুড়ে এই নিয়ে প্রতিবাদের ঢেউ উঠলে কেন্দ্রীয় সরকার সিবিআই-কে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণমুক্তির কথা বলে। এ হল কথার কথা। শাসক কখনোই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ক্ষমতার ভাগাভাগি সহ্য করতে পারে না। এই বিষয় নিয়েই ব্যঙ্গচিত্রটি, যাতে গোঁজে বাঁধা একটি কুকুরকে (CBI) ঘুরতে দেখা যাচ্ছে প্রথম ফ্রেমে, যাকে 'Today' বা বর্তমান অবস্থা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় ফ্রেমে 'Tomorrow' বা আগামী দিনে CBI কেমন চলবে তা নিয়ে বক্রদৃষ্টি ক্ষেপণ করা হয়েছে। গোঁজটা কেন্দ্র থেকে পরিধিতে পোঁতা, কুকুররূপী CBI বৃত্তের বাইরে যেতে উদ্যত কিন্তু শেকলটা তার গলার বদলে ল্যাজে বাঁধা। অর্থাৎ CBI-কে স্বাধীনতা দেবার কোনো সদিচ্ছা নেই শাসকের।

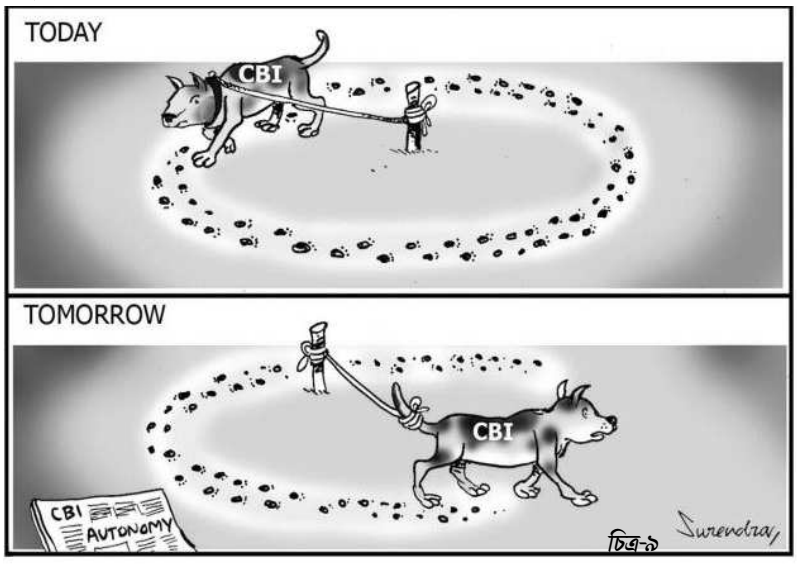

চিত্র-৯

তবে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যার গায়েই হুল ফোটানো হোক না কেন, উপস্থাপিত ব্যঙ্গ চিত্রটিকে বিদ্বেষবর্জিত হতে হবে। তামাশা কষাঘাতে পরিণত হলে কার্টুনের লঘু-মেজাজটি নষ্ট হয়ে যায়, ঠাট্টা-মস্করা আর নির্মল থাকে না, চিত্রায়িত খেউড়িতে পতিত হয়। তবে কার্টুনের স্বাদগ্রহণ সবার ধাতে নেই। জওহরলাল নেহরুর রসবোধ এত উচ্চাঙ্গের ছিল যে তাঁকে নিয়ে আঁকা ব্যঙ্গচিত্র দেখেও তিনি মেজাজ হারাতেন না। যে

চিত্র-১০

কোনো কার্টুনের আবেদন পাঠক-দর্শকের এই রসবোধের কাছে। যাঁকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে তিনিও দর্শক হিসেবে এটি উপভোগ করবেন এটাই রীতি। শুধু যে ব্যাধিটিকে খোঁচা দেওয়া হয়েছে সেটি সংশোধন করতে হবে। রসবোধ বা sense of humour না থাকলে, বন্দুক উঁচিয়ে তেড়ে গেলে, কার্টুনিস্টের ক্ষতি হয় না, আক্রমণকারীর ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। বরং অনাবশ্যক শোরগোল তোলায় কার্টুনটি মাত্রাতিরিক্ত প্রচার পায়। সবচেয়ে বড় কথা, শিল্পীরা ভিন্ন গোত্রের মানুষ। তাঁরা আঘাতকে গানে, হতাশাকে কবিতায় রূপ দিতে পারেন। দমন-পীড়ন করে গারদে পুরে তাঁদের তুলি-লেখনীকে স্তব্ধ করা যায় না, দশ নম্বর ব্যঙ্গচিত্রটি তার বড় প্রমাণ। চিত্রকরকে ফাটকে পুরলে, সেলের দেওয়ালকে ক্যানভাস বানিয়ে পুলিশের উর্দি খুলে

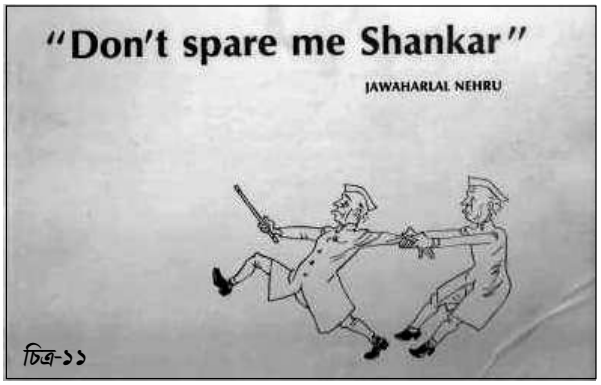

চিত্র-১১

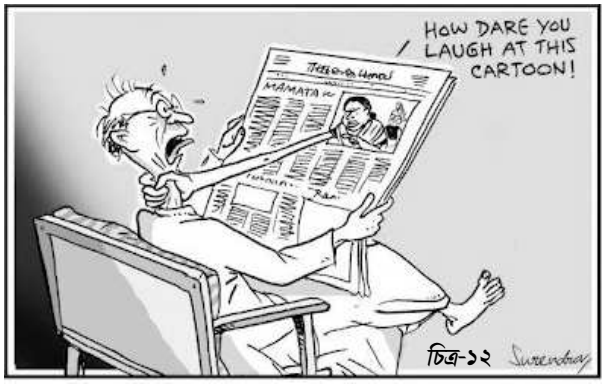

চিত্র-১২

কয়েদির পোষাকে তাকে চিত্রায়িত করে শিল্পী সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেই। কার্টুনকে যদি আমরা সরস ব্যঙ্গচিত্র বলে সংজ্ঞায়িত করি তাহলে এর প্রতিবাদী চরিত্রকে সম্মান করতে হবে। টার্গেট অব অ্যাটাক অর্থাৎ ব্যঙ্গের লক্ষ্যস্থলে যদি কোনো ব্যক্তি থাকেন, তিনি নির্দোষ হলেও তাঁকে চটলে চলবে না, কারণ এটি শিল্পকর্ম। কার্টুনের কটাক্ষে খেপে গিয়ে কেউ মানহানির মামলা করলে, বা ক্ষমতা জাহির করতে কার্টুনিস্টকে শাস্তি দিলে কার্টুনিস্টের নির্দোষকে বেঁধার অসৎ উদ্দেশ্যই সফল হবে। 'As You Like It' নাটকে Jaques-এর সংলাপে শেক্সপীয়র তো কবেই বলে গেছেন যে বিদ্রূপ-কটাক্ষকে উপেক্ষা না করে প্রতিক্রিয়া দেখায় নির্বোধরা:

The wise man's folly is
anatomized
Even by the squandering
glances of the fool.

এ সত্য নেহরু বিলক্ষণ জানতেন, তাই তাঁর রাজনীতি নিয়ে যিনি সবচেয়ে বেশি কটাক্ষ করেছেন সেই শঙ্করের উদ্দেশ্যে তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'Don't spare me Shankar'। অর্থাৎ আমি প্রধানমন্ত্রী হলেও আমাকে ছেড়ো না (চিত্র-১১)। শিল্পীর স্বাধীনতার এই সম্মাননাকে স্বীকৃতি দিয়ে তাই ২০০৯ সালে বাঙ্গালোরে যে সুবিখ্যাত কার্টুন প্রদর্শনী হয় তার নাম দেওয়া হয় 'Don't spare me Shankar'। আমরা বাঙালিরা মগজের বড়াই করি, কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা কি সভ্য দুনিয়ার তুলনায় পিছিয়ে পড়ছি? কার্টুনে রাজনৈতিক গন্ধ শুঁকতে যাওয়ার আগে সেটা একবার ভাবা দরকার।

With best compliments of

PRACHESTA SELF HELP GROUP

(Lic. No. 19026/06-07, Dt. 26-06-2006)

All Sorts of Civil, Construction/Mechanical Jobs, Labour & General Order Supplier

Regd. Office : B.B.D. Nagar, Sagarbhanga, P.O. Durgapur-11, Dist. Burdwan
Camp Office : Qr. No. Q-2, Sagarbhanga Colony, P.O. Durgapur-11, Dist. Burdwan
Mob. 9832749263, Ph. 0343-6453962

Sl. No. 119

Space Donated by

M A L A K A R E N T E R P R I S E

CIVIL, MECHANICAL CONTRACTOR AND GENERAL ORDER SUPPLIER

D-25/S, Sagarbhanga Colony, Durgapur-713211, Burdwan
Contact : 7797770088, 9474444867

Sl. No. 114

প্রচারবিমুখ বিজ্ঞানী ওবেইদ সিদ্দিকি

শ্যামল চক্রবর্তী

ওবেইদ সিদ্দিকি। উত্তরপ্রদেশের বস্তি শহরে ১৯৩২ সালের ৭ জানুয়ারি তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অনেকে বলেন, এককালে এখানে বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম ছিল। তাই নাম হয়েছিল 'বৈশিষ্ঠি'। সহজ কথায় 'বস্তি'।

সুশিক্ষিত পরিবারে ওবেইদ-এর জন্ম। জ্ঞাতিদের মধ্যে বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, চিকিৎসক, সমাজবিদ ও সাহিত্যিক খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর বাবার নাম জনাব আবদুল কাদির খান। মায়ের নাম উম্মি কুলসুম।

স্কুলের পড়া শেষ করে ওবেইদ সিদ্দিকি ১৯৫১ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে ভর্তি হন। ছোটোবেলায় ভেবেছিলেন আলোকচিত্রী হবেন। হতে আর পারলেন কই! তবে হেসে বলতেন, ''আমি তো ছবিই তুলি। নিজের ছবি, ডি.এন.এ-র ছবি।'' যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, জানেন, মুখে তাঁর হাসি সব সময় লেগে থাকতো। ভেবেছিলেন সেতার শিখবেন। সেতারের মূর্ছনা তাঁর খুব প্রিয় ছিল। একবার সঙ্গীত সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-র কন্যা অন্নপূর্ণার কাছে সেতার শিখবেন বলে গিয়েছিলেন। শেখা হয়নি সেতার। বিজ্ঞানের জগতে ডুব দিলেন।

উদ্ভিদবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর ওবেইদ সিদ্দিকি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৫৩ সালে তিনি উদ্ভিদবিজ্ঞানে এম.এস-সি. পাশ করেন।

পড়াশুনোর মানুষরা আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সকলেই শুনেছেন। ১৮৭৫ সালে সৈয়দ আহমেদ খান আলিগড়ে 'মহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ' গড়ে তুলেছিলেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে এটি 'আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়' হয়েছে। কেরালার পালাপ্পুরম ও পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো শাখা হয়েছে।

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। তিন বছর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ আমাদের সারা দেশেই পরিচিত। ১৯২৩ সালে এই বিভাগ তৈরি হয়েছে। শুরুতে গবেষণা হতো না। ১৯৩৫ সাল থেকে গবেষণার কাজ শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে পঁচানব্বুই একর জায়গা জুড়ে উদ্ভিদ উদ্যান রয়েছে যা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বড়ো সম্পদ।

১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ওবেইদ সিদ্দিকি আলিগড়ে পড়িয়ে দিল্লির ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে গবেষক পদে যোগদান করেন। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি কাউকে বলবার দরকার পড়ে না। আমাদের দেশে 'সবুজ বিপ্লব' নিয়ে ভালো-মন্দ যতোই বিতর্ক থাকুক, যে-সময়ে আমাদের দেশে এই কর্মযজ্ঞ হয়েছে তা না হলে আমাদের অনেক মানুষ খাবার না পেয়ে মারা যেতেন। আর এই কর্মযজ্ঞের মূল কারিগর ছিলেন এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা। ১৯০৫ সালে প্রথম বিহারের সমস্তিপুরে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। ১৯৩৪ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পরে দিল্লির পুষা এলাকায় প্রতিষ্ঠানটি স্থানান্তরিত হয়। আমাদের দেশের কৃষি ও কৃষি গবেষণায় এর ভূমিকা সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেন।

বছর দুই মতো ওবেইদ সিদ্দিকি ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এ ছিলেন। তারপর তিনি গবেষণার জন্য গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। ইংরেজি ভাষাভাষী দেশগুলির মধ্যে প্রাচীনত্বের দিক থেকে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান ছিল চতুর্থ। ১৪৫১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পৃথিবীর একশোটি সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নিশ্চিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সতীর্থ তালিকা ওনার বিস্ময় তৈরি করে। জেম্‌স ওয়াট, অ্যাডাম স্মিথ, লর্ড কেলভিন, সাতজন

নোবেল জয়ী, দু-জন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। ব্রিটেনে যেমন অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের 'লড়াই', তেমনি স্কটল্যান্ডে এডিনবরা-গ্লাসগোর 'লড়াই'। এমন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুযোগ পেলে দু-একবছর ক্ষতি সামলে নিশ্চিন্তে যোগ দেওয়া যায়। ওবেইদ সিদ্দিকি ঠিক তাই করেছিলেন। তিনি যাঁর কাছে গবেষণার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি নিছক গ্লাসগোর অধ্যাপক ও গবেষক নন, সারা পৃথিবীতে তাঁর খ্যাতি রয়েছে। তাঁর নাম গুইডো পন্টেকর্ভো। ১৯০৭ সালে ইতালির পিসায় তাঁর জন্ম। ইতালিতে মুসোলিনির ঘৃণ্য আক্রমণ ও ইহুদি নিধনযজ্ঞ শুরু হলে ১৯৩৮ সালে পন্টেকর্ভো ব্রিটেনে পালিয়ে যান। নিজেকে তিনি পরিচয় দিতে গিয়ে 'ফ্যাসিবাদের উদ্বাস্তু' বলতেন। অণুজীব প্রজননবিদ্যার তিনি একজন বিশ্বসেরা বিজ্ঞানী। ইতিহাস আগ্রহী মানুষেরা জানেন, ১৯৩৩ সালে ইউরোপ মহাদেশের উদ্বাস্তুদের মধ্যে যাঁরা অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী ছিলেন, তাঁদের সাধ্যমতো পুনর্বাসনের জন্য 'সোসাইটি ফর দ্য প্রটেকশন অব সায়েন্স অ্যান্ড লার্নিং' নামে একটি সংগঠন তৈরি হয়। এই সংগঠন ম্যাক্স বর্ন, অর্নস্ট চেইন, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, রুডল্ফ পার্লস ও ম্যাক্স পেরুজের মতো বিজ্ঞানীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। রুডল্ফ পার্লস বাদ দিয়ে সকলেই নোবেলজয়ী। ইতালির টাসকোনিতে চাকুরি করতেন পন্টেকার্ভো। তাঁকে ফ্যাসিবাদের কবলে পড়তে হয়। সোসাইটির পক্ষ থেকে স্কলারশিপ দিয়ে তাঁকে এডিনবরায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে বিখ্যাত প্রজননবিদ্ হার্মান যোসেফ মুলারের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। তাঁর অধীনে ডক্টরেট করার সুযোগ পেলেন পন্টেকার্ভো। ১৯৫৫ সালে গ্লাসগো বিশ্বদ্যিালয়ে প্রজননবিদ্যার একটি অধ্যাপক পদ প্রবর্তিত হয়। গুইডো পন্টেকর্ভো সেই পদে যোগ দেন। ২০০৭ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে একটি নিবন্ধে জনৈক বিজ্ঞানী লিখেছিলেন, ওই পদে যোগ দিয়ে তিনি সোসাইটির স্কলারশিপ ফেরত দিতে চেয়েছিলেন।

তীব্র রঞ্জনরশ্মির প্রভাবে স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীর বন্ধ্যাত্বের কী বদল ঘটে, জিনেরই বা কী বদল হয়, এসব নিয়ে সাড়া জাগানো কাজ করেছেন পন্টেকর্ভো। তখন প্রাণীবিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা প্রজননতত্ত্ব নিয়ে কাজ করতেন, বেশিরভাগই ড্রসিফিলা নিয়ে গবেষণা করতেন। ওই নিবন্ধকার দুঃখ করে লিখেছিলেন, যে ফল তিরিশ বছর আগেই তাঁদের পাওয়ার কথা ছিল, তা তাঁরা তিরিশ

গুইডো পন্টেকর্ভো

বছর পরে পেয়েছেন। পেনিসিলিন উৎপাদনের সময় অণুজীবের উপর রঞ্জনরশ্মি প্রয়োগ করলে কী ফলাফল ঘটতে পারে এই নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলেন তিনি। ১৯৪৩ সালের কথা। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। আমেরিকায় চলছে তখন পেনিসিলিন নিয়ে নানা গবেষণা। তিনি তাঁর কাজে আর উৎসাহ পেলেন না। জে.বি.এস. হলডেনের 'জীব পরিসংখ্যানবিদ্যা'র কাজ তিনি খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। যে নিবন্ধটির কথা আমরা এখানে বলছি, সেটি পড়তে চাইলে নীচের সূত্র দেখতে হবে—

জেনেটিক্স, ২০০৭ নভেম্বর, ১৭৭(৩), ১৪৩৯-১৪৪৪

আমরা নিশ্চিত, আমাদের পাঠকবন্ধুরা বুঝতে পারছেন, এমন বিজ্ঞানীর কাছে গবেষণা করার সুযোগ পেলে একজন ছাত্র বছর দু-এক 'নষ্ট' করেই তাঁর কাছে গবেষণায় যোগ দেবেন। ওবেইদ সিদ্দিকি বিন্দুমাত্র ভুল করেননি। তিনি সেই কাজটুকুই করেছিলেন।

হার্মান মুলার ১৯৪৬ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। নোবেলজয়ীর ছাত্র মন্টেকর্ভো। পন্টেকর্ভোর ছাত্র ওবেইদ সিদ্দিকি। ১৯৫৫ সালে পন্টেকর্ভো রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর স্মৃতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বাঁচিয়ে রেখেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বাড়িতে প্রজননবিদ্যা বিভাগ রয়েছে সে বাড়ি গুইডো পন্টেকর্ভোর নামে নামাঙ্কিত। পন্টেকর্ভোকে নিয়ে শেষ যে কথা বলব তা হল এই, ১৯৯৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি প্রয়াত হয়েছেন। রয়াল সোসাইটির ফেলোদের নিয়ে পরপর একাধিক খণ্ডে যে স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে চলেছে তার একটি খণ্ডে গুইডো পন্টেকর্ভোকে নিয়ে বিস্তারিত নিবন্ধ যিনি লিখেছেন তিনি তাঁর প্রিয় ছাত্র ওবেইদ সিদ্দিকি। ২০০২ সালে সেই স্মৃতিগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

ছত্রাকের ডি.এন.এ. পুনঃসংযোজন নিয়ে ডক্টরেট থিসিস করেছিলেন ওবেইদ। এটি অণুজীববিদ্যার এক বড়ো কাজ ছিল। ইংরেজিতে তাঁর কাজের বিষয়টিকে বলা হয় 'মাইক্রোবায়াল জেনেটিক্স'। দুটো বিষয় একসঙ্গে গাঁথা এখানে। 'মাইক্রোবায়োলজি' আর 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং'। 'pabA' জিনের সামগ্রিক মানচিত্র গঠন করেছেন ওবেইদ। জিন মানচিত্রের গঠন বলতে কী বোঝায়? নিউক্লিক অ্যাসিড প্রচুর জিন দিয়ে তৈরি থাকে। সেই জিনগুলি আবিষ্কার করে পরপর জুড়লে তবে জিন মানচিত্র পাওয়া যায়।

জীববিদ্যার জগতে 'মিউটেশন' বলে একটা কথা আছে। নানা কারণে কোনো নিউক্লিক অ্যাসিড অণুর দু-চারটে জিন বদলে গেলে তাকে 'মিউটেশন' বলে। এক ধরনের 'মিউটেশন'কে বলা হয় 'ননসেন্স মিউটেশন'। শুনতে 'ননসেন্স' হলেও মোটেই 'ননসেন্স' নয়। স্কুলের বই থেকেই আমরা সকলে পড়েছি যে নিউক্লিক অ্যাসিড প্রোটিন তৈরি করে। জিন দিয়ে নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি। এক একটা জিন তাহলে এক একটা প্রোটিন তৈরি করে। জিন আবার নানারকমের অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি। এক একটি অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরির জন্য জিনের দেহেই এক একটি সংকেত রয়েছে। এই সংকেতকে বলা হয় 'কোডন'। যখন 'ননসেন্স মিউটেশন' হয়, এমন কোডন তৈরি হয় যা প্রোটিন তৈরি মাঝপথে থামিয়ে দেয়। শরীর যে প্রোটিন চাইছিল সেই প্রোটিন হয়তো তৈরিই হল না। থ্যালাসেমিয়া রোগের বেলায় এমন 'ননসেন্স মিউটেশন' দেখা যায়। কিছু পেশীগত রোগের বেলায়ও এই 'ননসেন্স মিউটেশন' চোখে পড়ে। প্রোটিন তৈরিতে বিপত্তি হলে নানা বাধাবিপত্তিও বাড়তে থাকে। সে আলোচনার কোনো শেষ নেই। তবে এতো কথা বলা হল এই জন্য যে ১৯৬১ সালে ওবেইদ সিদ্দিকি ও অ্যালান গ্যারেন 'অ্যালকালাইন ফসফাটেজ' নামের এক প্রোটিনের জিনের ননসেন্স মিউটেশন আটকে দিতে পারে এমন দমনকারী অণু আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কার প্রোটিন সংশ্লেষণের বেলায় কখন প্রোটিন শৃঙ্খল তৈরি বন্ধ হবে সেই বিষয়ে নানা তথ্যের অনুসন্ধান দেয়। একে নিঃসন্দেহে অণুজীববিদ্যার মৌলিক কাজ

বলা চলে। আমরা সকলেই জানি, জেমস ওয়াটসন, ফ্রান্সিস ক্রিক ও মরিস উইলকিন্স ১৯৫৩ সালে রোজালিন ফ্র্যাঙ্কলিনের তোলা ডি.এন.এ-র ছবি দেখে ডি.এন.এ-র 'ডাবল হেলিক্স' গঠন আবিষ্কার করেছেন। তখন পৃথিবী জুড়ে অণুজীববিজ্ঞানীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এই অণুর গবেষণায়। পড়তে তো হবেই। এই অণুই যে বংশগতির ধারক ও বাহক। সেই তীব্র প্রতিযোগিতার যুগে ওবেইদ সিদ্দিকি এমন উঁচু মানের কাজ করেছেন যা আমাদের দেশের সম্মান বহুগুণ বাড়িয়েছে। তাঁর দশ বছর আগে জন্মেছেন, বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খোরানার কথাও আমাদের বলতে হবে। তিনিও তো ২০১১ সালে চিরকালের মতো চলে গেলেন।

ডক্টরাল কাজ শেষ করে ওবেইদ দেশে ফেরেননি। এমন তিনটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে তিনি পোস্টডক্টরাল কাজ করেছেন যা সকলের কাছে ঈর্ষণীয় বলে মনে হবে। প্রতিষ্ঠান তিনটির নাম 'কোল্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবরেটরি', 'পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়' ও কেমব্রিজের 'এম আর সি ল্যাবরেটরি অব মলিকুলার বায়োলজি'। শেষ গবেষণাগারের কথা বিশেষ করে বলব। এই ল্যাবরেটরির প্রাণপুরুষ ছিলেন ফ্রেডেরিক স্যাঙ্গার। বেঁচে আছেন তিনি। পঁচানব্বুই বছর পার করেছেন। তিনি পৃথিবীর চার বিজ্ঞানীর একজন, যিনি দুবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ভেঙ্কি রামকৃষ্ণণ ২০০৯ সালে নোবেল পেয়েছেন। এই গবেষণাগারের তেরোজন গবেষক ন-খানা নোবেল পুরস্কার এনেছেন, এরপর কার সাধ্য এমন প্রতিষ্ঠানের নাম ভুলে যেতে পারে? কোনো প্রতিষ্ঠানেরই একশোভাগ গবেষক নোবেল পান না, কয়েকজন যেখানে নোবেল পান, সকল গবেষককেই যে শক্ত পরীক্ষা দিয়ে সেই গবেষণাগারে জায়গা পেতে হয় একথা আমরা সকলেই বুঝতে পারি। চাইলে ওবেইদ সিদ্দিকি বিদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারে আজীবন থেকে যেতে পারতেন। আর্থিক বিচারেও তিনি লাভবান হতেন অনেক বেশি। দেশ থেকে আহ্বান গেল তাঁর কাছে। হোমি জাহাঙ্গির ভাবা চাইছেন তাঁকে। ভাবা সে-সময় 'টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ গড়ে তুলছেন।

ভাবা একজন সার্থকনামা পদার্থবিদ। তবু তিনি বুঝতে পারতেন, আগামী দিনে অণুজীববিদ্যা মানুষের জীবনে বড়ো ভূমিকা পালন করবে। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওবেইদ দেশে ফিরে এলেন। ১৯৬২ সালে মুম্বাইয়ের 'টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ'-এর গবেষণাগার তৈরির দায়ভার কাঁধে তুলে নিলেন। ওবেইদের বয়স তখন তিরিশ বছর।

আমাদের দেশে দেখা যায়, এমন দায়ভার কাঁধে তুলে নিলে বেশিরভাগ মানুষেরই আর গবেষণা জীবন থাকে না। তিনি ছিলেন তার ব্যতিক্রম। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি-র বিজ্ঞানী সিমুর বেঞ্জারের সঙ্গে ড্রসিফিলার এমন জিন দিয়ে কাজ করেন যা এঁরাই প্রথম আবিষ্কার করেছেন ও স্নায়ুর সংবহনে সেই জিনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। একি বড়ো মাপের কাজ নয়? স্নায়ুজীববিদ্যার এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলতে ওবেইদ সিদ্দিককে বোঝায়। এই বিদ্যার জগত অনেক বেশি রহস্যে আবৃত। বিজ্ঞানের সহায়তা নিয়ে তিনি তার রহস্য প্রতিদিন উন্মোচন করেছেন। বেঞ্জার ছিলেন পদার্থবিদ্যার ছাত্র। পরে অণুজীববিদ্যায় গবেষণা করেছেন। কেমন করে ওবেইদ পন্টেকর্ভোর কাছে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন সে ঘটনা পাঠকদের জানতে ভালো লাগবে। দেশের মাটিতে তিনি উদ্ভিদ ভ্রূণতত্ত্ব নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টিতে তাঁর গবেষণা উদ্যানের সকল উদ্ভিদ নষ্ট হয়ে গেল। শিলাবৃষ্টি তবে কি উপকারও করে? ওবেইদ খানিকটা বিষণ্ণ হয়েই পন্টেকর্ভোর কাছে চিঠি লিখে গবেষণা করতে চেয়েছিলেন। উত্তরে পন্টেকর্ভো লিখলেন, ''গ্লাসগোতে এসো। ইন্টারভিউ দাও। তারপর ঠিক করব।'' ১৯৫৮ সালে ওবেইদ গ্লাসগোতে গেলেন। মন্টেকর্ভোর ল্যাবে গিয়ে ইন্টারভিউর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর আর ডাক আসে না। উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, তিনি নির্বাচিত। নির্বাচিত! ইন্টারভিউ-ই তো দেওয়া হয়নি। পন্টেকর্ভোর উত্তর ছিল খুব সহজ। যে শুধু ইন্টারভিউ দিতে অতটা পথ চলে আসতে পারে, তাঁর কাজের প্রতি আগ্রহের খবর জানবার দরকার নেই। এখানেই তিনি 'paba' জিনের জিনমানচিত্র সমাধা করেছেন, যে কাজের কথা আগে আমরা বলেছি। একটি কথা আমরা আগে বলিনি, এটি ছিল তাঁর একক গবেষণাপত্র।

১৯৬১ সালে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যালান গেরেনের ল্যাবে যোগ দিয়েছিলেন ওবেইদ। তাঁদের কাজের কথাও আগে বলেছি। সে সময় ওবেইদ কোল্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবের বক্তৃতায় নিয়মিত যেতেন। অণুজীববিদ্যার অগ্রণী গবেষকদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব তৈরি হয়। পরে তাঁর আমন্ত্রণে এঁদের অনেকেই আমাদের দেশে এসেছেন। ফিলাডেলফিয়ায় বিজ্ঞানী লিও জিলার্ডের সঙ্গে ওবেইদের পরিচয় হয়েছিল। জিলার্ড ওবেইদ-কে ভালোবাসতেন খুব। নিজের সন্তানের মতো। ওবেইদ-এর চেয়ে তিনি চৌত্রিশ বছরের বড়ো ছিলেন। জিলার্ড আবার হোমি জাহাঙ্গির ভাবার বন্ধু ছিলেন খুব। ভাবা যখন একজন ভালো অণুজীববিজ্ঞানের গবেষক খুঁজছিলেন, যিনি শুধুমাত্র গবেষণা করবেন না, গবেষণাগারের ভাবীকাল রচনা করবেন, জিলার্ড বিনা দ্বিধায় হোমি জাহাঙ্গির ভাবার কাছে ওবেইদ সিদ্দিকির নাম সুপারিশ করেন। লস অ্যালামস প্রকল্পের আখ্যানে লিও জিলার্ডের নাম নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে।

'অণুজীববিদ্যা' কথাটা আজকাল বিজ্ঞানের ছাত্রদের মুখে মুখ ফিরছে। কিন্তু একসময় জীবরসায়নবিদেরা এই শব্দ পছন্দ করতেন না। যখন নানা জৈব অণুর আধিপত্য আবিষ্কৃত হতে শুরু করল, ডি.এন.এ.-র দাবি প্রতিষ্ঠা পেল বংশগতির ধারক ও বাহক হিসাবে, জীবরসায়নবিদেরা এই শব্দের মানে খুঁজে পেলেন। এখন তো এই বিষয়ে কমবেশি ধারণা না থাকলে তাঁকে জীবরসায়নবিদ-ই বলা চলে না।

যাই হোক, ওবেইদ সিদ্দিকির গবেষণাদলে যোগ দেন পবিত্র মৈত্র ও জিতা লবো। 'টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ ড. জিতা লবোর নামে প্রতিষ্ঠানের 'বায়োলজিক্যাল ও কেমিক্যাল সায়েন্স' বিভাগের সেরা গবেষণাকে পুরস্কৃত করে।

টি.আই.এফ.আর-এ ওবেইদ সিদ্দিকি 'ব্যাকটেরিয়াল জেনেটিক্স' নিয়ে কাজ শুরু করেন। পবিত্র মৈত্র 'ইস্ট জেনেটিক্স' নিয়ে কাজ করেন। জিতা লবো শর্করা বিপাকের জিনতত্ত্বের তথ্যাদি অনুসন্ধান করেন।

১৯৭৬ সালে গবেষক ছাত্রী ভেরোনিকো রডরিক্স-এর সঙ্গে ওবেইদ ড্রসিফিলার উপর কাজ করেন। ড্রসিফিলার রাসায়নিক অনুভূতির জন্য কোন্ জিনেরা দায়ী, অনুসন্ধান করেন তিনি। এর ঘ্রাণ ও স্বাদ গ্রহণের জিন চিহ্নিত করেন।

ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট বিজ্ঞানী কে বিজয় রাঘবন ওবেইদ সিদ্দিকির আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি শ্রদ্ধানিবন্ধ রচনা করেছিলেন। রচনাটির তারিখ ৩০ ডিসেম্বর ২০১১। অধ্যাপক বিজয়রাঘবন কিছুকাল আগে রয়াল সোসাইটির ফেলো হয়েছেন। ভারত সরকারের জীবপ্রযুক্তি বিভাগের তিনি সচিব।

১৯৯৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এডওয়ার্ড বি লুইস। ১৯১৮ সালে জন্ম। ২০০৪ সালে মারা যান। যেসব মাছি

পাকা ফলের গন্ধে ভনভন করে ঘুরে বেড়ায় তাদের প্রজননবিদ্যা নিয়ে অসামান্য কাজ করেছেন লুইস। তাঁর একটি বিখ্যাত বইয়ের নাম 'জিন্‌স, ডেভেলপ্‌মেন্ট অ্যান্ড ক্যান্সার' যা তাঁর মৃত্যুর বছরে প্রকাশিত হয়েছে। 'ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি'র এই বিজ্ঞানীর সঙ্গে ১৯৮৪ সালে কথা হচ্ছিল বিজ্ঞানী বিজয়রাঘবনের। লুইস তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, ''তুমি কি ভারত থেকে এসেছো?'' মাথা নাড়তেই তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, ''টাটা থেকে?'' আবার যখন মাথা নাড়লেন, তিন নম্বর প্রশ্ন ছিল ''তুমি কি সিদ্দিকিকে চেনো? একজন মানুষ কী করে অ্যাসপারজিলাস, কোলাই, ড্রসিফিলা নিয়ে অতগুলো চমৎকার কাজ করেছেন ভাবতেই পারছি না। আমি তো একটা বিষয় খুঁজতেই হিমসিম খেয়ে যাই।'' এই প্রশ্নের উত্তর স্বভাবতই বিজয়রাঘবন খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ১৯৮৪ সালে বিজয়রাঘবনের বয়স ছিল তিরিশ বছর। বিজয়রাঘবন একথাও লিখেছেন, আমি সে-সময় বড়ো বিজ্ঞানী যাঁদের বলে, তেমন বেশি মানুষকে চিনতাম না। ওবেইদ যে 'অন্যরকম', তা-ও বুঝিনি। তবে লুইসের সেদিনকার জিজ্ঞাসা বিজয়রাঘবনের ভাবনার পথ প্রশস্ত করেছিল। তারপরেও লুইস বলতে থাকলেন : ''টাটা (ভারতের বাইরে এমন নামেই পরিচিত) খুব অসাধারণ জায়গা। বাবু আমাদের সঙ্গে আছে, খুব ভালো কাজ করছে। তুমি যদি কাজেই এসে থাক, ঝাঁপিয়ে পড়ো।'' বিজয়রাঘবন বলতে দ্বিধা করেননি, 'টাটা' থেকে গিয়েছেন বলে যতোটা প্রশংসা তিনি পেয়েছেন, ওবেইদ-কে চিনতেন বলে তার চেয়ে কিছু কম প্রশংসা পাননি। টাটার বিজ্ঞান-সংস্কৃতি রচনায় ওবেইদ-এর ভূমিকা অনন্য, একথা বিজয়রাঘবন লিখেছেন।

বিজ্ঞানের নতুন শাখার গবেষণা সরণি নির্মাণ করেছেন ওবেইদ সিদ্দিকি। এরপর তিনি প্রতিষ্ঠান গড়ায় হাত দিতে চান। গড়ে তুললেন 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস'। টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের শাখা হিসাবে ব্যাঙ্গালোরের বেলারি রোডে ১৯৯২ সালে এই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ভারত সরকারের পরমাণু শক্তি বিভাগ এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয় অনুমোদন করে। আধুনিক

ওবেইদ সিদ্দিকি

অণুজীববিদ্যার একাধিক শাখায় এই প্রতিষ্ঠানে গবেষণা পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর ওবেইদ সিদ্দিকি মুম্বাই থেকে ব্যাঙ্গালোরে চলে এলেন। 'ইন্ডিয়ান বার্ডস' জার্নালের সঙ্গে যৌথভাবে এই গবেষণাকেন্দ্র 'মাইগ্রান্ট ওয়াচ' নামে পরিযায়ী পাখিদের উপর একটি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করে। ওদের একটা ওয়েবসাইট আছে। যে কেউ নতুন কোনো পরিযায়ী পাখি দেখলে তার ছবি ও আচার আচরণের কথা ওয়েবসাইটে লিখে পাঠাতে পারেন। দুটো বিষয়ের গবেষণায় এই প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। একটি 'স্টেম কোষ গবেষণা'। অন্যটি 'সিস্টেম বায়োলজি'। শুরু থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ওবেইদ সিদ্দিকি এই গবেষণা কেন্দ্রের অধিকর্তা ছিলেন। তিনিই প্রতিষ্ঠাতা অধিকর্তা। তারপর তিনি এমেরিটাস অধ্যাপক ও সিনিয়র হোমি ভাবা ফেলো হিসাবে প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় জড়িত ছিলেন। ২০০৬ সালে তিনি ভারত সরকারের জাতীয় গবেষণা অধ্যাপক হবার দুর্লভ গৌরব অর্জন করেছেন। বলা দরকার, এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অধিকর্তা কে. বিজয়রাঘবন।

যে গবেষক ছাত্রছাত্রীরা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন তাঁরা সকলেই দেশে বিদেশ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। আমরা কয়েকজনের নাম করতে পারি, যেমন—আর.এন. সিং, বিজয় সারথি, সত্‌পাল সিং, শীলা ধোন্‌ডে, ভেরোনিকা রডরিক্‌স, কবিতা অরোরা, ভি সি জয়রাম, শহিদ সিদ্দিকি, তুহিন চক্রবর্তী, রবি রাজন, রশিদ মিস্ত্রি, স্বাতী যোশী, চম্পাকলি আয়ুব, অন্নপূর্ণা ভাট, অনিল গুপ্ত।

তাঁর পদক ও স্বীকৃতির সংখ্যা প্রচুর। ১৯৭৬ সালে তিনি ভাটনগর পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৮৪ সালে তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দেওয়া হয়। ১৯৯১ সালে পেয়েছেন গোয়েল পুরস্কার। ১৯৯২ সালে ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমি তাঁকে আর্যভট পদকে সম্মানিত করেছে। ২০০৪ সালে স্যার সৈয়দ লাইফটাইম পুরস্কার পেয়েছেন। ২০০৪ সালে পেয়েছেন বি.সি. রায় পুরস্কার। ২০০৬ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দান করে। ২০০৯ সালে 'স্যার সৈয়দ আহমদ খান ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ফর লাইফ সায়েন্সেস' পেয়েছেন। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, কলাণী বিশ্ববিদ্যালয়, আই.আই.টি. কানপুর ও আরও একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সাম্মানিক ডি.এস-সি. ডিগ্রি অর্জন করেন। ইন্ডিয়ান একাডেমি অব সায়েন্সের তিনি সভাপতি ছিলেন। ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমির ফেলো ছিলেন। রয়াল সোসাইটির ফেলো ছিলেন ওবেইদ সিদ্দিকি। মার্কিন জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমিও তাঁকে ফেলো হিসাবে সম্মান জানিয়েছে। প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস, ইউ.এস.এ-র মতো বিখ্যাত জার্নালের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হবার বিরল সম্মান তিনি অর্জন করেছেন।

২০১৩ সালের ২১ জুলাই বাঙ্গালোর শহরে এক পথদুর্ঘটনায় আহত হলেন ওবেইদ। ব্যাপটিস্ট হাসপাতালে ভর্তির পর পরীক্ষা করে জানা যায়, মস্তিষ্কে তিনি গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। চিকিৎসার কোনো ত্রুটি ছিল না। তবু ২৬ জুলাই পৃথিবী ছেড়ে চিরকালের মতো চলে গেলেন। রেখে গেলেন স্ত্রী আসিয়াকে। দুই পুত্র ইমরান ও কলিম আর দুই কন্যা যমুনা ও দিব্যাকে। আর রইল তাঁর অগণন গুণমুগ্ধ ছাত্র ও বিজ্ঞানী।

আমাদের দেশে তো বটেই, পৃথিবীর মাপকাঠির বিচারেও তিনি একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী। তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠান গড়ার কারিগর। দুঃখের সঙ্গে একটা কথা বলতেই হচ্ছে। কলকাতার সংবাদপত্রে তাঁর প্রয়াণ সংবাদ কোনো সাংবাদিকের কলমে লেখা হল না। বিজ্ঞান সংস্কৃতির জন্য যে বাংলা গর্ব করেছে একদিন, সেই ঐতিহ্য থেকে সরে আসার পথ কি আমরা প্রশস্ত করছি?

ভেনিজুয়েলা : হুগো সাভেজ ফ্রায়াস

সুধীর রায়

১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে যখন একদল স্প্যানিয়ার্ড নাবিক ও অভিযাত্রী কলম্বাসের নেতৃত্বে ভেনিজুয়েলায় প্রবেশ করলো, তখন কলম্বাস ভেবেছিলেন তিনি এক এলডোরাডোয় পৌঁছেছেন। এখানে অঢেল সোনা পাওয়া যাবে এই ছিল অভিযাত্রীদের বিশ্বাস। কিন্তু সোনা তাঁরা বেশি পাননি। নিকটবর্তী অগভীর উপসাগরে স্থানীয় ইন্ডিয়ান্‌স্‌রা জীবন বিপন্ন করে মুক্তার সন্ধানে ডুব দিতো। কিন্তু সেই মুক্তা এখন প্রায় বিরল। কিন্তু বিগত চারশো বছরে ভেনিজুয়েলায় আবিষ্কৃত হয়েছে বিপুল পরিমাণে পেট্রোলিয়াম ক্রুডের সন্ধান। ম্যরাকাইবা হ্রদে অসংখ্য পাইপলাইনের সাহায্যে এই পেট্রোক্রুড উত্তোলিত হয়। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পর তেল উৎপাদনে ভেনিজুয়েলা তৃতীয় স্থান দখল করে। প্রতিদিন এইসব তৈলকূপ থেকে কয়েক লক্ষ ব্যারেল পেট্রোল উৎপন্ন হয়। আর ইলানোস অঞ্চলে পাওয়া গেছে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের লৌহ আকরিক। ইউরোপের ভেনিস অঞ্চলের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় এই দেশটির নাম রাখা হয়েছে ভেনিজুয়েলা। ইলানোস অঞ্চলে বয়ে গেছে অনোয়িকো নদী, যা ল্যাটিন আমেরিকায় আমাজনের পরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী। এই নদী দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৭০০ মাইল এবং এর শাখানদী ও উপনদীগুলি ভেনিজুয়েলার প্রায় চার-পঞ্চমাংশের জল নিকাশ করে। মোহনার কাছে অনোয়িকো নদী প্রায় সাড়ে তের মাইল চওড়া। কলম্বাস অনোয়িকো নদীকে এক বিরাট স্বাদুজলের সমুদ্র রূপে বর্ণনা করেছিলেন। এখন নদীতে বাঁধ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে জলবিদ্যুৎ ভেনিজুয়েলায় উৎপন্ন হয়। ভেনিজুয়েলায় প্রচুর পরিমাণে ভুট্টা, কলা, কোকো, কফি, ধান উৎপন্ন হয়। আর অরণ্যাঞ্চলে নানারকম অর্কিড আছে। এইসব অর্কিড দেশবিদেশে রপ্তানি হয়। ভেনিজুয়েলার লক্ষ লক্ষ অধিবাসীরা উপকূল অঞ্চলে মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করে। ফ্যাট নামে একরকম মাছ আছে, যে মাছগুলি অনেক সময় পাঁচফুট দীর্ঘ হয়, যার ওজন কয়েকশো পাউন্ড।

মনরো ডকট্রিনের সুবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় প্রায় দুশো বছর ধরে প্রভুত্ব করে। এইসব রাষ্ট্রে কিছু সেনানায়ক ক্ষমতা দখল করে, ক্যাথলিক চার্চের মদতে জনগণের ওপর নিজেদের শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়। ইন্ডিয়ান্‌স্‌দের কোনো অধিকার ছিল না, শ্রমজীবীরা দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করতো। শ্বেতাঙ্গ ক্রিয়লরা অভিজাত হিসেবে গণ্য হলেও, তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছিল না। মেস্তিহোরাই বেশিরভাগ রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। আর মূলেটোরা ছিল নিগ্রো ক্রীতদাসদের বংশধর। মধ্য আমেরিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশেরই কোনো স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি ছিল না। মার্কিন তাঁবেদার হিসেবেই তারা পরিচিত ছিল। মার্কিন বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি তাদের কাঁচামাল, খনিজসম্পদগুলি নামমাত্র মূল্যে কিনে নিয়ে চতুর্গুণ মূল্যে বিদেশে বিক্রি করতো। ওয়াশিংটনের নির্দেশ এদের কাছে অমোঘ ছিল। ও.এ.এস.-এর নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এদের ওপর সর্বময় কর্তৃত্ব করতো।

কারাকাস শহরের একাংশ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সর্বগ্রাসী কর্তৃত্বে প্রথমে ভাঙন ধরায় কিউবা। কিউবার দ্বীপপুঞ্জ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা উপকূল থেকে মাত্র ৯০ মাইল দূরে অবস্থিত। কিউবার চারদিকে অবরোধ আরোপ করে, কাস্ত্রোর অসংখ্যবার প্রাণনাশের চেষ্টা করে, কিউবার তথাকথিত স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ঢক্কানিনাদ করে, প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান সংগঠিত করে কিউবাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এই উন্মত্ত হিংসা সফল হয়নি।

সোভিয়েত রাশিয়া কিউবার এই বিপদের দিনে পাশে এসে দাঁড়ায়। কিউবার উদ্বৃত্ত চিনি সোভিয়েত রাশিয়া কিনতে শুরু করে। কিউবাকে পেট্রোলিয়াম ক্রুড দিয়ে সাহায্য করে। এই পেট্রোলিয়াম ক্রুড কিউবা নিজস্ব শোধনাগারে শোধন করে অন্য দেশগুলিতে সর্বোচ্চ মূল্যে সরবরাহ করতে পারে। সংসদ সদস্য হিসেবে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে আমি কিউবায় যাই। দেখলাম কিউবায় কোনো বর্ণবিদ্বেষ নেই। কৃষ্ণাঙ্গ বা মূলেটোরা শ্বেতাঙ্গ বা ক্রিয়লদের মতো জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান সুবিধা ও মর্যাদা ভোগ করে। নিরক্ষরতার সমস্যা সম্পূর্ণভাবে দূর করা হয়েছে। প্রতিটি মানুষ কাজের অধিকার ভোগ করে। চিকিৎসাব্যবস্থার বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে। আমি এর আগে বলশয়ের ব্যালে দেখেছি। কিন্তু কিউবার ব্যালে নাচ অনেক বেশি প্রাণোচ্ছল মনে হল। মানুষের গড় আয়ু ছিল ৭৮ বছর। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন। খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করছেন। কাস্ত্রোর মতে সমাজের সবাই যেন বৃদ্ধদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন।

কিউবার পর হুগো স্যাভেজ ফ্রায়াসের নেতৃত্বে ভেনিজুয়েলা মার্কিন কর্তৃত্বে এক বড়সড় ফাটল ধরায়। হুগো সাভেজ দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তাদের পারিবারিক বাসগৃহের চারদিকে মাটির দেওয়াল ছিল। তাঁর বড়ভাই ও তিনি ঠাকুরমার কাছে মানুষ হয়েছিলেন। অসাধারণ মেধাবী ছাত্র সাভেজ অল্প বয়সেই ভেনিজুয়েলার সামরিক বাহিনীতে প্রবেশ করেন। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে সরকারের বিরুদ্ধে এক অভ্যুত্থান ঘটে এবং এই অভ্যুত্থানে প্রায় তিন হাজার মানুষ মারা যায়। অনেকদিন কারাবাসের পর তিনি প্রকাশ্যে নিজের মতবাদ প্রচার শুরু করেন। তিনি বলেন যে ক্যুদেতা করে বা পুশ করে তিনি ক্ষমতা দখল করতে চান না। তিনি গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখলের কথা বলতেন। ইতিমধ্যেই তিনি লেনিন, ট্রটস্কি, রোজা লুক্সেমবুর্গ, গ্রামশি, মাও জে দং ইত্যাদি ভালো করে পড়েছেন। তিনি গভীর

রাত পর্যন্ত পড়াশুনো করতেন। ধূমপান বা মদ্যপান করতেন না। কেবলমাত্র বারবার কফি খেতেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হন, তারপর আর তাঁকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ২০১২ সালে তিনি চতুর্থবারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু ২০১৩ সালে তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তিনি কিউবায় গিয়ে কেমোথেরাপি নেন এবং দু-বছর ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কথিত আছে কারাকাসে হাসপাতালের ছাদ থেকেই তিনি টিভি সম্প্রচারের মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে কথা বলতেন, তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। একদিন রাত তিনটেয় ফিদেল কাস্ত্রো ওই হাসপাতালের অধ্যক্ষকে বরখাস্ত করার হুমকি দেন, কেন তিনি একজন ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীকে এইভাবে কষ্ট দিচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে ফিদেল কাস্ত্রো সাভেজকে পুত্রের মতো স্নেহ করতেন। দু-জনেই অত্যন্ত বই-এর অনুরাগী ছিলেন। অনেক সময় গভীর রাতে একই সময়ে তাঁরা দুজনে একটা বই শেষ করে অভিমত বিনিময় করতেন। তিনি ডন কুইক্সোটের কয়েক মিলিয়ন কপি ছাপিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। সাভেজ প্রথম নির্বাচনের পর গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা করেছিলেন। যদি ভোটারদের এক-দশমাংশ সংবিধান সংশোধন দাবি করে তাহলেই গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করা যাবে। ভূতপূর্ব মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের মতে, ভেনিজুয়েলায় এই সব নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং ভয়মুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত।

সাভেজ ক্ষমতায় আসীন হয়েই সারা দেশ জুড়ে কমিউনিটি কাউন্সিল তৈরি করেছিলেন। এই সব কমিউনিটি কাউন্সিল কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্যে জনগণের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতো। সাভেজ ক্ষমতায় এসেই ভূমি সংস্কারে মন দেন যাতে সাধারণ মানুষ জমির পাট্টা পান। ত্রিশ লক্ষ হেক্টর জমি এইভাবে ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টিত হয়। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন কমিশন সারা দেশ জুড়ে কাজ শুরু করে—যেমন, রবিনসন মিশন, সুক্রে মিশন ইত্যাদি। বলিভিয়ায়িন রিপাবলিক অব ভেনিজুয়েলা দরিদ্রদের সংখ্যা অর্ধেক কমিয়ে ফেলেছিল। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ভেনিজুয়েলার দারিদ্র্যরেখার নিচে বাস করতো শতকরা ৪২.৮ জন। কিন্তু ২০১১ সালে দারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ২৬.৫ জন। অসহায় দরিদ্রদের সংখ্যা শতকরা ১৬.৫ থেকে শতকরা ৭-এ এসে দাঁড়ায় এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই। নিরক্ষরতা সম্পূর্ণ দূর হয়। আর শিক্ষকের সংখ্যা ৬৫,০০০ থেকে ৩,৫০,০০০-এ দাঁড়ায়।

কারাকাসের চারপাশে যে বস্তিগুলি গড়ে উঠেছিল সেই বস্তিগুলিতেও সাভেজের স্বপ্ন ও প্রভাব পরিবর্তন দ্রুততর করে। এই বস্তিগুলিতে ছিল গুণ্ডামি, চোরাকারবার, পতিতাদের রমরমা। কিন্তু সাভেজ এদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ করে তাদের এক সুস্থতর পরিবেশে থাকতে সাহায্য করেন। কিউবায় নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসকগণ ভেনিজুয়েলায় চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। দেশের সর্বত্রই অসংখ্য প্রাইমারি হেল্‌থ সেন্টার গড়ে তোলা হয়। এমন এক খাদ্যকর্মসূচি গৃহীত হয় যে খাদ্য কর্মসূচি শিশু, অন্তঃসত্ত্বা নারী, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা, অসহায় মানুষদের সপ্তাহে ছ-

দিন করে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করতো।

সাভেজ ক্ষমতায় আসীন হয়েই দেশের পেট্রোলিয়াম সম্পদ জাতীয়করণ করেন। পেট্রোল কোম্পানিগুলির ওপর অত্যন্ত উচ্চহারে কর ধার্য করেন। ফলে বেশিরভাগ মার্কিন কোম্পানি ঝাঁপ বন্ধ করে চলে যায়। আর সাভেজ স্থির করেন যে এই অর্থ তিনি শিক্ষায়, স্বাস্থ্য ও জনগণের জন্য খাদ্য সরবরাহে ব্যয় করবেন। সাভেজের আদর্শ ছিলেন বলিভিয়ায় যিনি স্পেনের কবল থেকে ভেনিজুয়েলায় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে মার্কিন আধিপত্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সংগঠিত করা। কারাকাসের মার্কিন দূতাবাসে এক প্রাইভেট টিভির আসরে সাভেজকে চিত্রিত করা হয় একজন নিগ্রো ও ক্রিয়লের বংশধর হিসেবে। কলিন পাওয়েল প্রকাশ্যে এর নিন্দা করেছিলেন। সাভেজের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদ হয়, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। সন্তান কিংবা পৌত্রদের তিনি কখনো অবহেলা করেননি। তাঁর দলের সদস্য সংখ্যা এখন ৭০ লক্ষ, যে-দলে প্রাক্তন কমিউনিস্টরা, বুদ্ধিজীবী এবং সমাজতন্ত্রের অনুরাগীরা আছেন। সৈন্যদলেও আছেন অনেক দেশপ্রেমিক যারা দরিদ্রের সন্তান।

সাভেজ মাত্র ৫৮ বছর বয়সে মারা যান। তাঁর অন্ত্যেষ্টিকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ সমবেত হয়েছিলেন। স্পেনের যুবরাজ ফিলিপ বুঁর্বো, ইরানের রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আহমেদেহিনাদ, কিউবার প্রেসিডেন্ট রাউল কাস্ত্রো, ইকোয়েডরের প্রেসিডেন্ট র‍্যাফেল ডোরিয়া, চিলির প্রেসিডেন্ট সেবাস্টিয়ান পিনেরো, কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট জুয়ান ম্যানুয়েল স্যান্টোস তাঁর শেষযাত্রায় সামিল হয়েছিলেন। ২০ লক্ষ শোকার্ত নাগরিক তাঁর শবযাত্রায় অনুগামী হয়েছিলেন। আবার এদের মধ্যে নারীর সংখ্যা ছিল তুলনায় বেশি। সাভেজ নিজেকে অনেক সময় নারীদের সমাজতান্ত্রিক পথপ্রদর্শক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বস্তুতপক্ষে ইন্ডিয়ান্‌স্‌দের অধিকার, নারীদের অধিকার, শ্রমিকদের অধিকার, আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন তিনি সর্বদাই তৎপর। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি লিবিয়া, ইরাক ও ইরানে মার্কিন ভূমিকার কঠোর নিন্দা করেন। O.A.S-এর পরিবর্তে তিনি সেলাক (C.E.L.A.C.) তৈরি করেন। এই C.E.L.A.C.-এ মার্কিন আধিপত্য-বিরোধী দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি একযোগে কাজ শুরু করে।

সাভেজ চার্চের বিরোধী ছিলেন না। তিনি সত্যিই বিশ্বাস করতেন ''Blessed are the poor, Blessed are the weak.''

২০০৪ সালে তিনি কোলকাতায় এসেছিলেন। বিমানবন্দর থেকে এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা তাঁকে দক্ষিণ কোলকাতার রবীন্দ্রসদনে নিয়ে গিয়েছিল। বস্তিতে তিনি ছেলেমেয়েদের স্বহস্তে খাদ্য পরিবেশন করেছিলেন। তাঁর কেরালায় যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ভারত সরকারের অনিচ্ছার দরুন তা সম্ভবপর হয়নি। সাভেজের সাফল্যের পর একে একে ব্রাজিল, বলিভিয়া, ইকুয়েডর, উরুগুয়ে এল সালভাদোর, নিকারাগুয়া, হন্ডুরাসে বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রাজিলে লুলা ডি সিলভা বস্তি থেকে উঠে এসেছিলেন এবং দেশের সামরিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় বিরাট পরিবর্তন আনেন। ডেনিয়েল ওর্তেগা নিকারাগুয়ায় কলেজ ও স্কুল ছাত্রদের সাহায্যে ব্যাপকভাবে নিরক্ষরতা দূর করেন। ভেনিজুয়েলার পেট্রোল সাভেজ অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে দিয়েছিলেন। জনগণের প্রতি ভালোবাসা, সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সর্বাত্মক চেষ্টা তাঁকে নাগরিকদের চোখে চে গুয়েভারা, ফিদেল কাস্ত্রো বা সাইমন বলিভারের মতো নেতাদের সমপর্যায়ভুক্ত করেছিল। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি ছিলেন যিশুখ্রিস্টের ন্যায় সহজ, সরল ও মানবতাবাদী।

এখন নিকোলাস মাদুরো সাভেজের পর প্রেসিডেন্টের পদে আসীন হয়েছেন। নিকোলাস মাদুরো বাস শ্রমিকদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি ভেনিজুয়েলার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১২ সালে তিনি ভেনিজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট হন। তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেস, সাভেজ যখন রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত, তখন আইনজীবী হিসেবে তাঁর পক্ষে লড়েছিলেন। তিনি এক সময় ভেনিজুয়েলার অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবেও কাজ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাভেজের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা প্রচারে খরচ করেছে। তাঁকে একজন স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে চিত্রিত করেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বারবার ভেনিজুয়েলার দুর্বার গতি অবরুদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

কিউবা, ভেনিজুয়েলা এবং বলিভিয়াকে নিয়ে সাভেজ প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে A.L.B.A. গঠন করেন। পরে U.N.A.S.U.R. গঠিত হয়। ২০১১ সালে ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে C.E.L.A.C. (সেলাক) গঠিত হয়। এইসব সংগঠনগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডার কোনো স্থান হয়নি। Bank of the South টেলিভিশন স্টেশন TELASUR, কার্যকরী মুদ্রা SUCRC এই ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিকে সংহত করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে।

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

বুদবুদ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

আমাদের সমিতি ১৯৩৩ সাল থেকে কৃষিঋণ আদানপ্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সমিতির কর্মসূচি

K.C.C. লোন, S.H.G. লোন, M.T. লোন এবং সমিতি জমা আমানতের উপর ৭৫%, KVP এবং NSC & Pleadge Loan দেওয়া হয়।

আশিস মুখার্জি
সভাপতি

সুনীলকুমার ঘোষ
সম্পাদক

Sl. No. 17

With best compliments of

DURGAPUR CONSTRUCTION

MECHANICAL, STRUCTURAL & PIPELINE CONTRACTOR

J.P. Avenue, Durgapur-713211, Burdwan

Sl. No. 116

শতবর্ষের আলোকে

ঢাকা যাদুঘর, ১৯১৩

ঢাকা জাদুঘর থেকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

রঙ্গনকান্তি জানা

সংগ্রহশালা বা জাদুঘর হলো ইতিহাসের আয়না বিশেষ। এই আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয় অতীত মানুষ, সমাজ, জাতিসত্তা, জনজীবন ও ঐতিহ্য। কোনো একটি জাতির সভ্যতা ও প্রগতির স্মারক তার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। International Council for Museum (ICoM) সংগ্রহশালার সংজ্ঞায় বলেছে—"A non-profitmaking permanent institution, in the service of the society and its development and open to the public which acquires, conserves, communicates and exhibits researches for the purpose of study, education and enjoyment, material evidence of man and his environment." অর্থাৎ সংগ্রহশালা ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। মিউজিয়ম শব্দটির উৎপত্তিগত অর্থকে এইভাবে বোধহয় প্রকাশ করা যায়—১. অনুপ্রেরণা, ২. দৈনন্দিন জীবন, জীবন থেকে লুপ্তপ্রায় উপাদানগুলিকে একটি নির্দিষ্ট স্থান বা জায়গায় সুরক্ষিত করা, যা সাধারণ মানুষকে সর্বদা আকৃষ্ট করে।

পলাশীর যুদ্ধের পর, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের পূর্বখণ্ডে তাদের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করতে বেশ কিছু পরিকল্পনার রূপায়ণে বদ্ধপরিকর হয়। ঔপনিবেশিক শক্তির এই অজানা দেশটির সমাজ-সংস্কৃতিকে আরো ভালোভাবে জানার জন্য প্রয়োজন ছিল এই দেশের জনজীবন ও সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে নিবিড় জ্ঞান যা তাদের এই দেশ শাসনে সর্বদা সাহায্য করবে। এই দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারেরও প্রয়োজন ছিল। কারণ এই দেশ শাসনে দরকার ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত দেশীয় মানুষজন, যারা ঔপনিবেশিক শক্তির তৃণমূল স্তরে কর্মী হিসাবে কাজ করবে। এই সূত্রে কলকাতায় স্থাপিত হল হিন্দু কলেজ, এশিয়াটিক সোসাইটি, পরে ভারতীয় জাদুঘর ইত্যাদি। ঊনবিংশ শতক থেকে ভারতীয়দের মধ্যে স্বাজাত্যবোধের জাগরণ ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে। সিপাহি বিদ্রোহের পর ঔপনিবেশিক ভারতের শাসনভার কোম্পানির হাত থেকে সিংহাসনের প্রত্যক্ষ দায়িত্বে চলে গেলে, জাতীয়তাবাদের ধীর প্রবাহ ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের লুপ্ত ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়। সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচরণে তার প্রকাশ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর কলকাতায় সাহিত্য পরিষৎ-এর প্রতিষ্ঠা বাঙালির লুপ্ত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে এক বিশেষ পদক্ষেপ। বিংশ শতকের প্রথম দশকে অবিভক্ত বাংলাদেশে (বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত) রাজশাহীস্থিত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের তৎপরতায় বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি ও মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা হয়।

আবার ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের অব্যবহিত পরে পূর্ব বাংলা ও অসম প্রদেশের গভর্নর স্যার ল্যান্সলট্ হেয়ার-এর কাছে ঢাকায় জাদুঘর প্রতিষ্ঠার জন্য বিশিষ্ট মুদ্রাতত্ত্ববিদ এইচ.ই. স্টেপলটন সাহেবের প্রস্তাব (১৯০৯ সাল) অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে যায়। তবে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে ১৯১২ সালের ২৫ জুলাই ঢাকায় নর্থব্রুক হলে স্থানীয় গণ্যমান্যদের এক সভায় ঢাকায় জাদুঘর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন বাংলার তৎকালীন গভর্নর লর্ড কারমাইকেল। ১৯১৩ সালের ৫ মার্চ কলকাতা গেজেটে প্রকাশের মাধ্যমে ঢাকা জাদুঘর প্রতিষ্ঠার ঘোষণা (রেজ্যুলেশন নং ১৫৭৯, কলকাতা ৩ মার্চ, ১৯১৩) করা হয়। ৩০ সদস্য বিশিষ্ট প্রভিশনাল জেনারেল কমিটি গঠন করে। এই কমিটিকে একটি স্থায়ী সাধারণ কমিটি ও একটি নির্বাহী কমিটি গঠন সহ ঢাকা জাদুঘর পরিচালনার জন্য বিধিমালা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১৯১৩ সালের ৭ অগস্ট প্রাদেশিক গভর্নর লর্ড কারমাইকেল তৎকালীন সচিবালয় (বর্তমান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ)-এর একটি কক্ষে

ঢাকা জাদুঘরের উদ্বোধন করেন। ১৯১৪ সালের ১ জুলাই ড. নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত জাদুঘরের প্রাকৃতিক ইতিহাস শাখায় সুপারিনটেনডেন্ট হিসাবে যোগদান করেন। ১৯১৬ সালের জুন মাসে কামিনীকুমার চক্রবর্তী ওই পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৪ সালের ৬ জুলাই ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী (২৪.০১.১৮৮৮—৬.২.১৯৪৭) কিউরেটর হিসাবে যোগদান করেন এবং আমৃত্যু ওই পদে আসীন ছিলেন।

ভারত উপমহাদেশ ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন মুক্ত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান। ঢাকা জাদুঘর পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমানার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালে নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মৃত্যুর পর থেকে বহু প্রাজ্ঞ মানুষের অধীনে সংগ্রহশালাটির বিকাশ হতে থাকে, যাঁদের মধ্যে ছিলেন সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এফ.এ. চৌধুরী, আহমদ হাসান দানী, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, সিরাজুল হক, মফিজুল্লাহ কবীর, এনামুল হক প্রমুখ। ১৯৬৯ সালের ৯ অগস্ট কিউরেটর পদটি পরিচালক পদে নামান্তরিত হয়। এনামুল হক ঢাকা জাদুঘরের প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি ঢাকা জাদুঘর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান দ্বারা জাতীয় যাদুঘর হিসাবে অভিহিত হয়। এইভাবে ঢাকা জাদুঘর ১৯১৩ সাল থেকে ১৯৭২ সালে এসে একটি রাষ্ট্রের জাতীয় সংগ্রহশালার শিরোপা ধারণ করে।

এই সূত্র ধরে ২০১৩ সালটি ঢাকা জাদুঘর তথা বাংলাদেশ জাতীয় সংগ্রহশালার শতবর্ষে পদার্পণ। ১৯৭৫ সালের ১৮ জুন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান জাতীয় জাদুঘর কমিশনের সর্বসম্মত সুপারিশ অনুযায়ী ঢাকা জাদুঘরকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর হিসাবে অনুমোদন দান করেন। ১৯৮৩ সালের ১৭ নভেম্বর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচ.এম. এরশাদ কর্তৃক শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের নতুন ভবন উদ্বোধন হয়। বর্তমানে জাতীয় জাদুঘর বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সমৃদ্ধ ধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছে তার চুয়াল্লিশটি গ্যালারির মাধ্যমে। চারটি কিউরেটরিয়াল বিভাগের অধীনে এই গ্যালারিগুলি রয়েছে—প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগ; জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগ; ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগ; সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভাগ।

প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগের অধীনে রয়েছে দশটি গ্যালারি—মানচিত্রে বাংলাদেশ,

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ১৯৮৩

শিল্প ও খনিজ, বাংলাদেশের গাছপালা, ফুল-ফল-লতাপাতা, জীবজন্তু, পাখি, স্তন্যপায়ী প্রাণী, হাতি ইত্যাদি।

জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্প কলা বিভাগের অধীনে রয়েছে পনেরোটি গ্যালারি—বাংলাদেশের জনজীবন, নৌকা, বাংলাদেশের জনজাতি ১ এবং ২, বাংলাদেশের মাটির পাত্র, হাতির দাঁতের শিল্পকর্ম, অস্ত্র-শস্ত্র, ধাতব শিল্পকর্ম, চীনামাটি ও কাচের শিল্পকর্ম, পুতুল, বাদ্যযন্ত্র, বস্ত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ, নকশি কাঁথা, কাঠের শিল্পকর্ম ১ এবং ২।

ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগের অধীন এগারোটি গ্যালারি হলো—পোড়ামাটির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ভাস্কর্য ১ এবং ২, স্থাপত্য শিল্প লেখমালা, মুদ্রা-পদক-অলংকার, প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও মিনিয়েচার পেইন্টিং, ১৭৫৭-১৯৪৭ সাল, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বাঙালি, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রাম সংক্রান্ত দুটি গ্যালারি।

সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভাগের অধীনে সাতটি গ্যালারি—সমকালীন শিল্পকলা ১ এবং ২, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, বিশ্বসভ্যতা পাশ্চাত্য শিল্পকলা, বিশ্বমনীষী, বিদেশি—কোরিয়ান, ইরান, সুইজারল্যান্ড ও চায়নিজ কর্নার।

এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯১৪-১৫ সালে এই সংগ্রহশালায় দর্শক সংখ্যা ছিল ৪,৪৫৩ আর বিগত ২০১২-১৩ সালে ৫,২৮,০১০ জন।

ঢাকা জাদুঘর যা বর্তমান কালের বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, তার ভাবনা আরো আগে শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন নথিসূত্রে তা জানতে পারা যায়। ১৮৫৬ সালের ১ নভেম্বর প্রকাশিত 'দি ঢাকা নিউজ' পত্রিকায় ঢাকায় একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা সহ প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। এরও প্রায় পঞ্চাশ বছরের অধিককাল পরে ১৯০৯ সালে শিলার মুদ্রা দেরাজ তৎকালীন পূর্ববাংলা ও আসামের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর প্রসঙ্গে ঢাকায় একটি জাদুঘর স্থাপনের বিষয় নিয়ে প্রথম আলোচনার সূত্রপাত হয়। ১৯১০ সালের ১ মার্চ জনশিক্ষা পরিচালকের কাছে এইচ.ই.স্টেপলটন-এর লেখা একটি চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববাংলা ও আসামের লেফটেন্যান্ট গর্ভনর স্যার ল্যান্সলট্ হেয়ার ঢাকায় একটি জাদুঘর স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচনের নির্দেশ প্রদান করেন। ১৯১৩ সালে যাত্রা শুরু করে দীর্ঘ একশত বছর অতিক্রম করে আজ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বাঙালি জাতিসত্তার এক অনন্য স্মারক হিসেবে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

পরিশেষে, শতবর্ষ উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে এই সংগ্রহশালা গত ৮-৯ জুলাই ২০১৩ এক আন্তর্জাতিক আলোচনাসভার আয়োজন করে। আলোচনাসভার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। এই আলোচনাসভায় প্রায় পনেরোটি দেশের ঐতিহাসিক-গবেষকরা উপস্থিত হয়েছিলেন। বর্তমান নিবন্ধের লেখকও উক্ত আলোচনাসভায় আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাসভার বিষয়বস্তু ছিল—অবিভক্ত বাংলার ইতিহাস।

তথ্যসূত্র

১. The First Annual Report of the Dacca Museum for the year ending, March 31, 1915

২. Dani, A.H., *Report on the Working of Dacca Museum (1947-1952)*, Peshawar, 1952

৩. Proceedings of the Dacca Museum Committee 1914 to 1947, 1951-1965

৪. Mahmud, Firoz and Rahaman Habibur, *The Museums in Bangladesh*, Dhaka, 1987

৫. ইসলাম সৈয়দ আমীরুল, *বাংলাদেশ মিউজিয়াম*, ঢাকা, ২০০৬

৬. দাস, প্রকাশচন্দ্র, স্মরণিকা—জাতীয় জাদুঘরের শততম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ১৯১৩-২০১৩, ঢাকা, ২০১৩

বর্ধমানে ঈশ্বর গুপ্ত ও 'সংবাদ প্রভাকর'-এ সেকালের বর্ধমান

আবদুস সামাদ

মধ্য-উনিশ শতকের বাংলা ভাষার ব্যঙ্গরসের কবি ও সাময়িক পত্রের স্বনামধন্য সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-৫৯) লেখাপড়া শেখার তেমন সুযোগ না পেলেও সেকালের কলকাতার শিক্ষিত বাঙালি জনমানসে তাঁর প্রভাব ছিল ব্যাপক ও গভীর। মফস্‌সল বাংলাতেও কবিওয়ালদের কিঞ্চিৎ পরিশীলিত সর্বশেষ প্রতিভূ ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪), মনমোহন ঘোষ (১৮৪৪-৯৬) প্রমুখের সাহিত্যসাধনার কৈশোরের কিসলয়গুলি কবির 'সংবাদ প্রভাকর'-এ স্নেহাসিক্ত পরিচর্যাতেই পর্ণে পরিণত হওয়ার অভিমুখে অগ্রসর হয়। মূলত প্রাচীন পন্থার প্রোডাক্ট হলেও নতুন যুগের আলোর ঝল্‌কানিও তাঁর কবিতায় খালি চোখেই দেখা যায়। এহেন একজন অক্লান্ত লেখনীচালক ও ব্যাপক প্রভাববলয় স্রষ্টা যশ-খ্যাতির যে-ইমারতখানি গড়ে তোলেন, তাঁর মৃত্যুর কিঞ্চিদধিক এক দশকের মধ্যেই তা ভেঙে পড়ে। তাঁর কবিতারসোপভোগী ও সংবাদপত্রসেবিত আলোকপ্রাপ্ত বাঙালি-সমাজ তাঁর সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। কবির মৃত্যুর মাত্র বারো বছর পরে তাঁর বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'Calcutta Review'-এ প্রকাশিত (১৮৭২) তাঁর বিখ্যাত ইংরেজি প্রবন্ধে এই বলে পরিতাপ প্রকাশ করেন : ''A dozen years have not elapsed since Iswar Gupta lived, yet we speak of him as belonging to a past era.'' অর্থাৎ ঈশ্বর গুপ্তের পর এখনো বারো বছর পেরোয়নি, অথচ এর মধ্যেই তিনি আমাদের কাছে বিগতযুগের মানুষে পরিণত হয়েছেন।

যে-ঈশ্বর গুপ্ত অমানুষিক পরিশ্রমে কবিওয়ালাদের বিলুপ্ত জীবনী সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্যেতিহাসের অশেষ উপকার এবং আমাদের সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের বিপুল শ্রম লাঘব করে গেছেন, তাঁর প্রতি আত্মবিস্মৃত বাঙালির উপযুক্ত প্রতিদান বটে!

বিস্মরণপ্রিয় বাঙালির সেই ঋণ পরিশোধে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর এক কৃতজ্ঞ শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর খেদোক্তি থেকে বোঝা যায় গুপ্তকবির জীবনী রচনার বহুতর উপাদান তখনই বিলুপ্তপ্রায়।

বঙ্কিম পর্যন্ত ঈশ্বর গুপ্তের জীবনবৃত্ত রচনার ক্ষেত্রটি যে সম্পূর্ণ ভার্জিন ছিল সেকথা অবশ্য বলা চলে না। বঙ্কিমের উদ্যোগের বছর তিনেক আগে সেই পতিত ডাঙায় প্রথম মৃদু হলকর্ষণের চেষ্টা করেন হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। ইনি 'কবিচরিত' (১৮৬৯) নামে বিভিন্ন কবির একটি জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। মোট আটটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থে ঈশ্বর গুপ্তের উপরে ১০ পৃষ্ঠার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ঈশ্বর গুপ্ত

জায়গা পেয়েছে। (এঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কাদম্বিনী নাটক', 'মণিমালিনী' নাটক, 'জয়াবতীর উপাখ্যান' ইত্যাদি।)

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া তথ্যের উপরে নির্ভর করে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে গুপ্তকবির বিস্তৃততর একটি জীবনকাহিনি লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র। গোপালবাবু ছিলেন গুপ্তকবির অত্যন্ত কাছের মানুষ। সুতরাং তাঁর সংগৃহীত তথ্যনিচয়ের মধ্যে কোনো ফাঁক ফোকর থাকবে না, এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা থেকে গেছে। দীনেশচন্দ্র সেনের 'শ্রীবাস ঈশ্বরগুপ্ত' শিরোনামের আলোচনাটিও[১] (১৯২৩) স্মর্তব্য।

আমাদের কালে গুপ্তকবির উপরে অত্যন্ত মূল্যবান কাজ করে গেছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. ভবতোষ দত্ত[২]। কিন্তু তাঁরও সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে এমন একটি ঘটনার উপরে আমরা আলোকপাত করার চেষ্টা করছি। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর আদ্যন্ত সমস্ত ফাইল ঘাঁটলে হয়ত কবি সম্পর্কে আরও কিছু নতুন তথ্য পাওয়া সম্ভব বলে মনে হয়।

।। দুই ।।

সংস্কৃত একটি শ্লোকের কথা মনে পড়ছে—'নিরাশ্রয়া ন তিষ্ঠন্তি কবিতা বনিতা লতা' অর্থাৎ পণ্ডিত, স্ত্রী ও লতা কারও আশ্রয় ছাড়া থাকতে পারে না। 'পণ্ডিত' বলতে এখানে কবিকেও বুঝতে হবে। তাছাড়া সেকালের অধিকাংশ সাময়িকপত্র সম্পর্কেও এই শ্লোক-রচনাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। 'সংবাদ প্রভাকর' তার আত্মপ্রকাশ ও সমুন্নতির জন্য যেসব ব্যক্তির কাছে ঋণী, ১২৫৪ সনের ২রা বৈশাখ সংখ্যা প্রভাকরে ঈশ্বর গুপ্ত কৃতজ্ঞতা-বিনীত চিত্তে তাঁদের নাম স্মরণ করেন। তারও বছর সাতেক পরে প্রাত্যহিক হিসাবে পত্রিকাটি যখন সুপ্রতিষ্ঠিত এবং খ্যাতির মধ্যগগনে, সেই সময় আর একজন মহাধনী ব্যক্তির কাছে গুপ্তকবি পোষকতা লাভ করেন। তিনি অবিভক্ত বঙ্গের ধনীশ্রেষ্ঠ জমিদার বর্ধমানাধীশ মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ্ বাহাদুর (১৮২০-৭৯)। কিন্তু অদ্যাবধি কোনো গ্রন্থেই এই তথ্যটির কোনো উল্লেখ দেখা যাচ্ছে না।

মহতাবচন্দ্ বাহাদুর

মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে মহতাবচন্দ্ বাহাদুর সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নেওয়া দরকার।

গত শতকের রত্নপ্রসবিনী বঙ্গভূমির একটি মূল্যবান রত্ন ছিলেন মহতাবচন্দ্। ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেষির জন্য তাঁর কিছু বিরূপ সমালোচনা[৩] থাকলেও পাঞ্জাবী ক্ষেত্রিবংশজাত এই ভদ্রলোক বঙ্গদেশ ও বাঙালি সমাজকে আপন করে নিয়েছিলেন এবং বঙ্গভাষা, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি-সমাজসংস্কার ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে ইনি ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। মনে রাখতে হবে, যিনি কারও তোষামোদ করার পাত্র ছিলেন না, সেই পুরুষসিংহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁকে 'first man of Bengal' বলে স্বীকার করে গেছেন।[৪] F.B. Bradely Birt লিখে গেছেন, মহতাবচন্দ্ ছিলেন 'one of the great men of the nineteenth century.'[৫] প্রথম রামায়ণ ও মহাভারতের বাংলা অনুবাদে হাত দিয়ে এবং বিনামূল্যে তা বিতরণ করে ইনি স্মরণীয় কীর্তির অধিকারী হয়েছেন।[৬] বাংলা ভাষা-সাহিত্যে তাঁর দান সম্পর্কে বিস্তারিত ও বিবিধ সংবাদের জন্য আমার 'বর্ধমান রাজ-সভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য' (১ম খণ্ড) বইটি দ্রষ্টব্য।

মহতাবচন্দ্ বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গুপ্তকবি বর্ধমান রাজসভায় আসেন ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে। সঙ্গে নিয়ে আসেন স্নেহধন্য সহযোগী রাধামাধব মিত্রকে। মহারাজ সমীপে কবির এই আগমনের পিছনে রাজাবাহাদুরের আমন্ত্রণ ছিল, নাকি কবিবর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রাজ-সন্দর্শনে এসেছিলেন তা নিশ্চিতভাবে বলার উপায় নেই। প্রচার-মাধ্যমকে হাতে রাখার জন্য মহতাবচন্দ্ যদি সেকালের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকের যশস্বী সম্পাদক ও জনপ্রিয় কবিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সত্যিই এই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিকে উপেক্ষা করা চলে না। মনে রাখতে হবে, মহতাবচন্দের পৃষ্ঠপোষিত[৭] গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য) বর্ধমান রাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন তাঁর 'সম্বাদ ভাস্কর' কাগজে লাগাতার রাজপ্রশস্তিমূলক সংবাদ প্রকাশ করে। ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী তর্কবাগীশ মহাশয়ের কাগজের সঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর এমনিতেই সুসম্পর্ক ছিল না। পারস্পরিক আকছাআকছি ও ঈর্ষা-শত্রুতার সম্পর্ক মাঝে মাঝে প্রকাশ্যেও চলে আসছিল। রাজপরিবারে তর্কবাগীশ মহাশয়ের একাধিকপত্য খর্ব করা এবং সেখানে এন্ট্রি নেওয়ার চেষ্টা গুপ্তকবির থাকতেই পারে।

সে যাই হোক্, প্রথম সাক্ষাতেই গুণগ্রাহী মহারাজ কবি-সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তকে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। রাজার সঙ্গে কবির সেই প্রথম সাক্ষাৎকারটি ঘটেছিল গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে এবং বিপুল রাজসম্মান লাভ করে কবি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অনুরোধে গুপ্তকবি রাজ-অতিথি হিসাবে সেবারে বর্ধমান শহরে প্রায় মাসাধিক কাল অবস্থান করেন। বর্ধমানরাজের সম্মানিত অতিথিদের জন্য শহরে তখন দুটি ভবন নির্দিষ্ট ছিল—একটি 'উইলবাড়ি', অপরটি গোলাপবাগের মনোরম নিসর্গ পরিবেশে 'দারুল বাহার'। গুপ্তকবিকে রাখা হয়েছিল রাজবাড়ির কাছাকাছি কৃষ্ণসায়রের উত্তর দিকের চাঁদনিতে।

প্রথিতযশা কবি ও 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক কলকাতা থেকে বর্ধমান শহরে এসেছেন। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে, শহর বর্ধমান থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রে তাঁর আগমন-সংবাদ বেশ ফলাও করে ছাপা হবে। বাস্তবিক হয়েছিলও তাই। মহতাবচন্দের প্রত্যক্ষ প্রবর্তনায় বর্ধমান শহর থেকে তখন প্রকাশিত হতো 'সংবাদ বর্দ্ধমান' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। মহারাজের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত এই সাপ্তাহিকীটির সম্পাদক ছিলেন কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

'সংবাদ বর্দ্ধমান' যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ঈশ্বর গুপ্তের বর্ধমান আগমনের সংবাদ প্রকাশ করে।[৮] সংবাদটুকু তুলে দিচ্ছি :

> প্রভাকর প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। উক্ত সম্পাদক বাবু বর্দ্ধমান বর্দ্ধমানাধীশ্বর মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সহিৎ সাক্ষাৎ করণ কারণ কয়েক দিবসাবধি বর্দ্ধমান রাজধানীতে আগমন করিয়াছেন, আমরা উক্ত সম্পাদকসহ সাক্ষাৎকারে আমোদিত ও অতিশয় সন্তোষিত হইয়াছি। (সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে এব রসবৎ ফলে। কাব্যমৃত রসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ।।)

'সংবাদ বর্দ্ধমান'-এ প্রকাশিত উদ্ধৃত সংবাদটুকু 'সংবাদ প্রভাকর'-এ পুনর্মুদ্রিত হয়।[৯] বলা হয়, ''গত ১৪ই পৌষ শনিবাসরীয় 'সংবাদ বর্দ্ধমান' পত্র হইতে নিম্নস্থ বিষয়টি আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করিলাম।''

গুপ্তকবির বর্ধমানাগমনের সুনির্দিষ্ট তারিখটি এখানে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু না পাওয়া গেলেও ক্ষতি নেই। 'সংবাদ বর্দ্ধমান' পত্রে প্রকাশিত সংবাদটির তারিখ ১৪ই পৌষ, ১২৬০। এর 'কয়েক দিবসাবধি' আগে অর্থাৎ সন ১২৬০ সালের পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহে কবি বর্ধমানে উপনীত হয়েছিলেন।

রাজদরবারে কবি-সম্পাদক কিরকম সমাদর লাভ করেছিলেন সে সম্পর্কে কৌতূহল জাগা খুবই স্বাভাবিক। সেই কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য উক্ত সাক্ষাৎকারের আনুপূর্বিক বিবরণ 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার করছি[১০] :

> আমারদিগের প্রভাকর পত্রের সম্পাদক মহাশয় বর্দ্ধমান রাজধানীতে গমনপূর্ব্বক তথায় মাসাবধি অবস্থান করিয়া অতি অল্প দিবস হইল এতন্নগরে প্রত্যাগত হইয়াছেন, তিনি বর্দ্ধমানাধিপতি মহামতি বর্দ্ধমান কীর্তিকুশল শ্রীল মহারাজাধিরাজের সহিত আলাপ করিয়া যে পর্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায়

না, মহারাজ অতি মর্য্যাদক গুণগ্রাহক, সরলচিত্ত, প্রিয়ভাষী, অহঙ্কারশূন্য ও পরম দয়ালু, উক্ত বদান্যবর নৃপতি সর্ব্ববিষয়ে নৈপুণ্য, বৈচক্ষণ্য, কারুণ্য ও সৌজন্য জন্য অগণ্য ধন্যবাদের যথার্থ যোগ্যপাত্র তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। জগদীশ্বর তাঁহাকে যেরূপ ধনাংশে সর্বশ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, সেইজন্য সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার প্রতি সর্ব্বতোভাবে সমান করুণা প্রকাশ করিয়াছেন। এই বঙ্গদেশে তাঁহার তুল্য উচ্চ ব্যক্তি কেহই নাই, তিনি কুবেরতুল্য ভাগ্যধর হইয়া অহঙ্কার ও অভিমানকে একেবারেই বিসর্জ্জন করিয়াছেন ইহার অপেক্ষা অধিক মহত্ত্বগুণের বিষয় আর কি হইতে পারে? মহারাজ স্বয়ং যেমন মহৎ, তাঁহার মন সেইরূপ অতি মহৎ, কেবল সারল্য ও কৃপাভূষায় ভূষিত, ভূপতি আমারদিগের সম্পাদককে অতি সমাদরপূর্ব্বক আহ্বান করত তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিয়াছিলেন, তিনি মহারাজের কৃপাঋণ কখনই পরিশোধ করিতে পারিবেন না, সেই ঋণজালে যাবজ্জীবনের জন্য বদ্ধ থাকিবেন, যেহেতু তিনি আশার অতীত সম্মান ও স্নেহপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

—উদ্ধৃতাংশে বিশেষণের চটক ('অতি মর্য্যাদক, গুণগ্রাহক, সরলচিত্ত, প্রিয়ভাষী, অহংকারশূন্য ও পরম দায়ালু) ও অনুপ্রাসের ঘটা (নৈপুণ্য, বৈচক্ষণ্য, কারুণ্য ও সৌজন্য জন্য অগণ্য') দেখে সহজেই সনাক্ত করা চলে এটি স্বয়ং গুপ্তকবির লেখা। বর্ধমানরাজের উষ্ণ আতিথ্যে মাসখানেক যাপন করে ১২৬০ সনের মাঘের গোড়ার দিকে কলকাতায় ফিরে তিনি এই প্রতিবেদনটি লেখেন। এই গদ্যরীতি গুপ্তকবির গদ্যের টিপিক্যাল স্টাইল। আমাদের সিদ্ধান্তের পিছনে অন্যতর কারণ বর্ধমানরাজের প্রতি বুকভরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দায়িত্ব তিনি কোনো শিষ্য-সহকারীর উপরে ছেড়ে দেবেন, এটা ভাবা যায় না।

প্রতিবেদনটির অপরাংশে মহতাবচন্দের বদান্যতা ও দীনদুঃখী প্রতিপালন বিষয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে। এই জাতীয় রাজপ্রশস্তি ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ ব্যবসায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজঘনিষ্ঠ গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের 'সংবাদ ভাস্কর'-এ আক্ছার দেখা যায়। লক্ষণীয় গৌরীশঙ্কর 'প্রভাকর' পত্রিকা নামের প্রতিশব্দ 'ভাস্কর' শব্দটিও নিজের পত্রিকা-নামে ব্যবহার করেন। রাজস্তুতিতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে টেক্কা দিয়ে রাজপরিবারে তাঁর একাধিপত্য খর্ব করা ও নিজের প্রবেশপথ সন্ধান করার কৌশলও এখানে স্পষ্ট।

নিম্নোদ্ধৃত অংশে তৎকালীন বর্ধমান রাজসভার একটা ছবিও পাওয়া যাচ্ছে। এদিক থেকেও অংশটুকু মূল্যবান। প্রতিবেদক-সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত লিখছেন :

কি হিন্দু কি মুসলমান কি ইংরাজ কি অন্য কোন জাতি, যে আসিয়া রাজসমীপে আপনার দুঃখ জানাইতেছে সেই ব্যক্তিই মর্য্যাদার সহিত প্রতিপালিত হইতেছে, কত কত রাজবংশ্য ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের দুর্ভাগ্য-জনেরা এই ক্ষণে বর্দ্ধমানে আসিয়া সুখে কালযাপন করিতেছেন, রাজা তাঁহারদিগের বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা দৈনিক বিত্ত পাইয়া সুখে সপরিবারে আহার করিতেছেন, তদ্ভিন্ন বাস বাস পাইয়াছেন ও বাস পাইতেছেন ইহাতে আশ্রিত জনেরা দুঃখের লেশমাত্রও জানিতেও পারেন না।

মহারাজের নিকট ধনী ও দুঃখী সকলেই তুল্য, তিনি সকলেরি প্রতি সমনেত্রে দৃষ্টি করেন, ব্যবহার বা কার্য্য বা বাক্যালাপ দ্বারা যাহাকে সরল ও নিরহঙ্কৃত জানিতে পারেন তাহাকেই আন্তরিক যত্ন ও দয়া করিয়া থাকেন, ফলে ক্রূরান্তঃকরণ অভিমানী দাম্ভিক জনেরা কোন কালে কোথায় কোন মনুষ্যের প্রিয় হইয়া থাকে, তাহারা ইন্দ্রত্ব পাইলেও আপনার স্ত্রীপুত্রের প্রিয় হইতে পারে না 'অন্যে পরে কা কথা'।

আমরা স্থান ও সময়াভাববশতঃ অদ্য এ বিষয় সংক্ষেপে শেষ করিলাম, অবিলম্বেই মহারাজের পুরাতন ও বর্ত্তমান কীর্ত্তি, কার্য্য এবং আর আর বিষয় প্রকাশ করিব। (ফটো কপি দ্রষ্টব্য)

প্রতিবেদনটির শেষে ''অবিলম্বেই মহারাজার পুরাতন ও বর্ত্তমান কীর্ত্তি ও কার্য্য'' ইত্যাদি 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠায় প্রকাশ করার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, রাজ-আতিথ্যে আপ্লুত ও কৃতজ্ঞ ঈশ্বর গুপ্ত তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। কলকাতায় ফেরার মাত্র মাস চারেক পরেই অর্থাৎ 'অবিলম্বেই' 'সংবাদ প্রভাকর'-এ ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘ ১৮ কিস্তিতে প্রকাশিত হয় বর্ধমানরাজের কীর্তিকাহিনি। রচনাটির শিরোনাম দেওয়া হয়েছিল 'বর্দ্ধমান বর্ণন'। প্রথম কিস্তি বেরোয় ১৬ মে ১৮৫৪। শেষ কিস্তি ৫ জুন, ১৮৫৪। প্রতি কিস্তির শীর্ষে লেখা থাকতো 'ছাত্র হইতে প্রাপ্ত'। শেষ কিস্তির নীচে লেখক হিসাবে জেজুরনিবাসী রাধামাধব মিত্রের (১৮২৫-১৯২১) নাম বিজ্ঞাপিত হয়।

১৮৫৪ সালে রাধামাধবের বয়স ছিল ২৯ বছর। সেকালে এই বয়সের যুবকেরা সাত ছেলেমেয়ের বাপ। এমন ধেড়ে ছাত্র কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকতে পারে না। তাহলে রচনাটি 'ছাত্র হইতে প্রাপ্ত' বলার কারণ কী? আমাদের ধারণা রচনাটির দোষত্রুটি পাঠক যাতে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখেন, সেইজন্যই এই বিনয়।

রাধামাধব ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের অন্যতম প্রিয় শিষ্য ও সহযোগী। ছাত্র হিসাবে তিনি মেধাবী ছিলেন। ১৮৩২ সালে অর্থাৎ বছর সাতেক বয়সে তিনি 'ইউনিয়ন' স্কুলে প্রাথমিক স্তরের ছাত্র ছিলেন।[১১] ১৮৩২ সালের ৭ মার্চ সংখ্যা 'সমাচার দর্পণ' থেকে জানা যায়, ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে কলকাতার টাউন হলে ঐ স্কুলের ছাত্রদের একটি পরীক্ষা নেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন এডওয়ার্ড রায়ান, ডেভিড হেয়ার, ডাক্তার উলিসন, কর্ণেল ক্রেগি প্রমুখ বাঘা বাঘা শিক্ষাবিদ। পরীক্ষায় কৃতী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রদের রুপোর মেডেল দেন এডওয়ার্ড রায়ান। রৌপ্যপদক প্রাপ্ত তিনজন ছাত্রের অন্যতম ছিলেন রাধামাধব মিত্র (অপর দুজন মহেশচন্দ্র হালদার ও উমাচরণ মুখোপাধ্যায়)।

পরবর্তীকালে রাধামাধব মতিলাল শীলের কলেজে ('শীল্স ফ্রি কলেজ'-এ) বেশ কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদনার দায়িত্বও সামলেছিলেন কিছুদিন। গদ্যে-পদ্যে-নাটকে এঁর কলম ছিল স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। পূজনীয় ড. সুকুমার সেন মহাশয় সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, ইনি অন্যূন পাঁচখানি গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থগুলি হলো (১) 'বিধবা মনোরঞ্জন নাটক' (২) 'স্ত্রীলোকের দর্পচূর্ণ' (১৮৬৩) নামে একটি আদিরস প্রধান আখ্যায়িকা (৩) 'বোধেন্দুদয়' (১৮৬৩, পাঠ্যপুস্তক), (৪) 'কবিতাবলী' (১৮৬৮-৭৩, পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ কবিতাসংকলন) (৫) আলোকনাথ বিদ্যাভূষণের সহযোগিতায় আরব্য উপন্যাসের গদ্যানুবাদ (১৮৭৬)।[১২]

'বর্দ্ধমান বর্ণন' গদ্যে-পদ্যে লেখা। পদ্যাংশই বেশি—প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। দ্বিপদী ও ত্রিপদী পয়ারগুলির অধিকাংশ গদ্যাংশেরই ছন্দোবদ্ধ রূপ এবং তথ্যের দিক থেকে পদ্যগুলিতে নতুনত্ব তেমন কিছু নেই। পদ্যগুলিকে ইলাস্টিকের মতো টেনে বাড়ানো হয়েছে বলে মনে হয়। এ কারণেও পদ্যগুলি কখনো কখনো ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে। রাধামাধব গুরুস্থানীয় গুপ্তকবির সঙ্গে এলেও মাত্র ১০ দিন পরে ফিরে যান। নিজের কাজ এবং প্রভাকরের কাজ দুই-ই তাঁকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য করে। কাব্যগুরুর সঙ্গে মাসাধিক কাল থাকলে 'বর্দ্ধমান বর্ণন' আরও ১৮ কিস্তি চলত বলে মনে হয়। শেষ কিস্তিতে তাঁর বর্ধমান-বিরহের তীব্রতা থেকে সেটা অনুমান করা চলে। বর্ধমান যে রাধামাধবকে কতো গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল শেষ কিস্তিটুকু তারও নিঃসংশয় প্রমাণ।

কাব্যমূল্য যাই হোক্, রচনাটির মূল্য অন্যখানে। এখন থেকে ১৫৯ বছর আগেকার শহর বর্ধমানের ইতিহাসের এ এক মূল্যবান ডকুমেন্ট। বর্ধমান-সন্ধিৎসু ও অনুরাগী পাঠকপাঠিকাদের উদ্দেশে রচনাটি আনুপূর্বিক নিবেদিত হলো। বানান ও ছেদচিহ্ন সম্পূর্ণ

অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার ১২৫৭ সালে (১৮৫০ খ্রি.) গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় এই জাতীয় একটি বর্ধমান রাজপ্রসঙ্গ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সেটিও গদ্য-পদ্য মিশ্র ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক রচনা। রচনাটির শিরোনাম ছিল 'বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের বিষয়'।

এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে, 'সম্বাদ ভাস্কর' থেকে নিয়ে রচনাটি 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। কাজেই রচনা-পরিকল্পনার জন্য রাধামাধব বিশেষ মৌলিকতা দাবি করতে পারেন কি না সন্দেহ।

বর্তমান আলোচকের সম্পাদনায় রচনা দুটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতে চলেছে।

আর একটি কথা। প্রথম, চতুর্দশ ও ষোড়শ কিস্তির একটি করে শব্দ এবং শেষ কিস্তির পদ্যাংশে একটি ছত্রের প্রথম শব্দ এবং শেষ শব্দদুটি খণ্ডিত থাকায় ফাঁকা (...চিহ্ন যোগে) রাখা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. বঙ্গবাণী : বৈশাখ, ১৩২৯
২. বঙ্কিমচন্দ্র—ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত কবিত্ব (প্রথম সং ১৩৭৫)
৩. W.W. Hunter : *Bengal Under the Lieutenant Governors (Vol.II),* Second edition, 1902 (Calcutta) p.1031
৪. J.P. Grant -কে লেখা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিঠি : Subal Ch. Mitra : *Iswar Chandra Vidyasagar (1902),* p.372
৫. F.B. Bradely Birt : *Twelve Men of Bengal* (4th edition) p. 108
৬. আবদুস সামাদ : *বর্ধমান রাজসভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য* (১ম খণ্ড), পুস্তক বিপণি, (২য় মুদ্রণ, আগস্ট, ২০০০)
৭. ১২৫৬ সালের ৬ই বৈশাখ বর্ধমানরাজ মহতাবচন্দ্ বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে রাজ এস্টেটের পদস্থ এক কর্মচারী রামদাস মজুমদার 'সম্বাদ ভাস্কর' সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশকে কোনো একটি সংবাদ প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি লেখেন। চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ :
"...শ্রীল শ্রীযুক্ত (মহতাবচন্দ্) আপনকার প্রতি অন্য২ বিষয়ে যদ্রূপ সর্বদাই সন্তুষ্ট আছেন তদপেক্ষা অত্র বিষয়ে (কলকাতায় 'অভিনব ব্যাঙ্ক স্থাপন') বিশেষ তুষ্ট হইলেন। অতএব এই অনুগ্রহের স্মরণার্থ কিছু চিহ্ন সময়ানুসারে প্রেরণ হইবেক, ...।" দ্রষ্টব্য : সম্বাদ ভাস্কর, ১০ই বৈশাখ, ১২৫৬, পৃ. ১৯
৮. 'সংবাদ বর্দ্ধমান' বিষয়ে বিশদ আলোচনা দ্র: বর্ধমান রাজসভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য ১ম খণ্ড (প্রাগুক্ত) পৃ. ২৬১-৬৬
৯. *সংবাদ প্রভাকর* : ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৪
১০. ঐ/ ২৮ মাঘ, ১২৬০, ৪৮৪৯ সংখ্যা
১১. *সমাচার দর্পণ* : ৭ই মার্চ, ১৮৩২, পৃ. ১০৬
১২. সুকুমার সেন : *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড, ৭ম সং) পৃ. ১৬৬

সংবাদ প্রভাকর

বর্দ্ধমান বর্ণন (প্রথম কিস্তি)

(ছাত্র হইতে প্রাপ্ত)

(এক) বর্দ্ধমানে অবস্থান করিয়া মনোমধ্যে যেরূপ ভাবোদয় হইয়াছিল তদ্বিশেষ নিম্নভাগে ক্রমশঃ প্রকটিত করিতে বাধ্য হইলাম।

অদ্য শুভক্ষণে বিভাবরী প্রভাতা হইল। বহু দিবসাবধি আমি এই সুখপূর্ণ বর্দ্ধমান রাজধানীর সৌন্দর্য্যের বিবরণ লোকমুখে শ্রবণ করিয়া এ স্থলে আগমন করণের অভিলাষ করিয়াছিলাম, কিন্তু সুযোগাভাবে এত কাল আমার মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। এক্ষণে শুদ্ধ ঈশ্বরের করুণাবলম্বনে এই রমণীয় নগর অবলোকন করিয়া আমার লোচনদ্বয় সফল হইল এবং অবক্তব্য আনন্দ লাভ করিলাম। বর্দ্ধমানের শোভা সম্বন্ধীয় স্বরূপ বর্ণনা করা মাদৃশ সুকুমারমতি অকিঞ্চনের পক্ষে অত্যন্ত সুকঠিন, যেহেতু ইহার শোভার সীমা নাই। যে দিগে নেত্রপাত করি সেই দিগেই সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার দৃষ্ট হইতে থাকে। আমি নিজে কবি নহি কিন্তু কবিবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়ের সহবাসে কাল যাপন করাতে অত্যন্ত উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া রচনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি, তজ্জন্য এই বৃহদ্ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইলাম।

পদ্য

অদ্য নিশি সুপ্রভাত হোলো শুভক্ষণে।
হেরিলাম বর্দ্ধমান আনন্দিত মনে।।
লোকমুখে শুনি এই পুরীর বিবরণ।
এখানে আসার আশা হোত অনুক্ষণ।।
এ নগরী দেখিবার না পেয়ে সুযোগ।
মনে মনে করিয়াছি কত দুঃখভোগ।।
ঈশ্বরের করুণায় কামনা পূরিল।
এখন মনেতে আর খেদ না রহিল।।
ভ্রমণের কালে কাছে পেয়ে সরোবর।
যেমন সন্তোষ হয় তৃষাতুর নর।।
অন্ন পেলে ক্ষুধাতুর প্রফুল্ল যেমন।
যেমন ভ্রমর তুষ্ট হেরি পদ্মবন।।
মৌমাছি যেমন সুখি মধু আস্বাদনে।
যেমন গৃধিনী তুষ্ট শব দরশনে।।
তরুণ অরুণ হেরি নলিনী যেমন।
পুলকে প্রফুল্ল হোয়ে প্রকাশে বদন।।
বিষ্ণুপ্রিয়া কুমুদিনী বিধু বিলোকনে।
যেমন হরিষে হয় বিকশিত বনে।।
সুখময় বর্দ্ধমান করি দরশন।
তেমনি পুলকে পূর্ণ হোলো মম মন।।
আহা মরি এ নগরী শোভা ধরে কিবা।
অপরূপ কত রূপ হেরি নিশি দিবা।।
এমন সুন্দর স্থান আর নাহি হয়।
ভাবকের মনে মনে কত ভাবোদয়।।
একবার বর্দ্ধমান হেরেছে যে জন।
সফল জীবন তার সফল নয়ন।।
... ...
নিরুপম বর্দ্ধমান কিবা চারু শোভা।
মনোহর সুখকর সুধী মনোলোভা।।
স্বাভাবিক কাল্পনিক অভিনব যত।
একে একে বর্ণন করিব সাধ্য মত।।

[**দ্বিতীয় কিস্তি**]

বর্দ্ধমান পরিভ্রমণ করিতে করিতে কত স্থানে কত আনন্দ প্রদায়ক রম্য হর্ম্ম্য সন্দর্শন করিলাম। রাজনিকেতনের চতুর্দিগে ধীরে ধীরে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া আমার মনের যে কি পর্য্যন্ত প্রফুল্লতা হইল তাহা লিখনী দ্বারা ব্যক্ত করা সাধ্যাতীত। এরূপ প্রকার বৃহদ্বাটী আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই প্রাসাদোপরি স্থানে স্থানে অনির্ব্বচনীয় শোভাধারী ইষ্টক ও প্রস্তরনির্ম্মিত কত ব্যাপার মদীয় নয়নের তৃপ্তিকর হইতে লাগিল। কি অপরূপ বৃহদ্বৃহৎ স্তম্ভনিকর পান্থগণের সুখকর হইয়াছে। সিংহদ্বারে দ্বারপালমণ্ডলী ভীষণাকার ধারণ করত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রহরি সকল নিজ নিজ অস্ত্রের সহিত সাতিশয় সতর্ক হইয়া পাহারা দিতেছে। মহারাজাধিরাজ রাজকার্য্যসম্বন্ধীয় ভৃত্যসমূহ আপনাপন নিরূপিত কর্ম্ম সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়া প্রতিদিন সুখে হরণ করিতেছে। তুরঙ্গশালায় তুরঙ্গ রক্ষকেরা তুরঙ্গবৃন্দের সেবা করিতেছে। মাতঙ্গশালায় প্রকাণ্ডশরীর মাতঙ্গমণ্ডলী স্বীয় স্বীয় শুণ্ড কখন ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিতেছে কখন ধরাতলে নামাইতেছে তাহাতে বোধ হয় যেন তাহারা ভুজঙ্গ খেলাইতেছে। এক দুই এবং চারি অশ্বের নয়নরঞ্জন উত্তমোত্তম বিবিধ প্রকার কত গাড়ি নেত্রগোচর হইতে লাগিল। গোশালায় গোপালগণ অত্যন্ত সাবধান হইয়া বৃহদ্বৃহৎ গোপালকে পালিতেছে। কোন স্থানের উষ্ট্রসকল ঊর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পর লপনালপর্ণাপণ

উৎকট রোগ আরোগ্য করিতে পারেন। যাঁহার প্রয়োজন হয় লোক প্রেরণ করিলে অথবা পত্র লিখিলে চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইবেন। বিশেষতঃ ইঁহার নিকটে নানা প্রকার পক্ক তৈল ও ঔষধ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

সংবাদ প্রভাকর

২৮ মাঘ শকাব্দাঃ ১৭৭৫। হানিশাব্দাঃ ১০৩

বর্দ্ধমানেশ্বর।

আমারদিগের প্রভাকর পত্রের সম্পাদক মহাশয় বর্দ্ধমান রাজধানীতে গমন পূর্ব্বক তথায় প্রায় মাসাবধি অবস্থান করিয়া অতি অল্প দিবস হইল এস্থানে প্রত্যাগত হইয়াছেন, তিনি বর্দ্ধমানাধিপতি মহামতি বর্দ্ধমান কীর্ত্তিকুশল শ্রীলশ্রী মহারাজাধিরাজের সহিত আলাপ করিয়া যে পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। মহারাজ অতি মর্য্যাদক গুণ গ্রাহক, সরলচিত্ত, প্রিয়ভাষী, অহঙ্কার শূন্য ও পরম-দয়ালু, উক্ত বদান্যবর নৃপতি সর্ব্ব বিষয়ে নৈপুণ্য, বৈচক্ষণ্য, কারুণ্য ও সৌজন্য জন্য অগণ্য ধন্যবাদের যথার্থ যোগ্যপাত্র তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। জগদীশ্বর তাঁহাকে যেমন ধনাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, সেইরূপ সর্ব্ব বিনয়েই তাঁহার প্রতি সদ্ভাব স্বভাবে সমান করুণ। প্রকাশ করিয়াছেন। এই বঙ্গদেশে তাঁহার তুল্য উচ্চ ব্যক্তি কেহই নাই. তিনি কুবের তুল্য ভাগাধর হইয়া অহঙ্কার ও অভিমানকে একেবারেই বিসর্জ্জন করিয়াছেন, ইহার অপেক্ষা অধিক মহত্ব গুণের বিষয় কি হইতে পারে? মহারাজ স্বয়ং যেমন মহৎ, তাঁহার মন সেইরূপ অতি মহৎ, কেবল সারল্য ও কৃপাভূষায় ভূষিত, ভূপতি আমারদিগের সম্পাদককে অতি সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করত তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিয়াছিলেন, তিনি মহারাজের কৃপাঋণ কখনই পরিশোধ করিতে পারিবেন না, সেই ঋণজালে যাবজ্জীবনের জন্য বদ্ধ থাকিবেন, যেহেতু তিনি আশার অতীত সম্মান ও স্নেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কি হিন্দু, কি মুসলমান্, কি ইংরাজ, কি অন্য কোন জাতি, যে আসিয়া রাজ সমীপে আপনার দুঃখ জানাইতেছে, সেই ব্যক্তিই মর্য্যাদার সহিত প্রতিপালিত হইতেছে, কত কত রাজ বংশ্য ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের দুর্ভাগ্য জনেরা এইক্ষণে বর্দ্ধমানে আসিয়া সুখে কালযাপন করিতেছেন, রাজা তাঁহারদিগের বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা দৈনিক বিত্ত পাইয়া পরম সুখে সপরিবারে আহার করিতেছেন, তদ্ভিন্ন বাস বাস পাইয়াছেন ও বাস পাইতেছেন, ইহাতে আশ্রিত জনেরা দুঃখের লেশ মাত্রও জানিতে পারেন না।

মহারাজের নিকট ধনি ও দুঃখি সকলি তুল্য, তিনি সকলেরি প্রতি সমনেত্রে দৃষ্টি করেন, ব্যবহার বা কার্য্য দ্বারা বাক্যালাপ দ্বারা যাহাকে স্মরণ ও নিরুপদ্রুত জানিতে পারেন তাহাকেই আন্তরিক যত্ন ও দয়া করিয়া অশেষ প্রকারে সন্তুষ্ট ও বাধিত করিয়া থাকেন, ফলে ক্রুরান্তঃকরণ অভিমানি দাম্ভিক জনেরা কোন্ কালে কোথায় কোন্ মনুষ্যের প্রিয় হইয়া থাকে, তাহারা ইন্দ্রত্ব পাইলেও আপনার স্ত্রী পুত্রের প্রিয় হইতে পারে না, অন্যে পরে কা কথা॥

আমরা স্থান এবং সময়াভাব বশতঃ অদ্য এবিষয় সংক্ষেপে শেষ করিলাম, অবিলম্বেই মহারাজের পুরাতন ও বর্ত্তমান কীর্ত্তি, কার্য্য এবং আর আর বিষয় প্রকাশ করিব।

আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে জিলা রঙ্গপুরের অন্তঃপাতি মন্থনা নিবাসি গুণরাশি ধার্ম্মিকবর সুবিখ্যাত ভূম্যধিকারি শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি মহাশয় গত দিবস প্রাতে স্বীয় প্রিয় প্রাণাধিক পুত্র শ্রীমান্ বাবু জগদিন্দ্র নারায়ণ চৌধুরি মহাশয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া আমারদিগের যন্ত্রালয়ে শুভাগমন পূর্ব্বক মুদ্রাসম্বন্ধীয় সমুদয় ব্যাপার সন্দর্শন করত অত্যন্ত সুখী হইলেন। উক্ত শ্রীযুক্ত মহাশয়ের গুণের গুণে আমরা যাবজ্জীবনের জন্য বদ্ধ হইয়াছি, জগদীশ্বর তাঁহাকে এবং তাঁহার পুত্রকে সর্ব্বগুণে ভূষিত করিয়াছেন। এমত মহাপুরুষেরা প্রসন্নচিত্তে যন্ত্রালয়ে আসিয়া প্রকাশ্য পত্রের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করেন ইহাই আমারদিগের বিশেষ প্রার্থনীয়।

সংবাদ প্রভাকরের (২৮-মাঘ১২৬০) একটি পৃষ্ঠা

করিতেছে, তাহারদের এরূপ প্রকার ভাবদৃষ্টে অনুভব হইতে লাগিল যেন তাহারা ইঙ্গিত দ্বারা কোন পরামর্শে প্রবৃত্ত হইতেছে। তদনন্তর নৃপালয় সন্নিকটস্থ অতিথি আলয় আমার নেত্রপথের পথিক হইল। এখানে কত শত দীনহীন আবালবৃদ্ধবনিতা উপস্থিত হইয়া জঠরানল নির্ব্বাপণ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে কেহ কেহ মহারাজের নামোচ্চারণ করত তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছে। উত্তমোত্তম বাজার এবং বিবিধ দ্রব্য পূরিত চক দৃষ্ট হইল। স্থানান্তর হইতে অসংখ্য লোক আগমনপূর্ব্বক কলরব এবং রাজপথে পর্য্যটন করিতেছে। পল্লীগ্রামস্থ দেশবিদেশীয় মানুষেরা বাসা করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া এ স্থলে দিনাতিপাত করত পুলকিত হইতেছে। বিক্রেতাসকল রাজপথের ধারে ধারে বিপণি সংস্থাপনপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া ক্রেতাসমগ্রকে সুমধুরভাষে আহ্বান করিতেছে।

[তৃতীয় কিস্তি]

এমন কোন সামগ্রী নাই যে এ পুরীতে প্রাপ্ত হওয়া না যায়। কোন কোন দিগে নগরের প্রান্তভাগ বৃহদাকার ফাটকে সুশোভিত হইয়াছে, সমভিব্যাহারে অত্যুচ্চ নবপল্লবিত চারু দেবদারু তরু পবনহিল্লোলে দুলিতে দুলিতে কেলি করিতেছে, পান্থগণের চিত্ত হরিতেছে। প্রধান রাজবর্ত্মে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত গলিতে ভ্রমণ করত অন্তঃকরণে অপর্য্যাপ্ত আহ্লাদের সঞ্চার হইতে লাগিল। ভদ্রাভদ্র লোকেরা বসতি করিয়া মনের সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, কোন মতে দস্যুভয়ে ভীত হয় না। কোন কোন স্থানে কোন কোন দস্যু লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া কোদালী স্কন্ধে লইয়া ঝম্‌ঝম্‌ ধ্বনি করত নিজ নিজ কার্য্যস্থানে গমন করিতেছে। আমি বিদেশী, কোন স্থানে কি আছে এবং কাহার নাম কি তাহা কিছুই বিশেষরূপে অবগত নহি, লোকমুখে যাহা শ্রুত হইলাম, তাহাই বিশ্বাস করিতে হইল। নগর পর্য্যটন করিতে যেরূপ বিলোকন করিলাম সেইরূপ লিখিতে অত্যন্ত যত্ন করিলাম, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না কারণ এ স্থানের বিবরণ বিস্তার করিয়া লেখনী মুখে ব্যক্ত করিতে হইলে উত্তম একখানি পুস্তক হয় তাহার সন্দেহাভাব।

বাঁকা নাম্নী এক স্রোতস্বতী বর্দ্ধমানকে বেষ্টন করিতে করিতে কি এক অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রকটন করিয়াছেন, ইনি সর্পের গমনের ন্যায় গমন করিয়া নগরের সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করত সৌন্দর্য্যের উন্নতি করিতেছেন। ইঁহার উপরে দুটা দীর্ঘ মনোহর সেতু আছে, এইক্ষণে ইঁহার উদর বালুকাময়, কেবল মধ্য দিয়া একটী স্রোতঃ বহিতেছে। ইঁহার সলিলে তটবাসিরা অবগাহন করিয়া থাকে, এই জল যিনি একবার পান করেন তিনি যাবজ্জীবন আর বিস্মৃত হইতে পারেন না। এ জলে জঠরানল জ্বলিয়া উঠিতে থাকে এবং রোগির রোগ বিনষ্ট হয়। নগরের অভ্যন্তরের এবং অন্যান্য স্থানের রাজপথের সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে চিরদিনের জন্য মোহিত হইলাম। রাজধানীর চতুষ্পার্শ্বস্থ বর্ত্মের দুই পার্শ্বে দ্রুমাবলী শ্রেণিবদ্ধরূপে রোপিত হইয়া কি চমৎকার দ্যুতি প্রকাশ করিতেছে। কোন স্থানে ঝাউ, কোন স্থানে আম্র, কোন স্থানে পণস, কোন স্থানে জাম, কোন স্থানে অশোকবৃক্ষ পথিকসমূহকে বিভাকরের খরতর কর হইতে পরিত্রাণ করণার্থে ছায়া বিস্তার করিতেছে। ইহারা নব নব পল্লব পরিধানপূর্ব্বক সমীরণসহকারে সুশ্রাব্য বাদ্য করত দর্শকমণ্ডলীর শ্রবণবিবরে সুমধুর শব্দার্পণ করিতেছে। চারিদিগ হইতে বিবিধ জাতি বিহঙ্গমের বিবিধপ্রকার কর্ণসুখকর স্বরশ্রবণে শ্রবণে সুধা বর্ষণ হইতে লাগিল।

[চতুর্থ কিস্তি]

আহা মরি আহা মরি কি শোভা দর্শন করি
এসে শোভাকর বর্দ্ধমানে।
কিবা রাজনিকেতন অতিশয় সুশোভন
মোহিত করিল মন প্রাণে।।
কোন দিগে শারি শারি খাম আছে মনোহারি,
অপরূপ বাটীর গঠন,
সিফায়েরা সাজ পরি, বন্দুক সঙ্গেতে করি,
স্থানে স্থানে করিছে ভ্রমণ।।
করে লয়ে করবাল, দ্বারে কত দ্বারপাল,
ভীষণ আকারে দাঁড়ায়েছে।
মহীশের দাস যারা সাবধান হয়ে তারা
নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে।
এলে পরে বিভাবরী, যেন মৃদু হাস্য করি,
প্রাসাদে অসংখ্য আলো জ্বলে।
কত রূপ অপরূপ, যার নাই অনুরূপ
হেরিলাম স্থলে আর জলে।।
রমণীয় গাড়ি হয় প্রাসাদের কাছে রয়
অশ্বপাল থাকে সঙ্গে সঙ্গে।
... ...
নেত্রসুখ প্রদায়ক হেরিলাম চারু চক,
তাহাতে অমূল্য দ্রব্য কত।
এখানে প্রবিষ্ট হোয়ে, টাকা দাস সঙ্গে লোয়ে,
ভ্রমিতেছে ক্রেতা শত শত।।
সকল বর্ণের নরে আনন্দে বসতি করে,
নানা সুখ ভুঞ্জে অবিরত।
ধনী দীন একাকার, কারো প্রতি অত্যাচার
করিবারে কেহ নহে রত।।
যার যে ব্যবসা হয় সে কার্য্যে সে রত রয়
দরশনে কত সুখোদয়।
যথায় তথায় যাই কেবল দেখিতে পাই
নরেশের কীর্ত্তি শোভাময়।।
যত দীন হীন জন, করি সেথা আগমন
অতিথিশালায় সবে যায়।
প্রচুর ওদন পেয়ে মনের আনন্দে খেয়ে
উদরের আগুন নিবায়।।
রাজপথে পান্থগণ করিতেছে পর্য্যটন,
সর্ব্ব ঠাঁই কোলহল শুনি।
নিজ ধাম পরিহরি এখানে বসতি করি,
আছে কত বিচক্ষণ গুণি।।
বাঁকার বিমল জল, পানেতে জঠরানল,
ধিকি ধিকি হয় প্রজ্বলিত।
ভূ (ভু) জঙ্গের গতি ন্যায়, এ নদী খেলায়ে যায়,
বর্দ্ধমানে কোরে সুশোভিত।।
... ...
বাজারে বাজারে গিয়া, নানা দ্রব্য নিরখিয়া,
হইলাম প্রপুল্ল হৃদয়।
স্থানে স্থানে শত শত, দোকান রয়েছে কত
সামগ্রীর সংখ্যা নাহি হয়।।
পরিধেয় ভোজনীয়, সুখকর রমণীয়,
নানাবিধ দ্রব্য অগণন।
দোকানে বিরাজ করে, দর্শকর মনো হরে,
সকলের জুড়ায় নয়ন।।
... ...
স্থানে স্থানে সরোবর, হেরিলাম মনোহর,
চমৎকার ঘাটের গঠন।
অমল কমল তায়, কত শত জন নায়
স্নিগ্ধ করে তাপিত জীবন।।
... ...
এ পুরীর চারিধারে যত পথ আছে।
কেবল বেষ্টিত হয় মনোহর গাছে।।
তরুচয় গান করিতেছে বায়ুভরে।
দ্বিজকুল কেলি করে বসি তদুপরে।।

রাজভবনের এক পার্শ্বে কি চমৎকার নহবৎ বাজিয়া থাকে, তচ্ছ্রবণে শ্রবণরন্ধ্রে পীযূষ পতিত হয়।

সর্ব্বমঙ্গলাকারিণী সর্ব্বমঙ্গলা মহামায়া এতন্নগরে বিরাজমানা হইয়া চিরদিন মঙ্গল বিধান করিতেছেন, তাঁহার শ্রীমন্দিরের কিমাশ্চর্য্য গঠন তাহা ব্যক্ত হয় না। পূজারি ব্রাহ্মণেরা নিরন্তর উপস্থিত থাকিয়া নিজ নিজ দৈনিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া অতুল্য সুখ সম্ভোগ করিতেছে, তাহারদিগের কিছুই অভাব নাই। সন্ধ্যাকালে এ স্থলের সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে স্বাগারে প্রত্যাগমন করা কঠিন হইয়া উঠে। এখানে মানসকরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তির শোভা স্বরূপপাশে বদ্ধ হইতে ইচ্ছা করে।

[পঞ্চম কিস্তি]

পদ্য

সর্ব্বমঙ্গলার রূপ অপরূপ কিবা।
শ্রীমন্দিরে বিরাজ করেন নিশি দিবা।।

মনের আনন্দে অধিকারি, বিপ্র সব।
চারিদিগে বসি করিতেছে কলরব।।
প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে হোতেছে আরতি।
বাজনা বাজিছে কত সুমধুর অতি।।
স্থানে স্থানে হেরিলাম, কত দেবালয়।
বর্দ্ধমান সুরালয়, যেন সুরালয়।।

বর্দ্ধমানের প্রত্যেক স্থান, প্রত্যেক বাটী, প্রত্যেক বাজার, প্রত্যেক চক, প্রত্যেক সরোবর, প্রত্যেক উদ্যান, প্রত্যেক রাজপথ, প্রত্যেক তরু এবং প্রত্যেক দেবালয়ের শোভা স্থির নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া একে একে সবিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করণে সমর্থ হইতে পারিলে মনের আক্ষেপ মিটাইতে পারিতাম। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে এ স্থলে বহুদিন অবস্থান করিতে পারিলাম না, তজ্জন্য সুশৃঙ্খলপূর্ব্বক লিখিত হইল না।

লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দির এবং তাঁহার পূজারি দ্বিজগণকে দর্শন করিয়া জীবন সফল করিলাম। রাধাগঞ্জে রাধাবল্লভ এক অত্যুত্তম আলয়ে বিরাজ করিতেছেন, এই স্থলে করুণাময়ী অন্নপূর্ণাও একটী বিচিত্র মন্দিরে উপবেশন করিয়া বহু সংখ্যক লোককে অন্ন প্রদান করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার নামের মাহাত্ম্য উন্নত হইতেছে। ছোট দেউড়ীতে শ্যামসুন্দর নামক এক বিগ্রহ আছেন। মদনমোহনজী যে আলয়ে বিরাজিত আছেন সে আলয়ের অনির্ব্বচনীয় শোভা দৃষ্ট হইতে থাকে। তাঁহার ত্রিভঙ্গিম ঠাম বিলোকন করিলে কাহার অন্তঃকরণে আহ্লাদ না জন্মায়? অবগতি হইল যে এই স্থলে মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানেশ্বর শ্রীলশ্রী মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এ সকল দেবালয়ে মহারাজের যে কত ব্যয় হয় তাহা নিরূপণ করা যায় না। কত পূজারি ব্রাহ্মণ নিয়তই উপস্থিত রহিয়াছেন। অনাহূত কত লোকে আগমনপূর্ব্বক প্রসাদ পাইয়া থাকে। দুই বেলা উত্তমোত্তম ভোগ দেওয়া হইতেছে, সময়ানুসারে কত বাদ্য বাজিতেছে। অম্বিকাতে বর্দ্ধমানেশ্বরের যে কীর্ত্তি আছে তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন, বর্দ্ধমানের নবাবহাটে সেইরূপ ১০৮ শিবমন্দির অবলোকনে অসীম আনন্দের উদয় হইল।

যৎকালে আমি এই সকল শিবালয় দেখিতে দেখিতে ভ্রমণ করিতেছিলাম, তৎকালে কোন ব্যক্তির প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে চন্দ্রকোণায় মহারাজের এক মহাকীর্ত্তি আছে, সেখানেও ১০৮ শিবসাগর আছে এবং তথায় বিস্তর ব্যয় হয়। বর্দ্ধমানের দেবালয় সমস্তের কার্য্য এবং অন্যান্য মহাব্যাপার দেখিয়া সাধুবাদ প্রদান না করেন এমন কেহই নাই। এই রাজধানীতে যেখানে যেখানে রাজকীর্ত্তি ও রাজার বিষয় ক্রমশঃ দৃষ্ট হইতে লাগিল। যেখানে যে বৃহদট্টালিকা ও দীর্ঘ পুষ্করিণী ও অন্যান্য মহা মহা ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম সকলিই মহারাজের। এক মহারাজ হইতে বর্দ্ধমান নগর এরূপ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট, এখানে অন্য কাহারো কার্ত্তি নাই। অতএব এই মহানগরীশকে যে কি পর্য্যন্ত ধন্যবাদ অর্পণ করা কর্ত্তব্য তাহা কথনাতীত। আর আর কত শত অত্যপরূপ ব্যাপার এ পুরীতে একত্রীভূত হইয়াছে তাহার সীমা নাই।

[ষষ্ঠ কিস্তি]

বর্দ্ধমানে যত পুষ্করিণী আছে সকলেরি শানবাঁধা ঘাট দৃষ্ট হইল। কৃষ্ণসাগর, শ্যামসাগর, রাণী সাগর, কমল সাগর, মানস সরোবর, সত্য সরোবর, নির্ম্মল সরোবর প্রভৃতি সরোবর সকল দেখিলেই আশ্চর্য্য বোধ হইতে থাকে। ইহাদিগের শোভার বর্ণনা করা অত্যন্ত দুষ্কর। ইহারা কুসুম এবং অন্যান্য মহীরুহ দ্বারা সুশোভিত হইয়া দর্শকব্যূহের চিত্তরঞ্জন করিতেছে।

এক একটা পুষ্করিণী খননে, গজগিরি করণে, ঘাট বন্ধনে যে টাকা ব্যয় হইয়াছে সে টাকা অনেকানেক মনুষ্য চক্ষেও দেখেন নাই, কৃষ্ণসাগর সকল সরোবর অপেক্ষা অতি দীর্ঘ, মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণরাম বাহাদুর এই পুষ্করিণী খনন করাইয়া স্বীয় নামানুযায়ী কৃষ্ণসাগর নাম রাখিয়াছিলেন, ইহার চারিধারে একবার পরিভ্রমণ করিতে হইলে শরীরে শ্রমবারি নির্গত হইতে থাকে, এপার হইতে ওপারে লোককে দেখা যায় না, ইহার সলিল অত্যন্ত সুমিষ্ট এবং ক্ষুধাজনক, অনেকানেক লোক এই জলে অবগাহন করত তৃপ্ত হইতেছে, চতুর্দ্দিগস্থ পাড় অকথ্য সৌন্দর্য প্রকাশ করিতেছে। চারিধারে কামিনীকুসুম তরুগণ বিনোদ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তদুপরি শোণিত বর্ণের ফল পুঞ্জে পুঞ্জে ঝুলিতেছে। বর্দ্ধমানেশ্বর শ্রীল শ্রীযুত মহাতাবচন্দ্র বাহাদুর দক্ষিণধারে এক মহামূল্য অত্যাশ্চর্য বৈঠকখানা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে স্বো (সো) নায় সোহাগ হইয়াছে। এই সরোবরের উত্তরের চাঁদনীতে আমাদের বাসা হওয়াতে স্বর্গের ন্যায় সুখভোগ হইয়াছে।

[সপ্তম কিস্তি]

পদ্য

কৃষ্ণসাগরের কিবা শোভা মনোহর।
দরশনে একেবারে মুগ্ধ হয় নর।।
পাহাড় পর্ব্বতাকার আছে চারি ধারে।
তার দ্যুতি বর্ণন না হয় বর্ণহারে।।
কোন দিগে তদুপরি কামান রোয়েছে।
প্রতিদিন দুইবার তোপ হইতেছে।।
দক্ষিণে বৈঠকখানা অতি চমৎকার।
সতত আমার মনে করিছে বিহার।।
নেত্রসুখকর কত কায় আছে তায়।
নানা বর্ণ এক ঠাঁই কিবা শোভা পায়।।
শানে বাঁধা কত ঘাট অতি সুশোভন।
তাহাতে করিছে স্নান কত শত জন।।
সুন্দর বকুল তরু নব পল্লবিত।
কোন কোন ঘাটের দুপাশে সুশোভিত।।
কোন ধারে বটবৃক্ষ ছায়া করিতেছে।
ঝম্ ঝম্ শব্দে কিবা বাদ্য বাজিতেছে।
মন্দ মন্দ স্নিগ্ধ গন্ধবহ বহিতেছে।।
সলিলে উঠিছে ঢেউ নয়ন রঞ্জন।
মীনচয় পুলকে দিতেছে সন্তরণ।।
প্রাতঃকাল হোলে আসি ধীবর নিকর।
জাল ফেলে মাচ ধরে প্রফুল্ল অন্তর।।
বসন্ত পাইয়া যত বনপ্রিয়গণ।
শ্রবণবিবরে করে সুধা বরিষণ।।
... ...
কাঁকেতে কলসী করি কত রসবতী।
বারি অন্বেষণে এসে অতি হৃষ্টমতি।।
পবন অঞ্চল ধরে করে নানা রঙ্গ।
হেরিলে নরের মনে উদয় আনন্দ।।
মদনমোহন হয় এই সরোবর।
কিবা শোভা মনোলোভা দেখিতে সুন্দর।।
কুমুদিনী পতি শশী মনোহর বেশে।
যখন ভ্রমণ করে গগন প্রদেশে।।
তখন কি নিরুপমা শান্তি দেখা যায়।
বোধ হয় যেন সুধা ক্ষরিতেছে তায়।।
তারাবলী সনে ইন্দু প্রবেশিয়া জলে।
নানা রঙ্গে কত লীলা করে কুতূহলে।।
নীরে হাত দিলে পরে অপরূপ হেরি।
তারগণ নাচে প্রাণ প্রিয়তমে ঘেরি।।
... ...

দেলকোষা, আনন্দকানন, নন্দনকানন, গুপ্তবৃন্দাবন, শিকারগঙ্গা, লালবাগ, রমনা বাগান, খোষবাগ, মেওয়া বাগান ইত্যাদি কত রমণীয় উপবন দেখিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের যে সুখ তাহা বিধিমতে সম্ভোগ করিলাম। একে একে এই সকল উদ্যানের বর্ণনা করা কোন মতেই হইতে পারে না, কেননা সকলেই শোভাতে পরিপূরিত। নন্দনকাননে সাতটি উৎকৃষ্ট সরোবর থাকাতে তাহার চমৎকার শোভা বর্ণনাতীত। লালবাগে একটী সরোবর শতদলে পরিপূর্ণ। এই রাজীব পরিপূরিত পুষ্করিণীর কোন কোন স্থানে পদ্মের নব নব দল জন্মাইতেছে, কোন কোন স্থানে উত্তমোত্তম পত্র হইতেছে, কোন স্থানে কমলের কলির অঙ্কুর হইয়াছে এবং কোন কোন সুবাসিত বিকসিত পঙ্কজাবলী দৃষ্ট হইল। মধুকরনিকর দলে দলে শতদলের দলে বসিয়া মধুপান করত প্রিয়তমাকে দলিতেছে।

[সপ্তম কিস্তি]

পদ্য

ভানু করে সরোবরে পদ্ম বিকসিত।
গন্ধে করিয়াছে চারিদিক আমোদিত।।
আধ আধ ফুটিতেছে কত শত কলি।
দলে দলে শতদলে ছুটিতেছে অলি।।
নলিনীর মুখ মধু সুখে পান করে।
পুলকিত হোয়ে ভ্রমে গুণগুণ স্বরে।।
রসে তনু ঢল ঢল কত সরোজিনী।
দুলিছে পবন ভরে হোয়ে উলঙ্গিনী।।

নাগরে লইয়া কোলে দেয় আলিঙ্গন।
সারা দিন সুখে করে প্রেম আলাপন।।

[অষ্টম কিস্তি]

দেলকোষার তুল্য উপবন কোথাও নাই, ইহাকে ধরণীস্থিত নন্দনকানন বলিলেই হয়। এই রমণীয় সুররাজের কমনীয় উদ্যানের এবং আনন্দকাননের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব।

অসীম আনন্দজনক আনন্দকানন বিলোকনে মন আকাশে আনন্দ অরুণ উদিত হইল। এই মনোমুগ্ধকর উদ্যানের মধ্য দিয়া একটী সুরম্য ইষ্টকনির্মিত বর্ত্ম আছে, দূর হইতে দৃষ্টি করিলে বোধ হয় যেন গেরি মৃত্তিকা দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছে। এ স্থলে শারি শারি সুগন্ধি সুদৃশ্য নাগকেশর পুষ্পের তরুসকল রাসগাছের ন্যায় শোভা দর্শাইয়া দর্শকের নেত্র তৃপ্ত করিতেছে। মধূ (ধু) কর ও মধূ (ধু) মক্ষিকাগণ মধুপানে মত্ত হইয়াছে, সুশ্রাব্য ধ্বনি করিতেছে। নির্ম্মল সরোবর এবং সত্য সরোবর নামধারি দুইটী অদ্ভুত সরোবর নির্ম্মল সলিলে পরিপূর্ণ হইয়া শানবাঁধা ঘাটে গজগিরিতে এবং শিবের মন্দিরে শোভিত হইয়া চিত্ত হরিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বড় বড় মীনবৃন্দ ঝাঁকে ঝাঁকে লীলা করিতেছে।

পদ্য

নিরমল সরোবর, অতিশয় দুঃখহর,
চিত্র বরণের বারি তায়।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মীনগণ, সদা দেয় সন্তরণ,
হেরে পুলকিত হয় কায়।।
এ জলে করিলে স্নান, জুড়ায় তাপিত প্রাণ,
পানেই বা কত সুখোদয়।
মনের বিকার যত, অবিলম্বে হয় হত,
রোগ শোক কিছু নাহি রয়।।
নাগকেশরের শোভা, দেবরাজ মনোলোভা,
বিকসিত সুখদ শাখায়।
অপরূপ তার ভাতি, মকরন্দ পানে মাতি,
ভৃঙ্গকুল ভ্রমিয়া বেড়ায়।।
আম্রতরু মুকুলিত, অতিশয় সুশোভিত,
হোয়েছে কবির তুষ্টিকর।
মধু ফল কোন গাছে, ভারে ভারে ফলিয়াছে,
তাতে কর দেয় দিনকর।।
ফুটেছে অশোক ফুল, জুটেছে ভ্রমরকুল,
করিতেছে শোক নিবারণ।
মধুমক্ষিকারা আসি, সুমধুর মধু গ্রাসি,
মহনন্দে করিছে ভ্রমণ।।

[নবম কিস্তি]

দেলকোষা নামক অতি সুরম্য উদ্যান অবলোকন করিয়া আনন্দার্ণবে অবগাহন করিলাম, এই রমণীয় স্থান পূর্ব্বে গোলাপবাগ নামে বিখ্যাত ছিল, এক্ষণে বর্দ্ধমানাধিপতি মহামতি শ্রীল শ্রীযুত মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর ইহাকে অসাধারণ শোভায় সুশোভিত করত ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া দেলকোষা আখ্যা রাখিয়াছেন, এই উপবনের চতুঃদিগে একটী নেত্ররঞ্জন গড় বিরাজ করিতেছে, ইহার অভ্যন্তরে হর্ষজনক ইষ্টকনির্ম্মিত বর্ত্ম নয়নগোচর হওয়াতেই বা কি অবক্তব্য সুখোদয় হইতে লাগিল, সৌন্দর্য্যের সীমা নাই, নানা জাতি পশুপক্ষি নিজ নিজ আগারে কেলি করিতেছে, বিবিধ প্রকার কুসুম পাদপ কুসুমালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া মৃদু মৃদু মলয় সদাগতির হিল্লোলে নৃত্য করিতে করিতে দর্শকনিকরের তুষ্টি জন্মাইতেছে, মধ্যস্থলে অপরূপ মনোরম দ্যুতিবিশিষ্ট এক সরোবরলোকনে বিস্ময়াপন্ন হইলাম, এই পুষ্করিণীর নাম মানস সরোবর, চারি ধারে গজরিজি (গজগিরি) করা হইয়াছে, চতুঃদিগে সুন্দর সোপান রহিয়াছে, সোপানের উপর কোন কোন স্থানে টব সম্বলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পতরু দণ্ডায়মান থাকিয়া বিনোদ মূর্ত্তি ধারণ করত কৌতুক দেখাইতেছে।

পুষ্করিণীর পশ্চিমতটে একটী চিত্তপ্রফুল্লকারী উচ্চ অট্টালিকা আছে, তাহার বাহ্যিক মোহন গঠনে নেত্রপাত করিয়াই অপর্য্যাপ্ত আহ্লাদের রসে অন্তঃকরণ গলিতে লাগিল। সিফাহী মণ্ডলী অত্যন্ত সাবধানে পাহারা দিতেছে। পশুপক্ষি রক্ষকেরা পশুপক্ষিসমূহকে আহার যোগাইতেছে। মালী সমগ্র কুসুমদ্রুমাবলীর সেবা করিতেছে। পুষ্করিণী খননকারিরা পুষ্করিণী খনন করণার্থ মৃত্তিকা কাটিতেছে, এ উদ্যানের অনুরূপ আমি কুত্রাপি দর্শন করি নাই, ইহার শোভা সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হয় না, এ স্থলে আগমনমাত্রে পুত্রশোক নিবারণ হইবার সম্ভাবনা।

[দশম কিস্তি]

পদ্য

দেলকোষা উপবন, মোহিত করি মন,
হেরে জুড়াইল দ্বিনয়ন।
এমন উদ্যান আর, কোথায় বা আছে কার,
নাহি হয় স্বরূপ বর্ণন।।
হরিণ হরিণীগণ, করিতেছে বিচরণ,
কিবা চমৎকার শৃঙ্গ সব।
নবীন শাবক যত, কেলি করে অবিরত,
কখন প্রকাশে নিজ রব।।
ভল্লুক ভীষণাকারে, দাঁড়াইয়া স্বীয়াগারে,
করিতেছে আনন ব্যাদন।
হেরিলে মনুজ কাছে, দুভুজ তুলিয়া নাচে
কভু করে রাগেতে গর্জ্জন।।
কচ্ছপ বৃহৎ অতি, মন্দ মন্দ তার গতি,
কভু মুখ করিছে বাহির।
কভু স্থলে কভু জলে, পুলকিত হোয়ে চলে
কভু পান করিতেছে নীর।।
প্রকাণ্ড শরীরধর, পরে এক দ্বিজবর,
করিলাম সানন্দে দর্শন।
কিবা পাখা নিরুপম, শোভাধর মনোরম,
সুখে সেই করিছে ভোজন।।
মরাল মরালী মেলি, উদকে করিছে কেলি,
দেখিয়া সফল হোল আঁখি।
স্থানে স্থানে ঘরে ঘরে, হরিষে বিহার করে,
কত শত নানা জাতি পাখি।।
... ...
নিরখি এ সব পাখি, প্রফুল্ল হইয়া আঁখি,
বিচিত্র পালক শোভা পায়।
রবে জুড়াইল কাণ, ইহাদের অভিধান,
অনায়াসে জানা নাহি যায়।।
ছোট বড় যত হরি, বেড়াতেছে রঙ্গ করি,
কখন দশন দেখাতেছে।
কদলী হেরিলে পর, বাড়াইয়া দেয় কর,
দর্শকেরে তুষ্ট করিতেছে।।
আপন আপনালয়ে, ভীষণ শার্দ্দূলচয়ে
চলিতেছে হইয়া অস্থির।
নিকটে দেখিলে নরে, রাগেতে গুমরে মরে,
ইচ্ছা করে হইতে বাহির।।
আছে এক বিষধর, হেরে তার কলেবর
ভয়ে তনু কাঁপে থর থর।
বৃহৎ গাণ্ডারদ্বয়, ভয়ানক অতিশয়,
জলক্রীড়া করে নিরন্তর।।
সুচতুর বনে নর, পাতিয়া যুগল কর,
দর্শকের কাছে খাদ্য চায়।
নানা জাতি পশুগণ, সুখে করে বিচরণ,
দরশনে জীবন জুড়ায়।।
কুম্ভির বৃহদাকার, করাল বদন তার,
ভয়ানক তাহার গমন।
কভু ল্যাজ নাড়িতেছে, কভু নীরে পড়িতেছে
আমোদে রয়েছে অনুক্ষণ।।
মানসের সরোবরে, মীন কত কেলি করে,
ঝাঁকে ঝাঁকে দেয় সন্তরণ।
দিলে এক মুটা মুড়ী, মাচ এসে কত বুড়ী,
হেরে হয় সফল নয়ন।।
নানা জাতি চারু ফুল, যাহাদের নাহি তুল,

যথায় তথায় বিকসিত।
রমণীয় শোভা ধরে, নিজ নিজ গন্ধে করে
তারা চারি দিগ্ আমোদিত।।
মধুকর দলে দলে, ধায় অতি কুতূহলে,
মধু পান আশা করি মনে।
কেহ গিয়া ফুলে বসে, মত্ত হোয়ে কেলি রসে,
চুম্ব খায় কুসুম বদনে।।
... ...
কমল সাগর মাঝে, অপরূপ দ্বীপ সাজে,
মরি মরি কিবা শোভা পায়।
কখন তাহার জলে, সুচারু তরণী চলে,
কতই লহরী উঠে তায়।।

[একাদশ কিস্তি]

দেলকোষার সুরম্য অট্টালিকাতে অনেক নয়ন প্রফুল্লকর ঘর আছে। খোর্সেদমহল অত্যপরূপ এবং অত্যুৎকৃষ্ট।

বর্দ্ধমানেশ্বরী মহরাণী দেলকোষায় যখন আগমন করেন তৎকালীন তিনি এই মহলে অবস্থান করেন। বিলিয়ার্ডরুমে প্রবিষ্ট হইয়া চমৎকার বোধ হইল। মহারাজ এই ঘরে প্রতি দিবস বিলিয়ার্ড খেলিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে ২৮টা মহামূল্য ঝাড় শোভা করিতেছে। চারি দেওয়ালে বৃহদ্বৃহৎ মহিষের শৃঙ্গ-সমূহ এবং অন্যান্য কত দ্রব্য ঝুলিতেছে, তাহাতে এক অবক্তব্য কান্তি হইয়াছে। কতকগুলি উত্তম চেয়ার আছে। এই ঘরে প্রবেশ করণান্তর কোন ব্যক্তি আমাকে অবগত করিলেন যে ''বিলিয়ার্ড খেলায় মহারাজের তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি এদেশে কাহাকেই দৃষ্ট হয় না। বিলাতে কেহ আছেন কিনা তাহা বলিতে পারি না, যেহেতু প্রধান প্রধান যত সাহেব খেলিতে আইলেন তন্মধ্যে কেহই জয়ী হইতে পারেন না। আমার সম্মুখে শ্রীশ্রীযুত যত বার যাহার সঙ্গে খেলিয়াছেন ততবার জয়ী হইয়াছেন।'' এই বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইলাম, কেননা এ দেশীয় লোক হইয়া বিলিতি খেলায় বিলিতি লোককে জয় করা সামান্য ক্ষমতার কার্য্য নহে। চিঠি লিখিবার কয়েকটী ঘরে প্রবেশ করিলাম। এ সকল ঘরে টেবিলের উপর মস্যাধার মসীপাত্র লেখনী ছুরিকা পেনসিল ইত্যাদি কত অপরূপ সামগ্রী দেখিলাম তাহা বিশেষ করিয়া ব্যক্ত করা অত্যন্ত কঠিন। স্নানাগারে টব ও কত জলপূর্ণ কলসী রহিয়াছে এবং স্নানের সময়ে আর আর যে সমস্ত দ্রব্য আবশ্যক হয় সে সকলি আছে। স্নানালয়ের সন্নিকটে পোসাকের ঘর দৃষ্ট হইল, এখানে নানা বর্ণের নানা প্রকার পোসাক দেখিলাম, কি অপরূপ চমৎকার পাদুকা সকল সাজান রহিয়াছে। এইরূপ কয়েকটী স্নানাগার ও পোসাকের ঘর অবলোকিত হইল। আর আর কত ঘরে অসংখ্য অমূল্য সামগ্রী একে একে দেখিলাম তাহারদের নাম না জানাতে কিছুই লিখিতে পারিলাম না। এবং একবার দৃষ্টি করাতে কোন ব্যাপার বিশেষরূপে স্মরণ থাকিতে পারে না। প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল এরূপ সুশৃঙ্খলাপূর্ব্বক স্থানে স্থানে সংস্থাপিত আছে যে শ্রীশ্রীযুতের যে সময়ে যাহা আবশ্যক হয় তাহা তিনি তদ্দণ্ডেই প্রাপ্ত হয়েন।

[দ্বাদশ কিস্তি]

পদ্য

অট্টালিকা মনোহর, শোভাধর দুঃখহর,
হেরিলাম দেলকোষা মাঝে।
ঘরে ঘরে নানারূপ, নিরুপম নানা রূপ
কতই অমূল্য দ্রব্য সাজে।।
মরি মরি হায় হায়, কত ঝাড় শোভা পায়
ফানসের অদ্ভুত আকার।
নানা কারিগুরি তায়, স্বরূপ না কহা যায়,
নীচে যেন ঝোলে মতিহার।।
কতিপয় স্নানাগার, তাহে কত জলাধার,
জলপূর্ণ আছে শারিশারি।
পোসাকের যত ঘরে, প্রবেশি করিয়া পরে,
দেখিলাম কত আলমারি।।
চমৎকার জামাযোড়া, জুতা কত জোড়া জোড়া,
সাজানো রয়েছে ঘরে ঘরে।
পোসাকেতে কায় যত, তাহা বা কহিব কত,
সকলেই নানা বর্ণ ধরে।।
কিবা ছবি কিবা পাখা, কিবা মকমলে ঢাকা,
লিখিবার সকল টেবিল।
রজতের মস্যাধার, রুচির লেখনী আর,
কিবা ছুরি কিবা পেনসিল।।
এইরূপে একে একে, নানাবিধ দ্রব্য দেখে,
হোলো মম সফল জীবন।
পালটিতে নারি আঁখি, অবাক হইয়া থাকি,
বার হতে না চাহিল মন।।
ধন্য দেলকোষা ধন্য, উদ্যানের অগ্রগণ্য,
হেরিলে কি আর ভুলা যায়।
নরনারী অগণন, করিবারে দরশন,
করিতেছে গমন হেথায়।।
এই চারু উপবন, হইয়াছে সুশোভন,
যে নৃপের ইচ্ছা অনুসারে।
মুক্তকণ্ঠে বারে বারে, ভাসি হর্ষ পারাবারে,
ধন্যবাদ দেই আমি তারে।।

মেওয়া বাগানের দেলারাম ঘরের তুলনা নাই। ইহার পশ্চিম পূর্ব্ব দুই দিগে দুইটী অপূর্ব শোভাধর মনোহর সরোবর আছে, একটীর নাম শ্রীকুণ্ড, আর একটার নাম গুপ্ত কুণ্ড, উত্তরের চাঁদনী শুদ্ধ মার্ব্বেলে নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজভবনের সীমা অনেক দূর পর্য্যন্ত, ইহার অভ্যন্তরে কোন দিগে অন্তঃপুর, কোন দিগে তাজমহল এবং কত স্থানে কত কি আছে তাহার নিরূপণ করা যায় না।

রাজদরবারে যে সকল কর্ম্মচারি কর্ম্ম করেন তাঁহারা অতি বিচক্ষণ এবং ভদ্রবংশোদ্ভব। মহারাজার কাছারি বাড়ী বিলোকন করত বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি, পৃথক পৃথক কত দপ্তরখানা এবং তাহাতে কত কর্ম্মচারি তাহার সংখ্যা হয় না। দেবোত্তর দপ্তর, ব্রহ্মোত্তর দপ্তর, লাখেরাজ দপ্তর, সেরেস্তাদারি দপ্তর, দেওয়ানী দপ্তর, মেম্বরী দপ্তর, ইজারা দপ্তর, পত্তনি দপ্তর, ইমারাৎ দপ্তর, মাসোহারা দপ্তর, খাজাঞ্চী দপ্তর, মহাফেজ খানা, কেরাণী আফিস ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন কত দপ্তরখানা আছে তাহার সকল নাম স্মরণ করিতে পারিলাম না। নানা জাতি হিন্দু, ইংরাজ, ফরাসী, ফিরিঙ্গী, মুসলমান কর্ম্মচারি কত আছে তাহার সংখ্যা হয় না। শ্রী শ্রীযুতের ব্যয়ের কথা কি লিখিব। বৃত্তিভোগি কত সম্ভ্রান্ত লোক বৃত্তিভোগ করিতেছেন, স্থানে স্থানে অসংখ্য বেতনভোগি চাকর বেতন প্রাপ্ত হইতেছে এবং রাজসংসারে থাকিয়া যে কত লোক প্রতিপালিত হইতেছে তাহার নিরূপণ নাই। নিত্যব্যয়ের বিষয় শ্রবণে চমৎকৃত হইয়াছি, যেখানে রাজকীর্ত্তি আছে সেইখানেই ব্যয়ের সীমা নাই। অগণন বাতি এবং অপরিসীম নারিকেল তৈল স্থানে স্থানে নিত্য নিত্য পুড়িয়া থাকে। আলোক দিবার জন্য চাকরেরো সংখ্যা নাই, সন্ধ্যা হইবার ক্ষণকাল পূর্ব্বে তাহারা বাতি তৈল পলিতা লইয়া স্থানে স্থানে যাইতেছে। চিড়িয়াখানা ও খোষখানাতে পশুপক্ষির জন্য প্রত্যহ ৫/ পাঁচ মানের (মণের?) অধিক দুগ্ধ ব্যয় হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত ধান্য, বিচালী, ভূষি, তৃণদানা, মৎস্য, মাংস এবং আর আর আহারীয় সামগ্রী যে কত লাগে তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

মনুষ্যদিগের আহারের জন্য যে ব্যয় তাহার কথা কি কহিব। মহারাজার ইংরাজী এবং সংস্কৃত কালেজ আছে, তাহাতে কত শত ছাত্র বিদ্যোপার্জন করিতেছে। থিয়েটারিতে, সংগীত বিদ্যাতে নিপুণ কতকগুলীন লোক নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা নিজ নিজ যন্ত্রের সহিত গীতবাদ্য করিয়া থাকেন। মহারাজ রাজকর্ম্মে অত্যন্ত নিপূণ এবং এরূপ সুবিচার করিয়া থাকেন যে তাঁহার প্রতি বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই তুষ্ট হয়েন। শ্রীশ্রীযুত বাঙ্গালা ইংরাজী ও হিন্দি ভাষা উত্তম রূপ জানেন এবং করিতা রচনা করিবার তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা আছে, মহারাজের বিরচিত সংগীত গ্রন্থেই সকল ব্যক্ত হইতেছে। মৃগয়া বিদ্যায় মহারাজা অদ্বিতীয়, অবগতি হইল যে যখন যে পক্ষিকে লক্ষ্য করেন তখন তাহার একেবারে পক্ষভেদ করেন। শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান দ্বিজ লক্ষ্য মাত্রেই ভূমিতে পতিত হয়।

মাহরাজ রাজনিকেতনের অভ্যন্তরে এক অপরূপ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার নাম মহাতাপ মঞ্জিল রাখিয়াছেন। এই প্রাসাদের মধ্যে যে অত্যাশ্চর্য দুর্লভ ব্যাপার অবলোকন করিলাম সে প্রকার আর কোথাও দেখি নাই, এবং দেখিবারো সম্ভাবনা নাই। ইহার দুই পার্শ্বে এক শত দর্জ্জি প্রতি দিবস উপস্থিত হইয়া যথানিয়মে কার্য্য করিতেছে। তাহারদের নিকটে শত শত উত্তমোত্তম পরিধান অবলোকিত হইল। এই অট্টালিকা তিন তালাতে বিভক্ত হইয়াছে। এহার নীচে মধ্যে উপরে বিবিধ দ্রব্য পরিপূরিত বড় বড় অনেক গৃহ আছে। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে কোন সামগ্রী দেখিব তাহা স্থির করিতে পারিলাম না, কারণ যে ঘরে প্রবিষ্ট হই সেই ঘরেই অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্ট হইতে থাকে। প্রত্যেক গৃহ অগণন উত্তম মার্ব্বেলের দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে। প্রত্যেক

ঘরে বহুমূল্য ঝাড়, নানাবিধ কাচের সামগ্রী, উত্তমোত্তম ছবি, উত্তমোত্তম চেয়ার শোভা করিতেছে। কোন গৃহে ঘড়ি বাজিতেছে, কোন গৃহে সুদৃশ্য উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তকাবলী সুনিয়মে স্থাপিত হইয়াছে। কোন কোন গৃহে অত্যন্ত সুন্দর পর্য্যঙ্ক মশারি ও বালিস বিলোকনে মোহিত হইলাম। মহারাজের উপবেশনের এক একটা ঘর দেখিয়া যাবজ্জীবনের জন্য চমৎকৃত হইয়াছি। শ্রী শ্রীযুতের স্নান করিবার এবং গোপনীয় লিপি লিখিবার গৃহ সকলি বা কি আশ্চর্য্য। আর আর যত গৃহ দেখিলাম সকলেতেই নেত্ররঞ্জন অত্যপরূপ দ্রব্য সকল জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। সোপান সকল যেরূপ বিবিধ বর্ণ মাদুরে আবৃত সেরূপ মাদুর অনেকেই দেখেন নাই। এই রমণীয় লোচন প্রফুল্লকর অট্টালিকা হইতে বহিষ্কৃত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর, কারণ যৎকালীন আমি বাহিরে আইলাম তৎকালীন মনেতে অতিশয় কষ্ট হইতে লাগিল, এবং ক্ষণকাল পরে সকলই স্বপ্নবৎ হইল। এক একটা ঘরে দুই দিবস থাকিতে পারিলে তত্রস্থ দ্রব্যসকলের শোভার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে সক্ষম হইতাম।

মহাতাপ মঞ্জিলের পূর্ব্বভাগে একটী মনোমুগ্ধকর উদ্যান নানাজাতি প্রস্ফুটিত ফুলে সুশোভিত হইয়া চিত্তহরণ করিতে লাগিল।

[ত্রয়োদশ কিস্তি]

পদ্য

মহাতাপ মঞ্জিলে করিয়া আরোহণ।
করিলাম কিবা চারু শোভা বিলোকন।।
দুই পার্শ্বে দর্জিগণ করিতেছে কার্য।
কোথাও না দেখি হেন অপরূপ সাজ।।
সুরম্য মাদুরে মোড়া সকল সোপান।
নানা বর্ণ এক ঠাঁই আছে বিদ্যমান।।
ঘরে ঘরে নানা দ্রব্য নয়নরঞ্জন।
একাননে সে সকল না হয় বর্ণন।।
স্থানে স্থানে ঝুলিতেছে কত শত ছবি।
বোধ হয় যেন সব জ্বলিতেছে রবি।।
বেলয়াড়ি ঝাড় দেলগিরি অগণন।
কাঁচের কতই দ্রব্য অপূর্ব্ব গঠন।।
সুচারু পর্য্যঙ্ক কিবা মশারি সুন্দর।
বালিস পেয়েছে কত নানা বর্ণধর।।
কোন ঘরে দেখিলাম স্নানের ব্যাপার।
কোন ঘর হইয়াছে পুস্তক আগার।।
লিপি লিখিবার গৃহ কত রমণীয়।
তাতে কত দ্রব্য সুরেশের কমণীয়।।
স্থানে স্থানে টেবিল চেয়ার শোভিতেছে।
কোন গৃহে কর্ণে ক্ষণে ঘড়ী বাজিতেছে।।
এমন শোভার স্থান আর নাকি (নাহি) হয়।
হেরিলে মনের আর সন্তাপ না রয়।।
এই প্রাসাদের পূর্ব্বে কুসুম উদ্যান।
নানা জাতি ফুলে হইয়াছে শোভমান।।
কতই কুসুমকলি প্রকাশে লপন।
স্পর্শ করি তাহাদিগে নাচায় পবন।।

প্যালেস "Palace" নামক প্রাসাদেরও সৌন্দর্য্যের সীমা নাই। ইহার "Music Room" বিলোকনে ইন্দ্রালয়ে প্রবেশ করিয়াছি এমন জ্ঞান হইল। বড় বড় নিরুপম মহামূল্য দর্পণ চারিদিগের দেয়ালে অনির্ব্বচনীয় কান্তি প্রকটন করিতেছে। যে দিগে নেত্র উন্মীলিত করি, দর্শনের জন্য সেই দিগেই এই ঘরের সদৃশ ঘর দেখিতে পাইয়া মনোমধ্যে নানা ভাবোদয় হইতে লাগিল। আমরা আপনাপন প্রতিমূর্ত্তি স্থির নয়নে দর্শন করিলাম। তদন্তরে একটা প্রধান গৃহে প্রবেশ করিলাম, এখানে ৬টা অমূল্য অতুল্য ঝাড় মাণিক্যের ন্যায় জ্বলিতেছে। স্থানে স্থানে কত অদ্ভুত চেয়ার রহিয়াছে। কয়েকেটী মার্ব্বেলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, ইহারদের উপরে নানা জাতি কুসুমের তোড়া থাকে। আর আর কত দ্রব্য আছে সকলের নাম অবগত নহি। নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের ভোজনের গৃহ অত্যন্ত প্রশস্ত ও উত্তম, ইহার মধ্যে এক বৃহৎ টেবিল আছে তৎ চতুঃপার্শ্বে অগণন চেয়ার সুশৃঙ্খলায় থাকাতে অত্যন্ত সুদৃশ্য হইয়াছে। এইরূপে একে একে সকল গৃহে প্রবিষ্ট হইলাম। সকল ঘরেই মার্ব্বেলের কারখানা দৃষ্ট হইল। আলমারি সকল সাটিনে মোড়া হইয়াছে। স্থানে স্থানে বিচিত্র ছবি এবং অপূর্ব্ব কাঁচের ব্যাপার দৃষ্ট হইল। কোন স্থানে মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের, মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের, মহারাজ মহাতাবচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শনে চরিতার্থ হইলাম। পুরোহিত ও পারিষদগণের ছবি সকলি বা কি চমৎকার। কোন স্থানে রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুত বাবু নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি শত শত সম্ভ্রান্ত মহামহিমার্ণব মহাপুরুষদিগের প্রতিমূর্ত্তি সমূহই বা কি বিচিত্ররূপে চিত্র হইয়াছে। এ সকল দর্শনে কাহার হৃদয়পদ্ম প্রস্ফুটিত না হয়? আহা! এরূপ শোভা আর কোথায় আছে? কত ঘরে কত উত্তম পাখা ঝুলিতেছে। এক একটী সামগ্রীর সৌন্দর্য্যেতে চমৎকার জ্ঞান হইতে থাকে। মহারাজের ব্রহ্মসভার গৃহ নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছে। অধ্যাপত গায়কদিগের উপবেশনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান রহিয়াছে। পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ এবং তারকচন্দ্র তত্ত্বরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বারা এই সভার কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

"Fountain Room" নামক গৃহের অত্যাশ্চর্য্য শোভা। এ স্থলে নানা জাতি মৃত বন্য জন্তু দেখিতে পাইলাম। এই প্যালেস যেরূপ উত্তম ইহার সজ্জাও সেইরূপ সুন্দর। দৃষ্টি করণান্তর লোচন মুদ্রিত করিতে হইলে অত্যন্ত মনস্তাপ পাইতে হয়। তৎপরে অবগতি হইল যে মহাতাপ মঞ্জিলে এবং প্যালেসের প্রায় দ্বাদশ লক্ষ টাকার দ্রব্য আছে।

[চতুর্দশ কিস্তি]

পদ্য

সুচারু প্যালেস, করিয়া প্রবেশ,
ভাবময় হোল মন।
অনুভব হেন ইন্দ্রালয় যেন
করিলাম আরোহণ।।
কিবা মনোহর, নানারূপ ঘর,
তাহাতে কতই সাজ।
যথা তথা চাই, দেখিবারে পাই,
শুধু মনোহর কায।।
অপূর্ব্ব গঠন, কতই দর্পণ,
কারিগুরি তার নানা।
শোভা কিবা কব, ঘরে ঘরে সব,
ষাটিনের কারখানা।।
মণির মতন, ঝাড় অগণন,
জ্বলিতেছে স্থানে স্থানে।
ভাবিয়া না পাই, সর্ব্ব আগে চাই,
কোন দ্রব্য কোন পানে।।
মার্ব্বেলে নির্ম্মিত, অতি সুশোভিত,
ছোট ছোট থাম কটা।
ঝিকমিক করে, মুগ্ধ করে নরে,
কিবা প্রকাশিছে ছটা।।
তাদের উপর, অতি সুখকর,
রোয়েছে ফুলের তোড়া।
আলমারি যত নহে একমত
সকলি সাটিনে মোড়া।।
অসংখ্য চেয়ার, কাঁচের ব্যাপার,
হেরিলাম ভূমি ভূরি।
কত অপরূপ, ...অনুরূপ,
মনকে করিল চুরি।।
মিউজিক রুম, হেরে এসে ঘুম,
জুড়ায় তাপিত প্রাণ।
মনের মতন, অমূল্য রতন,
ক্ষণে ক্ষণে হরে জ্ঞান।।
ছবি শত শত, বিভাকর মত,
যেন হোয়ে দীপ্তিমান।
নানা বর্ণ তায়, দেয়ালের গায়,
রোয়েছে বিরাজমান।।
... ...
রাজা তেজতন্দ্র প্রায় যেন চন্দ্র
ছবিরূপে বিরাজিত।
পারিষদগণ, কত শত জন,

চারিদিগে সুশোভিত।।
প্রতাপ আগার, রূপের ভাণ্ডার
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রাজ।
মুকুট মাথায়, কত কায তায়,
পটে করেন বিরাজ।।
ছবির আধারে, ছবির আকারে,
মহাতাপচন্দ্র ভূপ।
করেন বিরাজ, কিবা তার সাজ,
কিবা মনোহর রূপ।।
রাজদণ্ড করে শিরের উপরে
কিবা কিরীট সুন্দর।
দাড়ি কিবা চিত্র, করিয়াছে চিত্র
সুনিপুণ চিত্রকর।।
ভূকৈলাসে ধাম, খ্যাত তাঁর নাম,
রাজা শ্রীসত্যচরণ।
দেবেন্দ্র ঠাকুর, নগেন্দ্র ঠাকুর,
আর কত মহাজন।।
ছবির আকারে, হেরি একাগারে,
ইঁহাদিগে এক ঠাঁই।
হৃদয় রাজীব, হইল সজীব,
আনন্দের সীমা নাই।।
মক্‌মলে ঢাকা, কত টানা পাখা,
দেখিলাম কত ঘরে।
ব্রহ্ম সভালয়, কিবা চিত্র হয়,
দরশনে চিত্ত হরে।।
প্যালেস হরিয়া, আশ্চর্য্য মানিয়া,
নীচে নামি আইলাম।
ফাউন্টেনাগার, অতি চমৎকার,
তার পরে হেরিলাম।।
মৃত জন্তু কত, আছে শত শত,
এখানেতে সারি সারি।
হেন অনুভব, বেঁচে যেন সব,
রয় হোয়ে অনাহারি।।
অতি অপরূপ, কতিপয় কূপ,
পরে করি বিলোকন।
আমাদের মাঝে, পদ্মদল সাজে,
অতিশয় সুশোভন।

[পঞ্চদশ কিস্তি]

মহারাজাধিরাজ সিংহাসনারূঢ় হইয়া রাজসভাসদসমূহের সমভিব্যাহারে রাজসভায় যেরূপে উপবেশন করেন আমার দুরদৃষ্টক্রমে সেরূপ দর্শন করা হয় না, তজ্জন্য রাজসভা বর্ণন করিতে পারিলাম না। কিন্তু অন্যান্য স্থানে শ্রীশ্রীযুতের শ্রীমূর্ত্তি কয়েকবার অবলোকন করিয়া চরিতার্থ হইয়াছি।

শ্রীশ্রীযুতের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, তাঁহার সরলতা, অমায়িকতা এবং দয়াদি সদ্‌গুণের বিষয় কি লিখিব, তিনি সকলেরি তত্ত্বাবধান এবং সকলকেই প্রিয় বাক্যে সম্ভাষণ করেন, তিনি যখন যেখানে উপবেশন করেন তখন তাঁহার চতুর্দ্দিগে কত লোক করপুটে দণ্ডায়মান থাকে, একে একে রাজসভাসৎসমূহকে অবলোকন করিলাম। এই জগতীপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া সামান্য বিষয়াধিপতি হইয়া কত স্থানে কত লোক অহঙ্কার করেন এবং কাহারো সমভিব্যাহারে কথোপকথন করিতেও ইচ্ছা করেন না। কিন্তু বর্দ্ধমানেশ্বর অসামান্য ঐশ্বর্যশালী হইয়া মাৎসর্যশূন্য হইয়াছেন, সকলের প্রতি একভাবে বাক্য প্রয়োগ করেন, এই মহদ্‌গুণের জন্য বর্দ্ধমানাধিপতিকে যত প্রশংসা করা বিধেয় তত অন্য কোন সামান্য দরিদ্র নিরহঙ্কৃত ব্যক্তিতে করিতে পারি না, কারণ দীনহীন মানুষ অনায়াসে গর্ব্বহীন হইতে পারেন, কিন্তু অতুল্য ঐশ্বর্যস্বামী হইয়া অভিমান-রহিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, তাঁহার এরূপ স্বভাব বিলোকনে পাঁচহাজারপতি, দশহাজারপতি, পঞ্চাশহাজারপতি, লক্ষপতি, দশলক্ষপতি, বিংশতিলক্ষপতি, কোটিপতি ধনবান ব্যক্তিবৃন্দের দর্পচূর্ণ হইবার সম্ভাবনা।

সদ্‌গুণনিকর বর্দ্ধমানাধীশ্বর প্রতিদিন দুইবার তাঁহার প্রিয় রমণীয় শোভনীয় দেলকোষা উপবনে গাড়ি আরূঢ় হইয়া গমন করিয়া থাকেন, কয়েকটা তুরুপসোয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে থাকে, তাহাতে কি এক অদ্ভুত শোভা প্রকটিত হয়, বিদ্যাবিষয়ে মহারাজ যেরূপ উৎসাহ প্রদান করেন তদ্দৃষ্টান্ত বর্দ্ধমানস্থ ইংরাজী এবং সংস্কৃত কলেজদ্বয়ে এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে প্রকাশ পাইতেছে। সর্ব্বসাধারণের উপকার সাধনার্থে তিনি কত স্থানে কত ব্যাপারে কত ব্যয় করিয়া থাকেন তাহা বলা যায় না, এক্ষণে জগদীশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করি যে তিনি দেশহিতৈষী দীনের আশ্রয় মহারাজকে দীর্ঘজীবি করুন।

পদ্য।

ধন্য ধন্য মহারাজ বর্দ্ধমানেশ্বর।
পণ্ডিত সুজন ধীর গুণের সাগর।।
অশেষ বিভবশালী মহিমা আলয়।
যশোরাশি সুধাভাষী দীনের আশ্রয়।।
তাঁহার প্রসাদে কত স্থানে কত জন।
করিতেছে মনোসুখে জীবন যাপন।।
কতই মানুষ লোয়ে তাঁহার শরণ।
অধন হইয়া তারা এখন সধন।।
তাঁহা হোতে বর্দ্ধমান শোভার আকর।
তাঁহা হোতে এ নগর, নেত্র তুষ্টিকর।।
তাঁহার কৃপায় কত শত ছাত্রগণ।
অনায়াসে করিতেছে বিদ্যা উপার্জ্জন।।
তাঁহার কৃপায় কত দীন দুঃখি জন।
মহানন্দে করিতেছে উদর পালন।।
স্থানে স্থানে গ্রামে গ্রামে তাঁহার কারণ।
হোতেছে দেশের কত মঙ্গল সাধন।।
মহারাজ সঙ্গে লোয়ে অনুচরগণ।
প্রত্যহ করেন রাজকার্য্য সম্পাদন।।
প্রজাগণ সুখে বাস করে রাজ্যে তাঁর।
সকলেই তুষ্ট দেখি তাঁহার বিচার।।
সতত পরেন তিনি নম্রতার হার।
আসিতে নিকটে তাঁর নারে অহঙ্কার।

[ষোড়শ কিস্তি]

বর্দ্ধমানের দোলের ব্যাপার সন্দর্শন করত চমৎকৃত হইয়াছি। শ্রীল শ্রীবর্দ্ধমানেশ্বর মহিমাসাগর দোলযাত্রা উপলক্ষে সভাসদগণ এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত এক সপ্তাহ আমোদ প্রমোদ করিয়াছেন, তদ্বিশেষ বিস্তার করিয়া লিখিতে অক্ষম হইলাম, পাঠকমণ্ডলীর বিদিতার্থে যৎকিঞ্চিৎ নিম্নভাগে লিখিলাম। এই নগরের স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম যে রাজপথের সকল ধূলা বৃক্ষসকলের পত্র এবং অনেকানেক পুষ্করিণী আবিরে লাল হইয়াছে, শুভ্র বর্ণের কাপড় কাহারো গাত্রে দেখিতে পাইলাম না, সকলি লালে লাল। মহারাজার হাট ঘাট সকলিই ফাকে পরিপূরিত। কোথাও ফাক নাই। মিষ্টান্ন মৎস্য প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য আবিরে আবৃত দৃষ্ট হইল, দেবালয় সকলে গীতবাদ্য হইতে লাগিল এবং নগরময় দিবসযামিনী কেবল আনন্দের ধ্বনি শ্রুত হওয়া গেল, যে যাহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইল সে তাহার কলেবর ফাকমিশ্রিত ধূলায় ধূসর করিতে ত্রুটী করিল না, এই আমোদে নগরস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মাতিয়াছিলেন, কেহই আলস্য পরবশ হয়েন নাই, স্থানে স্থানে অসংখ্য আলোক আলো করাতে নগর আলোকময় হইয়াছিল, রাজভবনে নাচ তামাসা এবং উত্তমরূপে রোশনাই হওয়াতে রজনীতে রাজালয় ইন্দ্রালয় বোধ হইতে লাগিল, হরির গানসকল শ্রবণ করিয়া অসীম আহ্লাদার্ণবে নিমগ্ন হইলাম, শেষ দিবসে প্রদোষ সময়ে মহারাজ পারিষদ সভাসদ অমাত্য সমগ্রের সমভিব্যাহারে রাজপথ আমোদ করিতে করিতে রাজবাটি সে...তে দেলকোষা উপবনে পদব্রজে গমন করিয়া মানসসরোবরে অবগাহন করণান্তর তত্রত্য সুরম্য অট্টালিকার অভ্যন্তরে ভোজন করিলেন, এই সমারোহের কথা কি লিখিব। সর্ব্বাগ্রে দুইজন নকিব মহারাজার আগমন ব্যক্ত করিতে করিতে চলিল, তৎপশ্চাতে দুইটী আতঙ্কদায়ক মাতঙ্গ ফাকের বস্তাসকল পৃষ্ঠদেশে বহন করিতে করিতে প্রস্থান করিল, পরিশেষে শ্রীশ্রীযুত শত শত লোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিলেন। আহা এমন চমৎকার ব্যাপার আর কোথাও দেখি নাই, অবগত হইলাম এই উৎসবে ১০০০ মোন আবির ব্যয় হইয়াছে এবং তামাশা নাচ ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়ে যে কত ব্যয় হইয়াছে তাহার নিরূপণ নাই।

[**সপ্তদশ কিস্তি**]

কি সুখ হইল লাভ হেরি হেথা হরি।
যথা তথা সকলের মুখে শুনি হরি।।
আমোদ প্রমোদে মাতি করে সবে গোল।
বাজিতে লাগিল কত করতাল খোল।।
মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে পারিষদগণ।
হৃষ্ট মনে এ আমোদে আমোদিত জন।।
এমন আমোদ কোথা না হয় গোচর।
অন্য দূরে থাক মাতে কত শ্বেত নর।।
দেবালয়ে হাটে ঘাটে ছড়াছড়ি ফাক।
রাজপথ গলি কোন স্থান নাই ফাক।।
রাজমন্ত্রি হীরালাল আর মণিলাল।
বাকি কেহ নাই সবে হইয়াছে লাল।।
পথধূলা তরুদল কত সরোবর।
আবিরে হইল লাল দেখিতে সুন্দর।।
ঘরে ঘরে কত নগরের লোক সব।
মহানন্দে করিতেছে আনন্দের রব।।
কি মানব কি মানবী কি বুড়া কি ছেলে।
সকলেই দিবানিশি সুখে ফাক খেলে।।
নাগর দিতেছে ফাক নাগরীর গায়।
নাগরী আবির মাখি নাচে আর গায়।।
নৃত্য গীত বাদ্য হয় রাজার ভবনে।
জয় নৃপালের জয় কয় সর্ব্বজনে।।
সিপাই খানসামা আদি যত ভূপদাস।
সকলের দেহে হেরিলাম লাল বাস।।
করিপাল হয়পাল গাড়য়ান যত।
আমোদ প্রমোদ তারা করে নানা মত।।
নানা দ্রব্যে দোকানিরা দোকান সাজায়।
রজনীতে অপরূপ দেখি পায় পায়।
ছেনাবড়া রসকরা মধুর মিঠাই।
রসগোল্লা ওলা খাজা যখন যা খাই।।
তরকারি আদি দ্রব্য ফাক মাখা সব।
কে কোথা দেখেছে হেন দোলের উৎসব।
মাতায় উড়ানি বাঁধা ইয়ারের দল।
স্থানে স্থানে ভ্রমে তারা হাসে খলখল।।
বারবধূ বিলোকনে কত রঙ্গ করে।
কেহ বা কৌতুক করি ধরে কারো করে।।
কোন স্থানে এক ঠাঁই গণিকারা মেলি।
পরস্পর মাখে ফাক করে নানা কেলি।।
কেহ কেহ স্নান হেতু যায় সরোবরে।
উঠাতে গায়ের ফাক কত যত্ন করে।।
এরূপ আমোদ হেরি বর্দ্ধমানময়।
বল দেখি কে না হয় প্রফুল্ল হৃদয়।।
শেষ দিনে সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধমানেশ্বর।
সঙ্গেতে লইয়া যত অমাত্যনিকর।।
পদব্রজে যান দেলকোষা উপবনে।
স্বকরে করেন সান মানসের বনে।।
জনতার কথা কি কহিব একাননে।
সরোবর নীল লাল হোল ততক্ষণে।।
মানসের চারি ধারে রুচির সোপান।
একেবারে সকলেতে করিলেন স্নান।।
বর্দ্ধমানেশ্বর লোয়ে অনুচরগণ।
অবশেষে করিলেন সুখেতে ভোজন।।
স্বজন মণ্ডলী সহ গাড়ি আরোহণে।
নিশিতে গেলেন তবে রাজনিকেতনে।।

[**শেষ কিস্তি**]

বর্দ্ধমান হইতে প্রত্যাগমন করণকালীন মনোমধ্যে যেরূপ ভবোদয় হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ ব্যক্ত করিলাম।

রূপক

পদ্য

ধন্যা ধন্যা, পুরী বর্দ্ধমান সুরূপিণী।
মনোহরা, সুখকরা, অসুখনাশিনী।।
ভূষণে ভূষিতা ধনী মনুজ মোহিনী।
অগণন গুণযুতা বামা বিনোদিনী।।
তব সমা মনোরমা দেখিতে না পাই।
কি কব তোমার কথা বলিহারি যাই।।
কিবা বেশ কিবা ভূষা কিবা তব রূপ।
তুমি তো গো তব প্রাণনাষ সোহাগিনী।
সুখময়ী অনুপমা আনন্দদায়িনা।।
... ...
ধন্য ধন্য এ সংসারে ধন্য হন তারা।
তোমার হৃদয়বাসী হোয়েছেন যাঁরা।
তব দত্ত দ্রব্য খেলে পীড়া নাহি হয়।
তোমারে হেরিয়া সবে পুলকিত রয়।।
মানসিক শারীরিক যাতনা না থাকে।
তব প্রতি দৃঢ়ভাবে সব ভক্তি রাখে।।
তব কোলে স্থান পেলে যত সুখোদয়।
সে সুখ আগেতে মম অনুভূত নয়।।
জন্মিয়া যে সুক কভু ভোগ করি নাই।
এখন এখানে এসে সেই সুখ পাই।।
তোমার হৃদয়ে করি অশন শয়ন।
স্বর্গতুল্য সুখ পাইলাম প্রতিক্ষণ।।
ভাই বন্ধু আদি করি যত পরিজন।
হইয়াছিলাম আমি সব বিস্মরণ।।
কণামাত্র মনে না পড়িত নিজ ঘরে।
দশ দিন ভাসিলাম আনন্দ সাগরে।।
এখন ফিরিয়া আমি নিজ দেশে যাই।
তব কাছে আর মম আসা আশা নাই।
... ...
যাঁহার কৃপায় হেথা হোয়েছিল আসা।
করিয়াছিলাম আমি তব হৃদয়ে বাসা।।
দীর্ঘজীবী করুন তাঁহারে ভগবান।
উন্নত করুন সর্ব্ব ঠাঁই তাঁর মান।।
যদি মম প্রতি হয় কৃপা বিধাতার।
যদ্যপি কখন হেথা আসি পুনর্ব্বার।।
তবে তো পাইব আমি দর্শন তোমার।
নতুবা তোমার দেখা না পাইব আর।।
... ...
দেশে গিয়া অদ্যাবধি যথা তথা যাব।
মনোসুখে তোমারি গুণের গান গাব।।
বান্ধব সমীপে তব রূপ বিবরণ।
সতত কহিব না হইব বিস্মরণ।।
সধবা হইয়া তুমি থাক চিরদিন।
অন্ন দাও তাহাদিকে যারা দীনহীন।।

নানা কারণবশত বর্দ্ধমানের স্বরূপ বর্ণনা করিতে পারিলাম না। হে পাঠকমণ্ডলী। ৪ জ্যৈষ্ঠ অবধি অদ্য ২৪ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত আমার রচনাতে যে সকল দোষ দর্শন করিয়াছেন এবং করিবেন তাহার অপরাধ কৃপাগুণে গ্রহণ করিবেন না।

চৈত্র। ১২৬০ সাল।

শ্রীরাধামাধব মিত্র
সাং জেজুর।

বর্ধমান শহরের লুপ্ত এক জনজাতি ‘পাখমারা’

রতনলাল দত্ত

রাঢ় বাংলার মধ্যমণি এই বর্ধমান। বর্ধমান এক মিশ্র-জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে পূর্বে গাঙ্গেয় সমভূমি ও পূর্বাঞ্চল থেকে প্রবাহিত গঙ্গা, অজয়, দামোদর, বাঁকা, খড়ি প্রভৃতি নদনদীর অববাহিকায় পলিসঞ্চিত সমভূমির কৃষি অঞ্চল ও পশ্চিমাংশের কঙ্করাকীর্ণ উচ্চ টিলাভূমি বনাঞ্চল অনুর্বর প্রস্তরময় গাণ্ডোয়ানা ল্যান্ড খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ।

ফলে কয়লাখনি, কলকারখানা, রেললাইন পাতা ইত্যাদি শ্রমবহুল কাজের শ্রমিক হিসেবে জেলার প্রান্তসীমার অনেক অবাঙালি শ্রমিক এই জেলায় এসে বসবাস করছে। আবার স্বাধীনোত্তর কালে ওপার বাংলা থেকে আগত ছিন্নমুল উদ্বাস্তু জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কলোনিতে পুনর্বাসন পেয়ে বসবাস করছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে দুর্গাপুরের গোপালনগর, আসানসোলের মহিশীলা কলোনি, কাটোয়ার পাবনা কলোনি, কেতুগ্রামের শাঁখাই কলোনি, কালনার যোগীপাড়া, লাট্টুবাবুর কলোনি, বর্ধমান শহরের ইছলাবাদ, নীলপুর, শাঁখারীপুকুর, ভাতশালা, বালিডাঙ্গা, বিধানপল্লী, উদয়পল্লী, রথতলা ইত্যাদি। এইসমস্ত এলাকার অধিবাসীগণ স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে সাবেক পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ থেকে আগত বলে ‘বাঙাল’ নামে পরিচিত। তেমনি স্থানীয় অধিবাসীরা বাঙালদের কাছে ‘ঘটি’ নামে পরিচিত। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের ৬৫-৬৬ বছর পরে পারস্পরিক তির্যক মন্তব্য ও বৈরিতা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে, মিলন, ঘনিষ্ঠতা ও বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন। বর্ধমানের স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুড়ি, মুসলমান, পাঞ্জাবি ক্ষেত্রি, মোদক বা ময়রা, গোপ, সদ্‌গোপ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আর জাতিবৃত্তি বর্ণ সামাজিক স্তর হিসেবে তেলি, ধোপা (রজক) বারুই, তন্তুবায়, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, কৈবর্ত, শুঁড়ি প্রভৃতি ধর্মাচরণের দিক দিয়ে হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন এবং হিন্দুধর্মের নানা শাখা সমন্বিত পঞ্চোপাসক-এর অন্তর্গত। এছাড়াও জেলায় আছে বাউড়ি, বাগ্দি, মুচি, নবশাখ সম্প্রদায়, আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, মুণ্ডা শবর, হো, বীরহোর কিরাত, আহির প্রভৃতি শিকারজীবী অষ্ট্রিক দ্রাবিড় জনজাতির কিছু লোক।

শেষোক্ত জনজাতি নিয়েই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা, যাঁরা আজ যান্ত্রিক সভ্যতা, তথাকথিত প্রগতি, বিশ্বায়ন ও গতিময়তার যুগে অবলুপ্তির পথে। অথচ এরাই এক সময় জেলা ও শহরের উল্লেখযোগ্য জনজাতি ছিল।

এরা প্রধানত নদনদী, দিঘির ডাঙা তীর, বনাঞ্চলে বসবাস করতো। এরা প্রধানত ছিল শিকারজীবী। বনের ফুল ফল, পাতা, মধু সংগ্রাহক। এরা পশু পাখি শিকার করে মাংস বিক্রি করে ফলফলাদি মাংস ইত্যাদি খেয়ে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করতো, জীবিকা নির্বাহ করতো। ডোম, শবরদের সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নির্দশন চর্যাপদে আছে—‘নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহারি কুড়ি আ’ এবং ‘উচা উচা পাবত তাহি বসই সবরী বালী’। তথাকথিত শিক্ষিত সভ্য সমাজের বাইরে উচ্চ পার্বত্য বনাঞ্চলে শহরের বাইরে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে এরা বসবাস করতো। অরণ্য, বৃক্ষ, বনজঙ্গল যে তাঁদের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত তা তাঁদের বিচরণক্ষেত্র, স্থাননাম থেকেই বোঝা যায়। যেমন বীরহাটা, বনমসজিদ, বাদামতলা, রমনারবাগ, জিলিপিবাগান, বাবুরবাগ, মেহেদিবাগান, মোহনবাগান, আমবাগান, তেঁতুলতলা, বনকাটি, পলাশডাঙা, আমড়া, পলাশন, বনসুজাপুর, সিমডাল, বননবগ্রাম প্রভৃতি।

বর্ধমান জেলায় বেশি অরণ্য নেই। এককালে দুর্গাপুর ঘন অরণ্যে আবৃত ছিল। বনে ছিল শাল, পিয়াল, তাল, তমাল, মুর্গা, মহুয়া, কেঁদ, বৈঁচি, আম, জাম, খেজুর, ডুমুর। আর বন্য প্রাণীর মধ্যে ছিল বাঘ, চিতাবাঘ, হায়না, ভালুক, নেকড়ে, শিয়াল, বনবিড়াল, খড়াস, বেজি, খরগোস, কাঠবিড়ালী, উদ্‌বিড়াল, নানা বিষধর সাপ। আউসগ্রাম, গোপভূম, কাঁকসা, দুর্গাপুর বনজঙ্গল অধ্যুষিত বনাঞ্চল জঙ্গলমহল নামে পরিচিত ছিল। সেখানে থাকতো বনবাসী আদিবাসী, শিকারজীবী, সাঁওতাল ও পাখমারা সম্প্রদায়। ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্র ছাড়াও ব্যবহার করতো বনাঞ্চল জাত বনৌষধি অনন্তমূল, শতমূল, কালোমেঘ, গুলঞ্চ, বিশল্যকরণী, বেল, বহেড়া, হরিতকি, আমলকি, অর্জুন প্রভৃতি রোগ নিরাময়কারী আয়ুর্বেদিক সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতি। জীবিকা নির্বাহের জন্য পিঁপড়ের ডিম, নানা ধরনের ছাতু—কুড়কুড়ি ছাতু, দুর্গা ছাতু, শালছাতু, মধু, শালপাতা, কাঠ সংগ্রহ ও পশু পাখি শিকার করতো।

এই জঙ্গল মহলের সঙ্গে ছোটোনাগপুরের জঙ্গলের যোগ ছিল। বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে লোকজন এই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতো। বিশাল ও গভীর বনাঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে প্রবাহিত দা-মুণ্ডা দেবনদ, দুঃখের দামোদর উত্তর-পশ্চিম থেকে প্রবাহিত হয়ে পুব মুখে, বীরভূমের ও বর্ধমানের সীমারেখা ছুঁয়ে অজেয় অজয়। সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় সাঁওতাল, পাখমারা, বোড়ো, ডোম প্রভৃতি অজয় পেরিয়ে, জঙ্গলমহলের মধ্য দিয়ে বর্ধমানে ঢোকে। পাখমারা হল একটি অরণ্যচারী শিকারজীবী সম্প্রদায়। এরা আমাদের সামাজিক আচার আচরণ থেকে সব সময়ই যেন দূরে দূরে থাকতে চায়। এই রাঢ়বঙ্গের আসানসোল, বার্নপুর, দুর্গাপুর, বর্ধমান, আউসগ্রাম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া পুরুলিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে এদের দেখা যায়। এদের আদি নিবাস হাজারিবাগ অথবা জামুড়িয়া বলে জানা যায়। এরা সাধারণত জঙ্গলের

কাছাকাছি জীবিকার স্বার্থে বসবাস করতে পছন্দ করে।

বর্ধমান শহরেও এক সময় পাখমারা সম্প্রদায় ছিল। ছিল তাদের পশুপাখি শিকারের অনুকূল পরিবেশ—রমণার বাগান অঞ্চল, গোপালবাগের পরিখা বেষ্টিত দিলখুস উদ্যান অঞ্চল, কৃষ্ণসায়র, শ্যামসায়র, কমলসায়র, রানিসায়রের চারদিকের পাড় ছিল সুউচ্চ নানাবিধ বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ। কাঞ্চননগরের বিস্তৃত অরণ্য অঞ্চল, বাদামতলার একাধিক কাঠবাদাম গাছ, তেঁতুলতলা, বকুলতলা, মেহেদিবাগান, জি টি রোডের দু-ধারের অশত্থ গাছের সারি, ছোটোনীলপুর, বড়নীলপুর, ইছলাবাদ, টাউন স্কুলের তৎকালীন নীলকুঠির বাগান, বাঁকার দুই তীরে আম, কালোজাম, বেল, গাব, খিন্নি, বৈঁচি, বাতাবী লেবু, কামরাঙা, সফেদা, ইছলাবাদ চাঁদমারি মাঠ ও ৪ নম্বর ইছলাবাদে পুলিশ লাইনের কাছে ফলের বাগান ছিল। পুলিশ লাইনের পূর্বে জি টি রোডের গায়ে চকদিঘীর সিংহরায়দের বাগান, হরিবংশ পরিবারের কৃষিখামার। বর্ধমান রেল স্টেশনের সামনে ছিল প্রকাণ্ড এক নিমগাছ। রূপমহল সিনেমার পাশে ছিল বটগাছ। পুলিশ লাইন ও কানাইনাটশাল, ঘোড়দৌড় চটির প্রবেশ মুখে জি টি রোডের দুই ধারে ছিল বট, জাম, দেবদারু ও ঝাউগাছ। এছাড়া রেললাইন ও দামোদরের তীরে ছিল অনেক বনাঞ্চল। পাখমারারা রাস্তার দুই ধারের গাছে দড়ি বেঁধে বাদুড়, চামচিকে, তিতির প্রভৃতি ধরার জন্য তাদের উড়ে যাবার গতিপথে জাল টাঙিয়ে রাখতো। গাছে বসার আগে তারা আটকা পড়ে যেত। আবার গাদাবন্দুক ও সবুজ পাতার ঢাল নিয়েও তারা বাঁকা দামোদর তীরবর্তী বনাঞ্চলে বনমুরগি তিতির ইত্যাদি শিকার করতে যেতো। কখনও দেখা যেত সরু কঞ্চির মতো ফাঁপা বাঁশে আঠালো পদার্থ লাগিয়ে এক এক করে সরু কঞ্চির মতো বাঁশ জুড়ে লম্বা আঁকশি বানিয়ে শিকারের ডানায় আঠা লাগিয়ে ধরতো। আবার কখনও বড়শি জাতীয় ফলাও ব্যবহার করতো। তন্দ্রাচ্ছন্ন পাখির পেটে তীক্ষ্ণ ফলার মুখ ঢুকিয়ে দিতো। গাছের তলার পাখির মল বা মাটি পরীক্ষা করে বুঝতে পারতো গাছে চামচিকা বা শিকারযোগ্য পাখি আছে কিনা।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও বর্ধমানে পথেঘাটে বনাঞ্চলে পাখমারাদের পাখি শিকার করতে দেখা যেতো। আমি আমার কৈশোরে আমাদের বাড়ির রাস্তার ধারের গাছ থেকে উপরোক্ত পদ্ধতিতে পাখি ধরতে দেখেছি। বর্ধমান শহরে পাখমারারা থাকতো সিএমএস স্কুলের পিছনের দুটি গলিতে। তাদের নিবাস স্থলের নামই হয়েছিল পাখমারা বা পাকমারা গলি বা লেন। পাখমারা কথাটি এসেছে পাখিমারা থেকে।

এখন আর শিকারজীবী পাখমারাদের দেখা যায় না। তাদের দীর্ঘদিনের নিবাসস্থলের পরিবর্তন হয়েছে নগরায়ণের চাপে। তাদের নামাঙ্কিত গলি দুটিরও ঘটেছে নামান্তর। পৌরসভার খাতায় আজ ১নং পাকমারা লেন হয়েছে বর্ধমানরাজের জনৈক পত্তনি জমিদার দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের নামে—ডি.এন. মিত্র লেন এবং ২নং পাকমারা লেনের নাম হয়েছে অমূল্যচরণ মিত্রের নামে এ.সি. মিত্র লেন।

সভ্যতার চাপে নাগরিক জীবনযাপনে অনভ্যস্ত আরণ্য প্রকৃতির সন্তানেরা উদ্বাস্তু হয়ে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে বাস্তব কারণে। জীবন যাপনের স্বার্থে এদের বংশধররা ঘটিয়েছে পেশার পরিবর্তন। জনসংখ্যাবৃদ্ধি জনিত কারণে, বনজঙ্গল ধ্বংসের ফলে শিকার ও অরণ্যসম্পদ প্রাপ্তির অনিশ্চয়তায় পূর্বপুরুষের ভিটে ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হয়েছে এরা।

লোকসংস্কৃতি ও ইতিহাস রাজা-রাজড়ার ইতিহাস নয়, মানুষের ইতিহাস। এখন বর্ধমান শহরের পাকমারা লেন অতীতের স্মৃতিবাহী এক লুপ্ত জনজাতির প্রতিনিধি পাখিমারা শিকারজীবী জাতির কথা নৃতাত্ত্বিক গবেষক ও কৌতূহলী পাঠকদের মনে পড়িয়ে দেয়।

তথ্যসূত্র

১. *পুরনো বর্ধমানের কথা*, সুশীলকুমার সেন
২. 'পাখমারা', *রাঢ়বার্তা*, স্মারকগ্রন্থ, ২০০২
৩. *বর্দ্ধমান পরিক্রমা*, সুধীরচন্দ্র দাঁ
৪. *পাক্ষিক এভরিটাইমস*, ৩-৯-২০১০
৫. লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধান

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

জামনা গ্রাম পঞ্চায়েত

সকলের উন্নয়নের জন্য

কোনো সংকীর্ণতা নেই সকলে এগিয়ে আসুন।

রেখারানি ঘোষ
প্রধান

Sl. No. 11

শতবর্ষে তিতাস পালাকার, অদ্বৈত মল্লবর্মণ

কার্তিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

১

নিজবাসের পাশ দিয়ে চলা নদী তিতাস বেয়ে উঠতি যুবা কিশোর আর সুবল প্রবাস-নদী মেঘনায় মাছ ধরতে এসেছে। মেঘনা তো বিশাল, মাছে মাছে তার ওপছা সংসার। তিতাস মাঝারি নদী। পদ্মা, মেঘনার মতো তার কৌলীন্য নেই। তা বলে তার পাড় ঘেঁষে লেগে লেগে থাকা সব মালোপাড়ার ভাতজল, চলাবলা তারই উজাড় ভালোবাসার ফসলে ফসলে। তা কিশোরের বাবা ভেবে দেখল, 'দুইজন বালক, কোনদিন বড় নদী দিয়া বিদেশ যায় নাই। বুদ্ধি বিবেচনা খরচ করিতে হইবে।... একজন বয়স্ক লোকের দরকার। জলের উপর ছয় মাস চরিয়া বেড়াইতে হইবে। তিলকচাঁদ প্রবীণ জেলে। একটু বেশি বুড়া। তা হোক। সঙ্গে দুইজন জোয়ান মানুষ তো রহিলই।' পালা তিতাস ধরে পেছু ধরল কিশোর, সুবল আর তিলকচাঁদের। 'তিতাস যেখানে মেঘনাতে মিশিয়াছে, সেইখানে গিয়া দুপুর হইল। কিশোর দাঁড় তুলিয়া খানিক চাহিয়া দেখিল। অনুভব করিল মেঘনার বিশালত্বকে, আর তার অতলস্পর্শী কালো জলকে।' ভৈরব বন্দর থেকে নয়াকান্দা, সেখান থেকে শুকদেবপুর। বাঁশিরাম মোড়লের ঘাটে যখন নৌকা ভিড়ল, তখন কি ছাই বোঝা গেছে কাহিনি অতর্কিত চরম বাঁক নেবে। পাথরকোঁদা মোড়লের শরীরে 'রাগ নাই, অহংকার নাই, মানুষটার আছে কেবল শক্তি, উহার বুকের কাছটিতে একবার বসিতে পারিলে ঝড়-তুফানেও কিছু করিতে পারিবে না।' আতিথেয়তার মা-বাপ নাই। নদীও অকৃপণে মাছ দেয়। দোল উৎসবে শুকদেবপুরের লাগোয়া উজানিনগরের খলাতে যে পঞ্চদশীকে কিশোর দেখল, সেই মেয়েটি তার কাঁচা মনে চাঁদ বুনল। শুকদেবপুরের অর্ধেক পুরুষ মাছ ধরতে গিয়েছে। অর্ধেক খলায় এসেছে। এসেছে তাদের গাঁ উজাড় করে মেয়েরা। ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে আর মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে মিশে মাতল চরমে আবিরখেলায়। মোড়ল পাশের গাঁ বাসুদেবপুরে গেছে একটা শুকনো বিল নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে পুরনো বিবাদ মেটাতে। হঠাৎ বাসুদেবপুরের লোকেরা মোড়লকে বন্দি করে লাঠি হাতে রে রে করে ছুটে এল খলায়। লাঠি আর পাল্টা লাঠির নরকঘূর্ণি। কিশোরের পঞ্চদশীকে রক্ষা ও দুই গাঁয়ের মধ্যে চলা লড়াই মহাপ্রলয়ের পথে বাঁক নেবার মুখে মেয়েটির সঙ্গে কিশোরের নাম-কা-ওয়াস্তে বিয়ে দিয়ে নদীপথে তাদের বিদায় দিল মোড়ল ও মেয়েটির বাপ-মা। কিন্তু মেঘনার মোহনার এক পাশে একটি খাড়ির ভেতরে রাতের আশ্রয়ের জন্য অনেক নৌকার পাশে কিশোরদের নৌকা ভিড়ল। সেখানে তাদের ঘুমের সুযোগ নিয়ে ছইয়ের ভেতর আড়াল রাখা কিশোরের সদ্য বিয়ে করা মেয়েটিকে লুঠ করে নিয়ে যাওয়া হল। পরের দিন জলে ভাসা অন্য একটি মেয়ের লাশ দেখে কিশোর স্বল্প দেখা নিজের বউ খুন হয়েছে ভেবে পাগল হয়ে গেল। কাহিনিতে সে মেয়েটি উঠে এল অনন্তের মা হয়ে। কিশোরের ছেলে অনন্ত। ইতিমধ্যে ঘটে গেছে অনেক ঘটনা। তিলক মারা গেছে। সুবলও অপঘাতে মরেছে। কিশোর বদ্ধ পাগল। মালোপাড়ার যে বাসন্তীর সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল তার বিয়ে হয়েছিল সুবলের সঙ্গে। আমরা দেখছি অনন্তের মা ডাকাতদের অসতর্ক মুহূর্তে জলে ঝাঁপিয়ে তীরে এসে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। দুই বৃদ্ধের ভালোবাসায় পোয়াতি মেয়েটি সন্তান প্রসব করে। সেই সন্তান ও তার মা বৃদ্ধদের কাছেই পালিত হয়। বালক অনন্তকে নিয়ে তার মাকে তারাই কিশোরদের মালোপাড়ায় নিয়ে আসে। তারা চলে যায়। অনন্তর মা তার পরিচয় না দিয়েই সেখানে একজন স্বামী-নিখোঁজ স্ত্রী হিসেবে থাকে। ভয়, আপহৃতা হিসেবে সে গ্রহণযোগ্যা হবে না—এই আশঙ্কা তাকে সত্যপ্রকাশে বাধা দেয়।

২.

তিতাস আখ্যানে কিশোর সুবলের বউ, অনন্তের মা ও অনন্তকে ছেড়ে যায় না, কিন্তু তিতাসও তার দু-পাড়ের মালো সম্প্রদায় ও চাষির বিচিত্র সব জীবনচল কাহিনিকে কোথাও এলিয়ে পড়তে দেয় না। জলে কুমিরের কোনো প্রমাণ না থাকলেও জলকুমিরদের ও পুঁজিকুমিরদের গ্রাসে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী যে নানাভাবে বাঁধা পড়েছে, তার সুবিন্যস্ত পরিচয় এ আখ্যানে যথেষ্ট। অথচ কি জলে, কি মাটিতে, কি গৃহকাজে—খাটুনির এমন টানা গতানুগতিকে প্রাণদমের যে অফুরন্ত উৎসার এই উপন্যাসে আমরা পাই, তার তুল্যমূল্য লেখা প্রায় দুর্লভ। মূলত শ্রমজীবী অবস্থান থেকে উঠে আসার ফলেও এই অদম্য শ্রমশক্তিকে নিজের রক্তে উপলব্ধি করার সামর্থ্যে অদ্বৈত মল্লবর্মণ বলতে গেলে অদ্বিতীয়। কারণ শুধু শ্রমজীবী জীবনচল নয়, খেটে খাওয়া মানুষদের সুখ, দুঃখ, আনন্দ ও শোকানুভূতির এমন বিশ্বস্ত ও বহুরঙা প্রকাশ ও তাদের লোকায়ত সংস্কৃতির এমন প্রামাণিক বিস্তৃত উপস্থাপনা বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর ও সমরেশ

বসুর নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসেও পাওয়া যায় না। দোষ তাঁদের নয়, পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও বিজড়ন সামর্থ্য নিয়েও তাঁরা যে-সব নদীকেন্দ্রিক লেখা লিখেছেন সেখানে নিজেদের শ্রেণিভিন্নের সীমাবদ্ধতা তাদের উপলব্ধ অভিজ্ঞতায় কমবেশি প্রভাব ফেলতে বাধ্য। কিন্তু অদ্বৈত মল্লবর্মণ যাদের কথা লিখেছেন তিনি সেই শ্রেণি থেকেই উঠে এসেছেন এবং তাঁর সংবেদনশীল নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি সেই জীবনযাপনকে এক মহিমাময় মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। যেমন মালো মোড়োল 'রামপ্রসাদের বয়স হইয়াছে। রঙ ঈষৎ তাম্রবর্ণ। যৌবনে এর সোনার কান্তি ছিল। চামড়ার বার্ধক্য ঠেলিয়া নিজেকে জাহির করিয়াছে যে মোটা হাড়গুলি তারাই প্রমাণ দেয়, যৌবনে এর শরীরে অসুরের শক্তি ছিল। চোখদুটিতে দেবসুলভ আবেশ।... কোন এক সত্যবস্তুর সন্ধানে সুদূরে মেলিয়া রাখিয়াছে তাহার অনন্ত প্রশ্নের জবাব না পাওয়া বড় বড় দুটি চোখ।'

ফের আসা যাক অনন্ত, অনন্তর মা আর সুবলের বউয়ের জীবনচলে। চোখের সামনে পাগল স্বামীকে দেখছে অনন্তর মা। ছটফট করছে ভেতরে ভেতরে, মানুষটাকে জীবনঢালা সেবা আর ভালোবাসা দিয়ে আবার স্বাভাবিকে ফিরিয়ে আনতে চায় সে। সুবলের বউ তার নিজের ভেতর বুভুক্ষা মেটায় ছোটো অনন্তকে নিয়ে। সে অনন্তর মাকে বলে, 'পুরুষ মানুষ দিয়া কি হইব। তারা বৃষ্টির পানি-ফোঁটা, ঝরলেই শেষ। তারা জোয়ারের জল। তিলেকমাত্র সুখ দিয়া নদীর বুক শুইষ্যা নেয়। এই অনন্তই আমাদের আশা ভরসা। দুইজনে এরেই মানুষ কইরা তুলি চল। এ-ই একদিন আমরার দুঃখ ঘুচাইব।' সুবলের বউই অনন্তর মায়ের সংসার চালানোর জন্য রোজগার করার তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছে—জালের সুতো তৈরির কাজ। বিক্রিবাটা থাকলে কিছু কিছু রোজগার হয়, না থাকলে বিধবা বাসন্তীই অর্থাৎ সুবলের বউই তাকে এটা ওটা যোগায়। কিন্তু সেও তো অভাবি। গরিব মা-বাপের আশ্রয়ে রয়েছে সে। ঘটনা আবার বাঁক নেয়। ঘটনাক্রমে অনন্তের মা কিছুটা তার পাগল স্বামীর কাছে আসছে। এমনকি 'অনন্তর মা একদিন তার (কিশোরের) মাকে বলিয়া দুই নারীতে ধরাধরি করিয়া তাকে (পাগল কিশোরকে) ঘাটে লইয়া গেল। প্রকাশ্য দিবালোকে। সারা গাঁয়ের নারীপুরুষ চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। অনন্তর মা ভ্রূক্ষেপ করিল না। কেবল ভাবিল, সে তারই ছেলের বউ, বুড়ী যদি একথাটা একবার বুঝিত।' কিন্তু বিপর্যয় তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে এল।

হোলির দিন সে কিশোরকে হোলির রঙ মাখালো। প্রথমে খুশি হলেও শেষ দিকে কিশোরের পাগলামি চূড়ান্তে পৌঁছাল। সে বিদ্যুৎগতিতে তার স্ত্রীকে পাঁজাকোলা করে তুলে এমনই তাণ্ডব শুরু করল যে তার বুকের কাছে অনন্তের মা মূর্ছা গেল। ফলে ভিড় করে আসা লোকজনের হাতে সে এমনই মার খেল যে পরের দিন 'এই প্রথম সে স্বাভাবিকভাবে কথা বলিল, 'বাবা, আমারে একটু জল দে।' জল খাইয়া বলিল, 'বাবা, আমারে ঘরে নে। অমি উঠতে পারি না।' রাতটা সে কোনোরকমে বেঁচে ছিল, পরের দিন ভোর হবার আগেই সে মারা গেল। অনন্তর মা মরল চারদিন পর। জ্বর ও 'কি রকম একটা জ্বালায়' সে মারা গেল।

৩

উজাননগরের মাগন সরকারের কাছে দুশো টাকা ধার করে চাষি কাদের মিয়া। পরের বছর পাট বেচে সুদ সহ আসল টাকা সে মেয়ের বাড়ি যাবার সময় মাগনকে শোধ করে। টাকা নিয়ে মাগন তমসুকের কাগজ ছিঁড়ে ফেলবে বলে জানায়। কিন্তু তা না করে সেই কাগজ নিয়ে সে মিথ্যা মামলা করেছে কাদিরের নামে। কাদিরের বেয়াই আদালতের মুহুরি। সে বেয়াইকে পাল্টা মিথ্যা মামলা মাগনের নামে রুজু করার প্রস্তাব দেয়। কাদের কিন্তু কোর্টে যাবে না। সে মাগনের চোখে চোখ রেখে তার কাছ থেকে সত্যি কথাটা বার করবে। এদিকে মাগনের বন্ধু দোলগোবিন্দ সাহা মারা গেছে। কেমন বন্ধু ? 'একই চাকরীতে ঘুষ খাইয়া পয়সা করিয়াছি, একই উপায়ে লোককে ঋণের জালে জড়াইয়া ভিটেমাটি ছাড়া করিয়াছি। জমিজারাত দেনার দায়ে নিলাম করিয়াছি।' কাদির সারারাত ঘুমোয় নি। পরের দিন সকালে সে মাগনের কাছে হাজির হল। তার চোখদুটো জবা ফুলের মতো লাল। মাগনও ঘুমোয়নি দোলগোবিন্দর মৃত্যুশোকে। তার চোখদুটো সন্ধ্যার অস্তরাগের মতো লাল। অপ্রত্যাশিত মোচড়। মাগন কাদেরকে বলল, 'জীবনে সর্বনাশ তো অনেকেরই করিলাম। আর কারোর সর্বনাশ আমি করিব না, শেষবারের মতো শুধু তোমার এই সর্বনাশটুকু করিতে দাও। বাধা দিও না, প্রতিবাদ করিও না, শুধু সহ্য করিয়া যাও। এই আমার শেষ কাজ। দেখিবে তোমাকে ঠকানোর পর থেকে আমি ভাল মানুষ হইয়া যাইব।' পরের দিন সে অবশ্য আত্মহত্যা করে। অবশ্য কাদের স্বেচ্ছায় মামলায় হারবে ও জাল ধার ফের শোধ করবে বলে তাকে কথা দিয়েছিল।

ফের আসা যাক অনন্তের কথায়। অনন্তের বাবা মা—দুজনেই তো মৃত। দাদু ঠাকুমার কাছে নাতি হিসেবে অসনাক্ত। বাসন্তীই শুধু তাকে বুক দিয়ে আগলে রাখে। কিন্তু সে নিজেই নিঃস্ব বাবা-মার কাছে রয়েছে। এক ঝঞ্ঝাটের সময় বাসন্তী হঠাৎ মাথা গরম করায় সে বাসন্তীরও আশ্রয় ছাড়ে। তাকে নেয় উদয়তারা—সেখানকার আর এক মালোর নিঃসন্তান স্ত্রী। উদয়তারা তার দাদা বনমালীর সঙ্গে বাপের বাড়ি নবীনগরে অনন্তকে নিয়ে গেল। অনন্ত তার বাবা কিশোরের মতো কল্পনাপ্রবণ মনে সেখানকার মাঠঘাট নদীচরের সঙ্গে, মালো ও চাষি মানুষজনের মধ্যে নিজেকে ঠেলে দিল। অনন্তবালা বলে এক বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে তার বাল্য আত্মীয়তাও গড়ে উঠল। কিন্তু আবার ঘটনা বাঁক নিল। এক নৌকা প্রতিযোগিতার সময় সে লড়াই দেখতে আসা বাসন্তী ও উদয়তারার মধ্যে অনন্তের অধিকার নিয়ে পারস্পরিক লড়ালড়ি শুরু হল। বাসন্তী নবীনগরের উপস্থিত মেয়েদের হাতে চরম মার খেল। অনন্তকে নিয়ে বিজয়ী উদয়তারা চলে গেল বাপের বাড়ি।

৪

মালোদের জীবনে নেমে আসছে চরম দুর্বিপাক। তাদের ভেতরের সংহতিতে ফাটল ধরছে নগরচালানি যাত্রাপালার আগ্রাসনে। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রভাবে গড়ে ওঠা তাদের মূল্যবোধগুলি যাত্রাপালার তরল আকর্ষণে ক্ষমতা হারাচ্ছে। 'মালোদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল। গানে গল্পে প্রবাদে এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য মালমশলায় সে সংস্কৃতি ছিল অপূর্ব।... মালো ভিন্ন অপর

কাহারো পক্ষে সে সংস্কৃতির ভিতরে প্রবেশ করার বা তার থেকে রস গ্রহণ করার পথ সুগম ছিল না। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত তাদের গানগুলি ভাবে যেমন মধুর, সুরেও তেমনি অতলস্পর্শী।... যাত্রার দল যেন কঠোর কুঠারাঘাতে তার মূলটুকু কাটিয়া দিয়াছে।' প্রতিরোধ হল কিন্তু অনুপ্রবিষ্ট সংস্কৃতি সে প্রতিরোধ ভেঙে দিল। পায়ে পায়ে এল তিতাস নদীর মৃত্যুটান। যদিও লোকচোখের আড়ালে তিল তিল করে মৃত্যুরসদ জমছিল, তবু তার আত্মাপ্রকাশ ঘটল অনেকটা চমকাই। চরায় চরায় তিতাস তার বছরভর প্রবাহ হারাতে লাগল। 'বড় বড় নদীতে এক তীর ভাঙে অপর তীরে চর পড়ে। ইহাই ধর্ম। কিন্তু তিতাসের ধর্ম তা নয়। এ নদীর কোনো তীরই ভাঙে না। কাজেই তার বুকে যখন চর পড়িল, সে চর দিনে দিনে জাগিতে থাকে আয়তনে বাড়িয়া, চৌড়া বুক চিতাইয়া।... তিতাসের কেবল দুই তীরের কাছে দুইটি খালের মতো সরু জলরেখা প্রবাহিত রহিল, তিতাস যে এককালে একটা জলেভরা নদী ছিল তারই সাক্ষী হিসাবে।' ফল তীরবর্তী চাষি সম্প্রদায় বাড়তি জমি পেল যদিও সে জমি নিয়ে কুরুক্ষেত্র চলতেই থাকল। কিন্তু মালো সম্প্রদায় তাদের পুরুষানুক্রমিক স্বনিযুক্ত পেশা থেকে উৎখাত হল। অনেকেই অভাবজনিত অপুষ্টিতে হয় মারা পড়ল, নয় পঙ্গু হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগল। অনেকে দূরে মাল বওয়ার কঠিন কাজে শরীর ভেঙে ফেলল। তারাও কালক্রমে পঙ্গু হল। অনেকে অন্যের ভাড়া খাটা জেলে হিসেবে চরম দারিদ্র্যে বসবাস করতে লাগল। 'ধানকাটা শেষ হইয়া গিয়াছে। চরে আর একটিও ধানগাছ নাই। সেখানে এখন বর্ষার সাঁতার জল।... দক্ষিণের সেই সুদূর হইতে ঢেউ উঠিয়া সে ঢেউ এখন মালোপাড়ার মাটিতে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে। কিন্তু এখন সে মালোপাড়ার কেবল মাটিই আছে। সে মালোপাড়া আর নাই। শূন্য ভিটাগুলি গাছ গাছড়া হইয়াছে। তাতে বাতাস লাগিয়া সোঁ সোঁ শব্দ হয়। এখানে পড়িয়া যারা মরিয়াছে, সেই শব্দে তারাই বুঝিবা নিঃশ্বাস ফেলে।'

অনন্ত? অনন্ত হঠাৎই অক্ষর আঁক শেখার সুযোগ পেয়েছিল। নদী তখনও জ্যান্ত ছিল। পড়াশোনা তাকে টান দিয়ে ক্রমে ক্রমে শহরে নিয়ে গেছে। বি এ পরীক্ষা দেবার কালে তার সঙ্গে মাছের পোনা নিয়ে শহরে যাওয়া ছিন্নমাটি বনমালীর দেখা হয়। সে বনমালীকে বাসন্তী ও উদয়তারার জন্য দুটো শাড়ি দেয়। অনন্তবালা তার পথ চেয়ে বসে আছে। উপন্যাসে আর তাদের দু-জনের

'তিতাস একটি নদীর নাম' চলচ্চিত্রের দৃশ্য

সাক্ষাতের কোনো কথা নেই। মালো পাড়ায় পাড়ায় সে ত্রাণকাজে ব্যস্ত—এভাবে তাকে তুলেই কাহিনি শেষ হয়ে চলে। শেষের মুখে বাসন্তীর মৃত্যু। তার মৃত্যুকালীন চোখে তিতাসের সুদিনের রঙিন ছবিগুলো পরপর ফেনিয়ে উঠতে থাকে। কিশোর আর সুবলের সঙ্গে তার বাল্যকালীন স্মৃতিগুলি জ্যান্ত হয়ে ওঠে। এক বিচিত্র অনুভূতি জেগে ওঠে পরিশেষে। শোক, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, মুক্তি, বদ্ধতা, ঔদার্য, নীচতার মিশেলে তিতাস কথা এক মহাকাব্যিক স্বাদগন্ধময় হয়ে ওঠে।

৫

উপন্যাসটি দীর্ঘায়ু হবার কতকগুলি স্পষ্ট কারণ আছে। প্রথম কথা, উপন্যাসটি বহুমুখী একটি কাহিনিকে ধরে রাখলেও, এটি শুধুমাত্র কাহিনিসর্বস্ব নয়। মূলত তিতাস ও মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত বিভিন্ন মালো ও চাষি সম্প্রদায়ের পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার যে শ্রমনিবিড় অবদানলিপি অদ্বৈত মল্লবর্মণ রেখেছেন, তার অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী পরিচয় সংশ্লিষ্ট গবেষকদের অনেক খোরাক যোগাবে। অথচ কোথাও সে সব বিবরণ কাহিনির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে না বরং কাহিনিকেই তারা গতি ও বৈচিত্র্যের যোগান দেয়। দ্বিতীয় কথা, উপন্যাসটি জায়গায় জায়গায় যেমন তীক্ষ্ণ বাস্তব সচেতন, তেমনি জায়গায় জায়গায় ভাবুকতার অভিব্যক্তি। কিন্তু সে অভিব্যক্তি পরিমিত, কখনোই অতিকথনের প্রগল্‌ভতা কাহিনির টানকে মন্দা করে না। তৃতীয় কথা, শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের পরিশ্রমনিবিড়তা, সামাজিক আত্মীয়তাটান, পারিবারিক নিবিড়তা ও ব্যবহারিক ঔদার্যের বিস্তৃত পরিচয় থাকলেও জায়গায় জায়গায় তাদের সংকীর্ণতা, বিবাদ বিরোধ ও তাদের ভেতরেই কারো কারো কুটিলতার পরিচয়দানে লেখক কোনো আড়ষ্টতার দোষে দোষী নন। চতুর্থত, আমাদের ধারণা আছে যাত্রাপালা লোকায়ত সংস্কৃতি। অদ্বৈত মল্লবর্মণের এই উপন্যাসে আমরা দেখলাম, এ-সংস্কৃতি গ্রামের উচ্চবর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি জাত থেকে উদ্ভূত। তাদের আর্থিক অবস্থান ও শিক্ষাদীক্ষা নগর সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের যোগাযোগে যে সহায়তা করেছিল, সেই সহায়তার ফলশ্রুতিতে গ্রামে যাত্রাশিল্পের পত্তন হয়েছিল। উপন্যাসে মালো মেয়েদের ওপর তাদের চোখ পড়ার অনেক উদাহরণ আছে। সাহা বংশের একজনকে মালোপাড়ায় এ ব্যাপারে গুমখুনের কাহিনিও আছে। দেখা যাচ্ছে মালোদের সংস্কৃতির সঙ্গে যাত্রাশিল্পের আদানপ্রদানের কোনো সহায়ক আবহাওয়া তারা তৈরি করে নি। পরিবর্তে আগ্রাসী আধিপত্য যাত্রাশিল্পের ওপর ভর করে চড়াও হয়েছে মালোদের সংস্কৃতির ওপর। ফলে মালো সংস্কৃতি সে চড়াও-এ খুন হয়ে গেছে। মালোদের নিজস্ব জীবনযাত্রাকেও তা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছে। মূলত গ্রামীণ অর্থনীতি, জীবনচল ও সংস্কৃতি আজ যে ব্যাপক ব্যাপক বিধ্বস্ত হয়ে চলছে মূলত পণ্যভিত্তিক নাগরিক সংস্কৃতির নির্মম অনুপ্রবেশে তার সতর্ক ও সংবেদনঋদ্ধ সাইরেন এই উপন্যাসটিতে স্পষ্টে বেজে উঠেছে। এ উপন্যাসের আর একটি সম্পদ সংশ্লিষ্ট মালো ও চাষি সম্প্রদায়ের ভাষা-বৈচিত্র্য ও কথনরীতি। স্থানিক অনেক প্রবাদ প্রবচন, গানের বাঁধা পদ এ বইতে পর্যাপ্ত পাওয়া যায়। যেমন, 'অদৈন্য (প্রচুর) মাছ', 'এক পয়সার তেল হইলে তিন বাতি জ্বালায়', বা 'গীত জোকারের লগে পিড়ির উপর শাড়ীটা ঘোমটা তুইল্যা যখন চোখ মেইল্যা চায়—সে হয় সত্যের স্তিরি (স্ত্রী) আর সগল তো ভইন (বোন)' বা 'আজোকা উঠছেরে চন্দ্র শানের বান্ধান ঘাটে'। সত্যিকথা বলতে কি আজকের এই আগ্রাসী পুঁজিকেন্দ্রিক সভ্যতা-সংস্কৃতির দাপটে মানুষ তো ছার, গোটা জৈবজগতের অস্তিত্বই বিলুপ্তির মুখে দাঁড়িয়েছে। প্রতিরোধ আসছে কেবল মানুষ থেকেই নয়, খোদ প্রকৃতির কাছ থেকেও। সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বাঁচতে হলে বস্তুতান্ত্রিক জীবনচল না মেনে বিকল্প অন্য কোনো রাস্তা নেই। বহুত্ববাদী চলাচলের পরস্পর সাপেক্ষ পরিপূরকেই পৃথিবী আবার তার হারিয়ে চলা স্বাস্থ্য ও বিকাশ দম ফিরে পেতে পারে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' সেই বাস্তুতান্ত্রিক বহুত্ববাদী সংস্কৃতির এক বিশ্বস্ত অভিভাবক। এ বই একাধারে শ্রমের স্ফূর্তি, তার অদম্য চলাচল আবার তার বিনাশের ইতিবৃত্ত। বিজড়ন ও বিভাজনের যুগপৎ সাক্ষ্যদানে এই বই নিরাপস।

With best compliments of

M/S TIWARI CONSTRUCTION

Fabricators, Erectors, Mechanical Engineers, Civil Contractors

Specialist in :
Stainless Steel & Pipeline Job, Dealing with Earth Moving Machine,
JCB & Hydraulic Crane Etc.

ESBY Industrial Estate
Sanjib Sarani, Durgapur-713201, Dist. Burdwan, E-mail : vinodtiwarig@gmail.com
Phone : 0343-2554757 (R), G.T. : 9002390791
V.T. : 9333950979, R.T. : 9333907643 / 9932697055

WORKS SITE
(1) Graphite India Ltd., (2) Ganga Rasayanie (P) Ltd. (3) Jai Balaji Group, (4) Ultratech

Sl. No. 115

জন্ম শতবর্ষের আলোকে কবি দিনেশ দাস

পরিমল ঘোষ

বিশ শতকের চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের বাংলায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা চরম অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল। শুধু অস্থিরতা নয়, তার পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল নানা আন্দোলন, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ। আন্তর্জাতিক কিছু ঘটনাও তাতে প্রেরণা যুগিয়েছিল। সমকালীন বাংলা সাহিত্যে তার প্রতিফলন পড়েছিল অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই। এ সময়কালের কতিপয় কবি নতুন ধরনের ভাব-ভাবনা নিয়ে কবিতা রচনায় উৎসাহিত হলেন। এঁদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সমর সেন, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের সঙ্গে অবশ্যই আরও একটি উল্লেখযোগ্য নাম হল—কবি দিনেশ দাস। এ বছর কবি দিনেশ দাসের জন্মের শতবর্ষ চলছে। নানা দিকে কবিকে নিয়ে নানা অনুষ্ঠান ও আলোচনা চলছে। কবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে এখানে তাঁর জীবন ও কাব্যভাবনা নিয়ে কিছু আলোকপাত করা হল।

।। এক ।।

প্রথমে কবির জীবন-চিত্র ও মানস গঠনের কথায় আসা যাক্।

দিনেশ দাস কলকাতার আদিগঙ্গার তীরবর্তী আলিপুর অঞ্চলে এক সচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দিনটি ছিল ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ সাল। তাঁর মূল পিতৃভূমি ছিল হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত কাষ্টস্যাংড়া গ্রাম। তাঁর পিতার নাম ঋষিকেশ দাস। তিনি একজন সরকারি চাকুরিজীবী ছিলেন। মাতা কাত্যায়নী দেবী সাধারণ শিক্ষিতা গৃহবধূ ছিলেন। দিনেশ ছোটোবেলায় খেলাধূলায় বিশেষ আগ্রহী ছিলেন, তবে পড়াশুনায়ও বেশ মনোযোগী ছিলেন। তিনি কলকাতার চেতলা হাইস্কুলে পড়াশুনো শেষ করেন এবং তারপর আশুতোষ কলেজে পড়াশুনো করেন। মাঝে দু-এক বছর পড়াশুনোয় বিরতি ঘটে। পরে স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন।

দিনেশের জন্মকালেই এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজনৈতিক তৎপরতা নানাভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনে তরুণদের অংশগ্রহণ ও আত্মদান তরুণ দিনেশের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। তাঁর মনে স্বদেশচিন্তা গভীরভাবে প্রোথিত হতে থাকে। স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য তিনি মহাত্মা গান্ধীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন। এরই ফলে সতেরো বছর বয়সে ছাত্রাবস্থায় তিনি গান্ধীজির আহ্বানে লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনে (১৯৩০) যোগদান করেন।

এখানে বলে রাখা দরকার, কিশোর বয়সেই দিনেশের মধ্যে কাব্য-ভাবনার উন্মেষ ঘটে। তখন তিনি চেতলা হাইস্কুলের ছাত্র। নিজের কল্পনা ও আবেগ কবিতার ভাষা ও ছন্দে প্রকাশের প্রয়াস চলে। পাঠ্যগ্রন্থের কবিতাগুলো এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই তাকে কিছু সাহায্য করে থাকবে। কিন্তু তা স্ফুরণের জন্য আরও কিছু সময় লাগে। এভাবে ১৯৩৪ সালে তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দেশ' ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায়।

এ সময় কবি ভীষণভাবে স্বাধীনতা-আন্দোলন নিয়ে মেতে ওঠেন। তিনি গোপনে বিপ্লবী সমিতির সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছিলেন এবং রাজনৈতিক কাজকর্মে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। পড়াশুনোয় সাময়িক বিরতি ঘটে যায়। পিতা ও অন্যান্য অভিভাবকরা সমূহ বিপদ বুঝে তাঁকে কোনো চাকুরিতে যোগ দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। কিন্তু তিনি ব্রিটিশের অধীনে চাকুরি গ্রহণে অস্বীকৃত হন। সেজন্য ১৯৩৫ সালে কলকাতা ত্যাগ করে কার্শিয়াং-এ চাকুরির উদ্দেশ্যে যান। সেখানে এক চা-বাগানের ম্যানেজারের বাড়িতে গৃহশিক্ষকতার কাজ করতে থাকেন। অন্যবিধ চাকুরির সন্ধানও চলতে থাকে। এখানে তিনি এভাবে এক বছর অতিবাহিত করেন। সে-সময় এখানকার চা-বাগানের শ্রমিকদের প্রতি যে ধরনের অন্যায়-অত্যাচার করা হতো এবং তাদের যে অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা ছিল, তা তিনি স্বচক্ষে দেখেন। এতে তিনি খুবই মর্মাহত হয়ে পড়েন। তাঁর মনোজগতে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। এর ফলস্বরূপ তিনি কমিউনিজম তত্ত্বের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯৩৬ সালে সেখানকার চাকুরি ছেড়ে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন।

মনে রাখা দরকার, সে সময় ব্রিটিশ সরকার কমিউনিজম বিষয়ে খুবই আতঙ্কগ্রস্ত ছিল এবং এ-বিষয়ে তাদের কড়া নজরদারি ছিল। পশ্চিমবঙ্গে সে-সময় খিদিরপুর ডক্ অঞ্চলে শ্রমিক-কর্মীদের মাধ্যমে সাম্যবাদী নানা গ্রন্থ ও পত্রিকা বিদেশ থেকে এখানে গোপনে আমদানি করা হতো এবং যথাস্থানে সেগুলি পৌঁছে দেওয়া হতো। সে-সময় রণেন সেন ও অন্যান্য নেতাদের সহায়তায় দিনেশ মার্কসবাদী ভাবনার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেন। এতে তাঁর মনোজগতে পরিবর্তন ঘটল এবং কাব্যভাবনায় হাওয়া বদল হল। রোমান্টিসিজ্‌ম থেকে তিনি সরে এলেন বাস্তবের মাটিতে। তাঁর কাব্যধারা নতুন খাতে বইতে শুরু করল।

দিনেশ দাস নতুন উদ্যমে কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করলেন। ১৯৩৬ সাল থেকে এইসব কবিতা 'অগ্রগতি', 'পূর্বাশা', 'নিরুক্ত' প্রভৃতি নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকল। ১৯৩৭ সালে দিনেশ 'কাস্তে' কবিতাটি রচনা করলেন। হাতুড়ি বর্জিত হলেও সরকারের ভয়ে কোনো পত্রিকা-সম্পাদক তা ছাপতে রাজি হলেন না। কবি খুব

মানসিক আঘাত পেলেন। এই দুঃখে এক বছর ধরে তিনি কবিতা লেখা প্রায় ছেড়েই দিলেন। ১৯৩৮ সালে 'আনন্দবাজার' রবিবাসরীয় পাতার সহ-সম্পাদক কবি অরুণ মিত্রের আনুকূল্যে কবিতাটি আনন্দবাজার শারদ সংখ্যায় (১৯৩৮) প্রকাশিত হয়। কবিতাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে আলোড়ন পড়ে যায়। কবিতাটি হাজার হাজার পাঠকের মুখে উচ্চারিত হতে থাকে। কবিতাটির দু-এক পঙক্তি ছিল এমন—

বেয়নেট হ'ক যত ধারালো—
কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু!
... ...
চাঁদের শতক আজ নহে তো
এ-যুগের চাঁদ হল কাস্তে।

'এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে' এই শিরোনাম দিয়ে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও কবি বিষ্ণু দে 'কবিতা' পত্রিকায় দুটি কবিতা লিখলেন। অন্যান্য অনেক কবিও এই উদ্ধৃতি তাঁদের কবিতায় গ্রহণ করতে লাগলেন। বাংলা কাব্যক্ষেত্রে এটা বাঙালির নস্টালজিয়া হিসেবে গ্রহণ করা যায়। দিনেশের কবিখ্যাতি খুব তাড়াতাড়ি তুঙ্গে পৌঁছে গেল।

এ-সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯) শুরু হয়ে যায়। সারা বিশ্বের বাজারে মন্দা চলতে থাকে। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষও তার দ্বারা আক্রান্ত হয়। যুদ্ধের চাপেই অর্থ, খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীতে অনটন দেখা দেয়। এদিকে ১৯৪১ সালে কলকাতায় ব্রিটিশের শত্রুপক্ষের বোমা ফেলার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। চারিদিকে যুদ্ধভীতি মানুষকে শঙ্কিত করে তোলে। এরই মধ্য পূর্বাশা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হল দিনেশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিতা' (১৯৪২) নামে সংকলন। এ কাব্যের 'মৌমাছি', 'নীল চোখ', 'প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা', 'প্রথম চুম্বন' প্রভৃতি কবিতায় রোমান্টিকতার আমেজ রয়েছে। কিন্তু 'নখ', 'গাঁইতি', 'ফার্নেস' 'ক্লাইভ স্ট্রীট' প্রভৃতি কবিতায় সাধারণ মানষের জীবন-সংগ্রামের কথা তুলে ধরা হয়েছে। কাব্যটি পড়ে কবি বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকায় লিখলেন, ''এই ছোট বইটি পড়ে আমাদের মনের ভাব অনেকটা এক চামচ পরিজ খাবার পর অলিভর টুইস্টের মতো হয়েছে, সেই বিখ্যাত বালকের মতো আমরাও বলছি : আরো চাই।'' অচিন্ত্য সেনগুপ্ত লিখলেন, ''আজকাল কবিতা হল চকমকি বুঝি চমকে দেওয়ার কাণ্ড, দিনেশবাবুর সেই অপচেষ্টা নেই।''

১৯৪২ সালে ভারতবর্ষে গান্ধীজির নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন প্রসারিত হয়েছে। এরই পাশাপাশি সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর সংগ্রাম এবং ভারত মহাসাগরের বুকে নৌবিদ্রোহ স্বাধীনতা আন্দোলনে শক্তি জুগিয়েছে। এদিকে বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩) এদেশে এক পরম দুর্যোগ টেনে আনে। খাদ্যাভাবে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটে। কালোবাজারি, খাদ্যাভাব, সরকারি ঔদাসীন্য সমাজমানসকে বিভ্রান্ত করে তোলে। এই সময় প্রকাশিত হয় দিনেশ দাসের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ভুখ মিছিল' (১৯৪৪)। এ কাব্যের 'ভুখ মিছিল', 'পঞ্চাশের মন্বন্তর', 'ডাস্টবিন', 'গ্লানি' প্রভৃতি কবিতায় ক্ষুধাজর্জরিত মানুষের প্রতি কবির অশেষ দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। আবার 'নববর্ষে যুদ্ধবাজদের জন্য ভোজ', 'যুদ্ধ কেন', 'বাঘ ডাকে', 'ভৈরব' প্রভৃতি কবিতায় পুঁজিবাদ ও যুদ্ধবাজদের প্রতি তাঁর ক্ষোভ ও আক্রোশ দ্বিধাহীন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

সে-সময় কবি মিশন রো-তে অবস্থিত কলকাতা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। ১৯৪০ সাল থেকেই তিনি এই অফিসে যুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রতিবাদমূলক কবিতাগুলি অফিসের কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখেননি। আবার ইউনিয়নের কাজকর্ম নিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গেও তাঁর মতবিরোধ চরমে ওঠে। সাত বছরের চাকরি থেকে পদত্যাগ করে (১৯৪৭) তিনি মানসিক স্বস্তি পান। এরপর তিনি 'দৈনিক কৃষক' পত্রিকার বার্তা বিভাগে যোগদান করেন। এরই পাশাপাশি চলচ্চিত্রে গীতিকার ও সহকারী পরিচালক রূপেও জীবিকা অর্জন করতে থাকেন।

১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের জন্য বাংলা ভাগ, ১৯৪৮ সালে মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ড দিনেশকে বিশেষ মর্মাহত করে তোলে। তিনি মনে মনে শান্তি খুঁজছিলেন। এমন সময় ১৯৪৯ সালে তিনি হাওড়া জেলার এক নির্জন গ্রামে দেউলপুর হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক রূপে যোগদান করেন। গ্রামের গাছপালা, লতাগুল্ম, শান্ত-শ্যামল পরিবেশ কবির মনে কিছু প্রশান্তি এনে দেয়। তার ফলে কবিমানসের তথা কাব্যক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়। এই সময় তাঁর ভালোলাগা কিছু কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয় 'দিনেশ দাসের কবিতা' (১৯৫১)। এ কাব্যের 'ভারতবর্ষ', 'বৃষ্টি পড়ে', 'দেউলপুর', 'শেষ ক্ষমা', 'স্বর্ণভস্ম', 'পুনর্জন্ম' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর শান্তিপ্রিয় মনোভাব সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। এ কাব্যের মুখবন্ধে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন—''বর্তমানকে প্রতিবিম্বিত করার নামে এ যুগের অধিকাংশ কবিতা বাক্-চাতুর্যের অর্থহীন অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে। সেই নিষ্ফল আতিশয্যের অরণ্যে দিনেশ দাসের এক একটি কবিতা বিস্তীর্ণ গভীর হ্রদের মতো। জটিল আধুনিক মনর সমস্ত প্রশ্ন প্রেরণা ও প্রত্যাশা তার মধ্যে প্রতিফলিত, কিন্তু স্বচ্ছতা কোথাও ক্ষুণ্ণ নয়।''

১৯৫১ সালে পর দিনেশ দেউলপুর হাইস্কুল ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায় এবং চেতলা হাইস্কুলে বাংলা-শিক্ষক রূপে যোগদান করেন। এখানে সাহিত্য-সাধনায় তিনি প্রশস্ত পরিবেশ লাভ করলেন। ক-বছর পরই প্রকাশিত হয় তাঁর 'অহল্যা' (১৯৫৪) নাম কাব্যগ্রন্থটি। এ-কাব্যের মধ্যে মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষজনের প্রতি তাঁর আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। অন্যায় ও অবিবেচনার বিরুদ্ধে তাঁর বিরূপতা উচ্চকিত হয়েছে। এ কাব্যের 'অহল্যা', 'ভূগোল', 'হায়না', 'নীল জল', 'কালি-কলম', 'মে-দিন', 'শিক্ষক মিছিলে' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কবিতা। কাব্যটিতে কবির স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয়ে যায়। 'অহল্যা' কাব্যগ্রন্থ পড়ে কবি জীবনানন্দ দাস লিখেছিলেন—''অহল্যাকে আপনি আধুনিক যুগের বা সনাতন পৃথিবীর মানবের ব্যথিত শিলীভূত প্রাণের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে যে চেতনার পরিচয় দিয়েছেন তা অপূর্ব।'' ড. নীহাররঞ্জন রায় লিখেছিলেন, ''অবাক মানি আমি দিনেশবাবুর চেতনার বিস্তারে বুদ্ধির জাগ্রত প্রাগ্রসরতায়। কী সহজ সাবলীল আন্তরিকতায় তিনি অদেখা, অচেনা জন ও পরিবেশের সঙ্গে ঘটনা ও ভাবনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় আবদ্ধ হন, কত সহজে তিনি আশা ও বিশ্বাসের পথ বেয়ে জীবনের দিগন্ত প্রসারিত করেন। সমসাময়িক ঘটনাও তাঁর এই চেতনার স্পর্শে নতুনতর অর্থদীপ্তি লাভ করেছে।... দিনেশবাবু সার্থক কবি, সার্থক তাঁর সাক্ষর।'' কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এক চিঠিতে কবিকে জানিয়েছিলেন, ''আমি চিরদিনই আপনার ভক্ত। 'অহল্যা' সেই ভক্তি আরও বাড়িয়ে দিল।''

এদিকে এ রাজ্যে বেকার সমস্যা বেড়ে চলে। ১৯৫৯ সালে খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন সংঘটিত হয়। স্কুল-কলেজে দাবি-দাওয়া নিয়ে ছাত্রদের আন্দোলন চলতে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা অস্থিরতা দেখা দেয়। রাজ্যে সরকারের পরিবর্তন হয়, আবার ভাঙার খেলাও চলে। সাধারণ মানুষের উপর অন্যায়-অবিচারও চলতে থাকে। এই প্রেক্ষিতে কবির 'কাচের মানুষ' (১৯৬৪) ও 'অসংগতি' (১৯৭২) কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ-দুটি কাব্যে কবি-মনের অস্থিরতা প্রকাশিত হয়েছে এবং একটি বেদনাও মনের মধ্যে ফল্গুধারার মতো বয়ে গেছে। কবির চিন্তা-চেতনায় নানা সংঘাতের ঢেউ এসে লেগেছে, আবার তা অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াসও দেখা গেছে। 'কাচের মানুষ' কাব্যের 'ধোঁয়া-পাহাড়ের গ্রাম', 'একটি গাছ', 'ছায়া', 'ছেঁড়া পাল' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কবিতা। 'অসংগতি' কাব্যগ্রন্থের

'একাকী একটি পাখি', 'গান, শ্লোগান, মেসিনগান', 'কবি', 'আত্মার অগুনতি মুখ', 'নিশির ডাক' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কবিতা। এরপর ভারবি প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয় 'দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৭২)।

কবি-জীবনের একটা ঘটনার দিকে এবার দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন কাকাবাবু অর্থাৎ মুজফ্‌ফর আহমদ। কবি ১৯৭৭ সালে মুজফ্‌ফর আহমদের লেক প্লেসের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং কথাবার্তা বলেন। মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, ''বাবা, লড়াই ছাড়া কিছু হয় না। কোনো কিছু করতে হলে সংগঠন ছাড়া হয় না। সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমেই কাজে সাফল্য আসে। দেশ, জাতি, সমাজ সবক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য।'' কথাগুলো কবির খুবই ভালো লেগেছিল এবং তাতে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল।

তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'রাম গেছে বনবাসে' (১৯৮১) প্রকাশিত হয়। এ কাব্যে নিম্নবর্গের মানুষের দুঃখ-বেদনা-হতাশা কবির চোখে ধরা পড়েছে। যে-কোনো অন্যায়-অবিচারের ক্ষেত্রে চুপ করে বসে থাকলে হবে না। যেখানে বাধা আসে, বাধা দূর করার জন্য চেষ্টাও করতে হবে। প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও আন্দোলনের মাধ্যমে সাফল্য লাভ ঘটবেই। এই ভাবনাই এ কাব্যে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। এ কাব্যে উল্লেখযোগ্য কবিতা হল—'ফুটপাতের মানুষেরা', 'হঠাৎ একদিন', 'ফুলদানির ফুলগুলো', 'ভুতুড়ে দেশ', 'তবু ফুল ফুটবে', 'মোরগ ডাকে', 'গঙ্গা' প্রভৃতি। এ কাব্য সম্বন্ধে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, ''স্বচ্ছন্দে তাঁর কবিতার কাকচক্ষু জলে অবগাহন করা যায়। চারপাশে ঘটছে ঘর আর বাইরের টানা-পোড়েন, ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব, জীবন আর মৃত্যু—কবিতায় সবই আছে। সেই সঙ্গে আছে বেদনাবিধুর সেই মন যার হাতে ধুলোমুঠো ধরলে সোনা হয়। দিনেশ দাস তাঁর কবিতায় যেমন স্নিগ্ধ, নম্র, অনাড়ম্বর, তেমনি আন্তরিক, অকপট।'' (আনন্দবাজার, ১৩.৫.১৯৮৩) এ কাব্য সম্পর্কে ড. জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''কবি নিজের বুকের ব্যথাকে ভাষা দিয়েছেন মহাকাব্যের রূপকের প্রতীকে।'' সমালোচক নারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন, ''দিনেশ দাসের কবিতায় কাল্পনিকতার ঐশ্বর্য আছে।''

কবি কাব্যরচনার জন্য নানা সময়ে নানা রকম পুরস্কার ও সম্মান লাভ করেছেন। ১৯৫৯ সালে 'দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা'র জন্য তিনি উল্টোরথ পুরস্কার পান। ১৯৬১ ও ১৯৭৪ সালে দিল্লিতে জাতীয় কবি সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি কবি রূপে তিনি দু-বার যোগদান করেন। ১৯৮০ সালে নজরুল আকাদেমি কর্তৃক তাঁকে নজরুল পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৯৮২ সালে 'রাম গেছে বনবাসে' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পান।

১৯৬১ সালের শেষ দিকে তিনি আর্থ্রাইটিস্ রোগে আক্রান্ত হয়ে অনেকখানি পঙ্গু হয়ে পড়েন। তিনবার তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়। তাঁর হাই ব্লাড প্রেসারও ছিল। ১৯৮৫ সালের ১৩ মার্চ তিনি প্রয়াত হন ৭২ বছর বয়সকালে।

কবি দিনেশ দাসের সমকালীন সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং কবিমনের স্বরূপটি আমরা অনুধাবন করলাম। এবার কবির কাব্যবৈশিষ্ট্যের প্রধান ক-টি রূপের দিকে দৃষ্টিপাত করব।

।। দুই ।।

কবির প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হল প্রকৃতিপ্রেম ও রোমান্টিকতা। কবিরা সাধারণভাবে প্রকৃতিপ্রেমিক হন। কবি দিনেশ দাসের নানা কবিতায় প্রকৃতির বিচিত্র রূপ ধরা পড়েছে। কবি দেউলপুরে অবস্থানকালে প্রাকৃতিক পরিবেশে আবিষ্ট হয়ে পড়েন। এখানে বৃষ্টি-পতনের রূপ তাঁর চোখে ধরা পড়ে—

জোরে বৃষ্টি এল
ছোট ছোট জুঁই-পাতা দোলে এলোমেলো
নারিকেল পাতাগুলি নড়া শুরু করে :
পাতা বেয়ে ডাল বেয়ে ঝরে
শুভ্র স্ফটিক জল / অবিরল।'

—বৃষ্টি পড়ে

কবিতায় চিত্রময়তাও আছে। আর একটি কবিতায় বসন্ত দিনের বর্ণনায় কবি বলেছেন—

পৃথিবীর টবে ফুল ফোটে :
রূপোলি শিকড়ে ওঠে
সবুজ আহ্বান।
হে বসন্ত তোমার আলোর কণ্ঠে জীবনের গান।

—বসন্তের সবুজ প্রহরে

এখানেও একটি চিত্রময়তা ফুটে উঠেছে।

এরই পাশাপাশি কবিমনে রোমান্টিক ভাবনা দোলা দিয়ে গেছে। তাঁকে উদ্দীপিত ও উচ্ছল করে তুলেছে। প্রিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা—

চোখ নয় ওতো—দুরন্ত দুটি নীলা
কামনার নীলে জ্ব'লে ওঠে ঝিকিমিকি,
সে-চোখে আগুন তব অন্তঃশীলা
সৃষ্টির নীল অঙ্কুর দেখনি কি?

—নীল চোখ

প্রিয় নারীর প্রথম চুম্বন স্পর্শে পুরুষের মনোজগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এমন অবস্থায় কবি রোমান্টিক আবেশে বলে উঠেছেন—

আমি একবার কেঁপে উঠলাম—
আমার চোখের পাতা দুটি মুড়ে এল
যেমন করে বুঁজে আসে
স্বাতী নক্ষত্রের জল পেয়ে সমুদ্রের শুক্তি।

—প্রথম চুম্বন

কবির প্রকৃতিপ্রেম ও রোমান্টিক ভাবনামূলক বেশ কিছু কবিতা রয়েছে, যেমন—'মৌমাছি, 'প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা', 'স্বপ্নের ঝাঁক', 'ছায়া', 'ফুলদানির ফুলগুলি' প্রভৃতি। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, কবির রোমান্টিক ভাবনা কখনও কখনও প্রতীকী দ্যোতনায় ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে, যেমন—

মনে হয় প্রেমের বীক্ষণী চোখ
অনায়াসে পার হয় জীবনের, শিল্পের সীমানা—
... ...
তাই বলি খুলে ফেল অলঙ্কার স্বর্ণের বন্ধন
তোমার আদুল দেহ আলোভরা মাঠের মতন।

—এতই সুন্দরী তুমি

তবে বলা প্রয়োজন পরবর্তীকালে কবি রোমান্টিক আবহ ত্যাগ করে বাস্তব জীবনমুখী হয়ে উঠেছেন। কবিতাও সেখানে অন্যতর ভাব-চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে।

।। তিন ।।

কবির কাব্যবৈশিষ্ট্যের অপর একটা দিক হল দেশ, জাতি ও ঐতিহ্যের ভাবনা বিষয়ক কবিতা। কবি দেশমাতৃকার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও ভারত অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার গৌরব-গাথা নানা দিকে প্রচারিত। কবিও তার জন্য গর্ববোধ করেন—

মিশে গেছি শিকড়ের তন্ময়তা নিয়ে
তোমার মাটির নাড়ি হাওয়া আর জলে
গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্ত শরৎ—
হে ভারত, হীরক ভারত।

—ভারতবর্ষ

'সিন্ধুবাদ' কবিতাতেও দেশমাতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ধ্বনিত হয়েছে।

বুদ্ধদেব ছিলেন অহিংসা ও শক্তির প্রতীক। তাঁর জীবনকথা ও বাণী পৃথিবীর দিক্-দিগন্তে ছড়িয়ে গেছে। শান্তির পক্ষে, প্রশান্তির পক্ষে তিনি আদর্শ পুরুষ। কবি তাই তাঁর প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবনত—

উজ্জ্বল শাণিত চোখ মেলে
অবাক জ্যোতিষ্ক তুমি এলে
অমর্ত্য জ্যোতিতে হল পৃথিবী নশ্বর
সূর্যালোক ম্লান—
বুদ্ধের শরণ লইলাম।

—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

মহাকবি কালিদাসের প্রতি কবি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলেছেন, ''আমরা বসতি করি সে বিশাল গাছের তলায়,'' চিরকাল তিনি আমাদের সৃষ্টিকাজে বৃষ্টি দান করে চলেছেন।

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজির ভূমিকায় কবি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন. 'ভারত ছাড়ো : ১৯৪২', 'শেষ ক্ষমা', 'স্বর্ণভস্ম' প্রভৃতি কবিতায় তারই অনুরণন ধ্বনিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বাংলা ভাগের যন্ত্রণায় কবি বিমর্ষ হয়ে পড়েন। এই মানসিকতা থেকে তিনি লেখেন—

সীমানার দাগে দাগে জমাট রক্তের দাগ—
কালনেমি করে লঙ্কাভাগ।
তবু এল স্বাধীনতা দিন
উজ্জ্বল রঙিন...,

—পনেরই আগস্ট, ১৯৪৭

ভারতবর্ষের কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা ও বিশ্বমৈত্রীর ভাবনা বিশ্বকে মুক্তি ও শান্তির পথ দেখিয়েছে। বিশ্ববাসীর কাছে তাই রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে কবি বলেছেন—

আকাশে বরুণে দূর স্ফটিক ফেনায়
জড়ানো তোমার প্রিয় নাম,
তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা
কোন্‌খানে রাখবো প্রণাম!

—প্রণমি

এই উচ্চারণ যেমন ব্যঞ্জনাময়, তেমনি অর্থদ্যোতকও বটে।

জাতীয়তাবোধ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি—এমন ধরনের অনেক কবিতা কবি রচনা করেছেন।

।। চার ।।

কবি দিনেশ দাসের কবিতার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা। সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আবর্তে সাধারণ মানুষের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল। অভাব-অনটন, দুঃখ-দুর্দশা ও অন্যায়-অত্যাচারে মানুষের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। এ অবস্থার বাস্তবসম্মত রূপ তাঁর কবিতায় বিবৃত হয়েছে—

মানুষ এবং কুত্তাতে
আজ সকালে অন্ন চাটি একসাথে,
আজকে মহা দুর্দিনে
আমরা বৃথা খাদ্য খুঁজি ডাস্টবিনে।

—ডাস্টবিন

অন্য একটি কবিতায় (গ্লানি) মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় ধনিক শ্রেণির মানুষের উদাসীনতা দেখে কবির মনে হয়েছে—'এর চেয়ে নেই লজ্জা, নেই বড় গ্লানি'। শ্রমজীবী মানুষ শোষণে জর্জরিত হয়ে চলেছে। তাদের মধ্যে ক্রমে ক্ষোভ জমতে থাকে—

আমরা আছি তাইতো চাকা চলছে
স্বৈরাচারের তাইতো চুলি জ্বলছে,
আমরা যেন সলতে
আমরা শুধু জ্বলতে জানি, জানি কেবল গলতে।

—গোলামখানা

শ্রমজীবী মানুষের মনে লেনিন চিরকাল সংগ্রামী প্রেরণা জুগিয়ে চলেছেন। শ্রমিক-চাষি এখনো তাঁর নামে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে—

লেনিন তোমার আগুন-স্বপ্ন সাপ হয়ে ফণা তোলে,
ছোবলাবে মাটি কখন অকস্মাৎ
পরগাছাগুলো বিষে বিষে হবে নীল
শেষ হবে এই দুঃস্বপ্নের রাত।

—লেনিন শতবর্ষে কোনো চাষি

কবি মার্কসীয় তত্ত্বে বিশ্বাসী। তিনি বিশ্বাস করেন এ পথেই সংগ্রাম করে মানুষের মুক্তি আসতে পারে। কিন্তু মানুষকেও সঠিক পথ চিনে চলতে হবে। মতবাদে বিশ্বাস না থাকলে সংগ্রামের পথে জোর পাওয়া যায় না। কবির তাই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা—

দক্ষিণ পথে মেলে যদি দক্ষিণা—
ভেবে দেখ তুমি সেই পথ ঠিক কিনা :
আমাদের পথ নয় জেনো দক্ষিণে—
বামপথ নিও চিনে।

—বামপন্থী

কবি সাধারণ ও শ্রমজীবী মানুষদের সাবধান করে দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে বলেছেন। সংগ্রামের পথে তারা যেন দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে যায়—

আজ দুনিয়ার চক্রীর চক্রান্তে
নিজের হাতে বজ্র হবে হানতে,
তাইতো ভাবি কি লাভ বুনে কথার মিছে উর্ণ
হাতুড়ি পিটে কঠিন কর না হয় কর চূর্ণ।

—হাতুড়ি

কবি নিজের সম্বন্ধেও কিছু সত্য কথা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছেন। তিনি জীবন ও অভিজ্ঞতা দিয়ে তা সঠিক বলে মনে করেছেন, তাই অকপটে ব্যক্ত করেছেন—

যখন ঠোঁট খুলি
অথবা কবিতা লিখি
তখন চূর্ণ করি বিপক্ষের শিবির—শত্রুর সীমানা।
কবিতার ভিতরেই আমার শ্রেণির পরিচয়।
আমার কবিতা একযোগে
গান, শ্লোগান, মেসিনগান।

—গান, শ্লোগান, মেসিনগান

কবি বিশ্বাস করেন পুঁজিবাদী, সুবিধাবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংগ্রাম একদিন সফল হবে এবং অন্ধকারের দিন শেষ হবে। কবির কথায়—

জানি একদিন সকালের ঝলমলে আলোয়
পুরনো সময়ের মৃত্যু হবে,
দেখা যাবে হঠাৎ আকাশ নীল, হঠাৎ :
দেখা যাবে মাছের চোখের মতো চক্‌চকে সাদা ভোর।

—হঠাৎ একদিন

কবি বিভিন্ন কবিতায় সকাল বা ভোরকে নানাভাবে বিশেষিত করেছেন, যেমন—'হীরের সকাল', 'লাল ফুলের সকাল', 'গোলাপী সকাল', 'টসটসে নিটোল সকাল', 'সবুজ ভোর', 'টকটকে রাঙা ভোর' প্রভৃতি। এর মধ্য দিয়ে অন্ধকার পেরিয়ে এক উজ্জ্বল দিনের কথাই তিনি নানা কবিতায় উচ্চারণ করেছেন।

কবি দিনেশ দাস স্বপ্ন ও কল্পনার কবি। তিনি বাস্তববাদী ও প্রতিবাদী কবি। তাঁর কবিতায় সংগ্রামী ভাবনা ও প্রত্যাশা জেগে থাকে। বিপন্ন সময়ে তাঁর কবিতা আমাদের প্রেরণা দেয়, জাগিয়ে রাখে। শতবর্ষ পরেও কবির এ ভূমিকা আমাদের মধ্যে প্রেরণা ও জাগরণের কাজ করে যাবে—এ বিশ্বাস রয়েছে।

কবিশেখর কালিদাস রায় : ১২৫-এও অনির্বাণ

সর্বজিৎ যশ

কথামুখ

১৩২৪ বঙ্গাব্দে অনুজ এক কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, ''তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার ভিতরকার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে যায়।'' ৮৬ বছরের জীবনে সেই কবি রচনা করেছিলেন বহু গ্রন্থ, তিনি বাংলার কবিশেখর কালিদাস রায়। বৈষ্ণব কবি লোচনদাস ঠাকুরের বংশধর ছিলেন তিনি। লোচনদাস-এর দাদার নাম ছিল পান্থদাস, পান্থদাসের পৌত্র আনন্দরাম কোগ্রাম থেকে করুই গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। আনন্দরামের পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্রের পৌত্র কবি কালিদাস রায়।

জন্ম ও শিক্ষা

বর্ধমান জেলার করুই গ্রামে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন (বাংলা ৭ আষাঢ়, ১২৯৬) কালিদাস রায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম যোগেন্দ্রনারায়ণ ও মাতা রাজবালা দেবী। কবির ভ্রাতার নাম রাধেশ রায়। শৈশবে করুই গ্রামে বুড়ো বটতলায় পণ্ডিতমশায়ের কাছে চতুর্থমান উত্তীর্ণ হন, স্থানটি এখনও বর্তমান। তাঁর পিতা যোগেন্দ্রনারায়ণ কাশিমবাজার রাজ এস্টেটের কর্মী ছিলেন। তাই এরপর কালিদাস তাঁর পিতার কাছে চলে যান এবং মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে পড়াশুনা করেন খাগড়া এল.এম.এস. হাইস্কুলে। বি.এ. পাশ করেন বহরমপুর কে.এন. কলেজ থেকে। পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রে এম.এ. পড়েন।

কর্মজীবন

প্রথম জীবনে রংপুর জেলার উলিপুর মহারানি স্বর্ণময়ী হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর কলকাতার বরিষা হাইস্কুলে (১৯২০) শিক্ষকতা করেন। সেখান থেকে ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে তিনি ভবানীপুর স্কুলে শিক্ষকতা করেন। অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন কলকাতা আশুতোষ কলেজে (১৯৪৮), আচার্য গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতি ভবনে (১৯৫০)। শিক্ষকতা জীবনে ছাত্রদের সঙ্গে যে একটা মধুর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে 'ছাত্রধারা' কবিতায়—

বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠতলে
চলে যায় তারা কলরবে।
কৈশোরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হয়
যৌবনের শ্যামল গৌরবে।

এমনিভাবেই ছাত্রধারা বয়ে চলে। কবির মনের গহনে কত স্মৃতি সোনার অক্ষরে দাগ কেটে যায়। বেদনাও অনুভূত হয়, তাদের শাসন করেছেন বলে, তাঁর কবিতায় তা ফুটে উঠেছে—

শাসন তর্জন করি
শিখাই প্রহর ধরি।

কবিত্বের বিকাশ

বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সময় কালিদাস একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করে শিক্ষক ও সহপাঠীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি পত্র-পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'হিতবাদী'-তে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কুন্দ' প্রকাশিত হয় ১৮ বছর বয়সে। কালিদাস রায় বেশ কিছু গদ্য রচনা, সমালোচনা সাহিত্য ইত্যাদি রচনা করলেও পদ্যেই তিনি ছিলেন অধিক সচ্ছন্দ। তাঁর মোট কাব্যগ্রন্থ ৩০টি। তিনি বেতালভট্ট ছদ্মনামেও লিখতেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির নাম হল—কুন্দ, কিশলয়, বল্লরী, পর্ণপুট, ব্রজবেণু, ক্ষুদকুঁড়া, রসকদম্ব, লাজাঞ্জলি, চিত্তচিতা, আহরণী, হৈমন্তী, বৈকালী, আহরণ, সন্ধ্যামণি, গাথাঞ্জলি, গাথাকাহিনি, গাথাবলী, ছোটোদের কবিতা, মনীষী বন্দনা, দিন ফুরানোর গান, ঋতুমঙ্গল, পূর্ণাহুতি, লঙ্কেশ্বর, গীতালহরী, মহাভারত ইত্যাদি। অন্যান্য গ্রন্থ—চিত্রে গীতগোবিন্দ, সাহিত্য প্রসঙ্গ (১ম ও ২য় খণ্ড), বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ ইত্যাদি। আত্মজীবনী গ্রন্থ—আত্মচরিত। রূপ সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামীকে নিয়ে লেখা

একটি কবিতার অংশ উল্লেখযোগ্য—

তরু হতে যেবা হয় সহিষ্ণু
তৃণ হতে দীনতর
সেই বৈষ্ণব জয় গৌরব
ভাবে না সে কভু বড়।

বস্তুত রবীন্দ্র ও কল্লোল সাহিত্য যুগ বৃত্তে অবস্থান করেও কলিদাস রায় তার প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বকীয় বৈষ্ণবীয় ও সরল গ্রাম্যধারায় আজীবন সাহিত্য সাধনায় রত ছিলেন।

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন ও কালিদাস রায়

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান শহরের গোলাপবাগ-এ অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন। এই সম্মিলনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাব। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে থেকে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব বিষয়ের বহু দিকপাল ব্যক্তিবর্গ এই সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মিলনের মূল সভাপতি ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন বিজয়চাঁদ মহাতাব। 'অভ্যর্থনা সঙ্গীত সমিতি' সমবেত কণ্ঠে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুরে যে অভিনন্দনগীতি তুলে ধরেন, তা কালিদাস রায় রচিত, সেটি ছিল এরূপ—

এস সুধিগণ, মানস-মোহন, এস বাঙ্গালার পুণ্যক্ষেত্রে,
চাহ ভারতীয় মিলন-ভবনে প্রেম ছল ছল উজল নেত্রে।
হেথা কাশীরাম অমৃত-সমান প্রচারিল মহাভারত-মন্ত্র,
বাঙালী জাতির একাধারে বেদ-সংহিতা-স্মৃতি পুরাণ-তন্ত্র।
হেথা মহামতি কবি দাশরথি নবীন গীতার সরল ছন্দে
শাক্ত-বিষ্ণু-উপাসক দলে বাঁধিল মধুর মিলন-বন্ধে।
... ...
এস সুধিগণ, মানস-মোহন এস বাঙ্গালার পুণ্য-ক্ষেত্রে,
চাহ ভারতীয় মিলন ভবনে প্রেম ছল ছল উজল-নেত্রে।

সেদিন যে 'উদ্বোধন সঙ্গীত'-টি গীত হয়, সেটিও কলিদাস রায় রচিত, সেটি এইরূপ—

আজি স্বাগত ভ্রাতঃ
মঙ্গলময়ী বঙ্গবাণীর বরণে।
বাজে দেউল-অঙ্কে শঙ্খ ডঙ্কা
দুন্দুভি বাজে তোরণে।

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে কালিদাস রায়-এর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

সংগীত রচনা

কালিদাস রায় সারা জীবন ধরে প্রচুর সংগীত রচনা করে গেছেন—এককালে সেসব গানের যথেষ্ট কদর ছিল। তাঁর রচিত 'বৃন্দাবন অন্ধকার' গানটি বিভিন্ন রকম সুরে গাওয়া হত। এই গান প্রথম রেকর্ড করেন গিরিন চক্রবর্তী। তিনি বহু হাসির গান লিখে গেছেন, অনেক হাসির গান রেকর্ডও হয়েছে। নলিনীকান্ত সরকারের কণ্ঠে সেই গান রেকর্ড করেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। এ ধরনের একটি গান হল—

শ্রীমান্ মনোমোহনবাবু থাকেন সদাই অন্যমনে
খেতে চলেন গোয়ালঘরে, শুতে চলেন ধুতরো বনে।
মশারীটায় চাদর বলে কাঁধে ফেলে, গেলেন চলে,
একদা এক চাঁড়াল মেয়ের পাত্র অন্বেষণে।

এছাড়াও বহু গান তিনি লিখেছেন, যেগুলি ভারতবর্ষ, বঙ্গবাণী ও বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সংগীতশিল্পী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় তাঁর বহু গানে সুর দিয়েছেন। তাঁর গানগুলিতে সুর দিয়েছেন সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কিরণশশী দে, সুশীল মল্লিক ও অরুণ সেন। কবির অন্তিম শয্যায় গীতিকার সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় কবির রচিত গান পরিবেশন করে শবযাত্রীদের মর্ম স্পর্শ করেছিলেন। কালিদাস রায়ের জন্মশতবার্ষিকীতে 'গাথাঞ্জলি' নামে একটি ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ গায়কবৃন্দ সেই ক্যাসেটে কণ্ঠ দিয়েছেন। কে নেই সেই ক্যাসেটে—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, জগন্ময় মিত্র, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, বনশ্রী সেনগুপ্ত প্রমুখরা এই ক্যাসেটের দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমান প্রজন্মের ক-জন এই রেকর্ডের খোঁজ রাখেন?

রসচক্র সাহিত্য সংসদ

কবি কলিদাস রায় কলকাতার টালিগঞ্জে একটি বাড়ি নির্মাণ করান। বাড়িটির নাম দেন 'সন্ধ্যার কুলায়'। এই বাড়িতেই ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি গড়ে তোলেন 'রসচক্র সাহিত্য সংসদ'। এই সাহিত্য সংসদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সদস্যদের গ্রন্থ প্রকাশ করা। এই সাহিত্য সংসদে আসতেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ্য। কালিদাস রায়-এর কর্মস্থল মিত্র ইনস্টিটিউশনে তাঁর সহশিক্ষক ছিলেন কেশবচন্দ্র নাগ, যিনি কে.সি. নাগ নামে সমধিক পরিচিত। কে.সি.নাগ নিয়মিত 'রসচক্র'-তে আসতেন। একদিন সাহিত্য আড্ডার সময় শরৎচন্দ্র কেশব নাগকে বলেন গণিতের বই লেখার কথা। প্রথমে কেশব নাগ ব্যাপারটা পাত্তাই দেননি। তারপর একদিন তাঁকে খুব চেপে ধরেন কালিদাস রায়। ক্লাস ফাইভ-সিক্সের জন্য বই লেখার কথা বলেন। চিত্তরঞ্জন ঘোষাল তাঁর 'অনন্য কেশবচন্দ্র' প্রবন্ধে লিখেছেন, কালিদাসবাবু বলেন—'ক্লাসে যেভাবে অঙ্ক শেখাও, আর ছেলেরা যেভাবে চুপ করে ওই শুকনো খড়কুটো গোগ্রাসে গেলে, দেখে তো মনে হয় ভাই যে তুমি গল্প লেখা শেখাচ্ছো। তাহলে নিজে লিখতে পারবে না কেন?' শুরু হল পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ। তখন তিরিশির দশকের মাঝামাঝি। প্রকাশিত হল 'নব পাটিগণিত'। প্রকাশক ইউ এন ধর অ্যান্ড সন্স। কেশবচন্দ্র নাগের সেই 'কে সি নাগ' হয়ে ওঠার শুরু। বছর কয়েকের মধ্যেই তামাম বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল বইটি। পাঠ্যপুস্তক হিসেবেও অনুমোদিত হল। আক্ষরিকই, অপাঠ্য বই লিখেও অনেকের কপালে সাহিত্যিক সুলেখকের তকমা জোটে। কিন্তু, পাঠ্যবইয়ের রচয়িতাকে 'লেখক' বলে স্বীকৃতি দেওয়া আমাদের প্র্যাকটিসে নেই। ল্যাডলিমোহনের কেমিস্ট্রি বা সি আর ডি জি-র ফিজিক্স অনেক বাজারি গপ্পো কবিতার চেয়ে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছেছে, বেশি মানুষের 'কাজে' লেগেছে। তবু তাঁদের আমরা 'লেখক' বলি না। কে সি নাগের ক্ষেত্রেও 'পাঠক'-এর অবস্থানটা সেরকমই। ভুললে চলবে না, কে সি নাগকে অঙ্কের বই লিখতে বলেছিলেন কবিশেখর ও কথাশিল্পী। শরৎচন্দ্র মজা করেই তাঁকে ডাকতেন 'গণিত শিল্পী' বলে। 'রসচক্র সাহিত্য সংসদ' সৃষ্টি না হলে আমরা এই শ্রেষ্ঠ বাঙালি গণিত শিল্পীকে হয়তো পেতাম না।

সম্মান ও পুরস্কার

কবি কলিদাস রায় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (রংপুর শাখা) কর্তৃক বাংলা সাহিত্য জগতে 'কবিশেখর' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে জগত্তারিণী স্বর্ণ পদক দেয়। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে পান আনন্দ পুরস্কার। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে 'পূর্ণাহুতি' কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পান। ওই বছরেই তার পত্নীবিয়োগ ঘটে, তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সুকৃতি রায়। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' দেয়। ১৯৭২ খ্রিস্টব্দে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ডি.লিট. দেয়। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ অক্টোবর (বাংলা ১৩৮২, ৭ কার্তিক) কলকাতার নিজের বাড়িতে কবিশেখরের দেহাবসান ঘটে। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে মরণোত্তর ডি.লিট. সম্মাননা জ্ঞাপন করে। উল্লেখ্য

কবিশেখরের চার পুত্র—ভবভূতি, জয়দেব, কবিকঙ্কন ও কবিরঞ্জন। তিন কন্যা—কবিতা, সঙ্গীতা ও রঞ্জিতা।

শেষের কথা

কবিশেখরের মৃত্যুর পরের বছর থেকে অর্থাৎ ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে করুই গ্রামে তাঁর জন্মদিন ৭ আষাঢ় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে ঐ অনুষ্ঠানে কবির জন্মভিটায় কুনুর পত্রিকার সম্পাদক কবি চন্দ্রগোপাল ঘোষ ও করুই গ্রামের কবি গুরুপ্রসাদ যশ-এর উদ্যোগে কবির একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। অবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করেছেন কাটোয়ার স্বনামধন্য শল্য চিকিৎসক ডা. গোবিন্দরাম মান্না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করি কবিশেখরের মাটির বাড়িটি বর্তমানে ভগ্নপ্রাপ্ত হয়ে মাটিতে মিশে গিয়েছে, তার নিজের পরিবারের কেউ করুই গ্রামে থাকেন না। তবে তাঁর ভ্রাতা রাধেশ রায়-এর পরিবার এখনও ঐ গ্রামে বসবাস করেন। করুই গ্রামে বর্তমানে তৈরি হয়েছে 'কবিশেখর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি', যা সরকারি নিবন্ধীকৃত। এই সোসাইটি কবিশেখর-এর স্মৃতি রক্ষার্থে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকে এবং এই গ্রামের দোলতলায় অবস্থিত 'নজরুল প্রেমিক সংঘ'-ও এ-বিষয়ে যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এই গ্রামের যে রুরাল লাইব্রেরি রয়েছে, যা ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত, সেটির নাম 'করুই কালিদাস রায় স্মৃতি গ্রন্থাগার'। এই গ্রামের ভক্তপদ দাস নামক এক ব্যক্তি 'কবিশেখর' শিরোনামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তা বন্ধ হয়ে গেছে। শিক্ষকের স্মৃতিতে কবিশেখরের ছাত্র হরমোহন সিংহ কাটোয়ার সন্নিকটে, খাজুরডিহি গ্রামে 'আনন্দ নিকেতন' প্রাঙ্গণে ছাত্রাবাস তৈরি করেছেন, নাম দিয়েছেন 'কবিশেখর কালিদাস রায় ছাত্রাবাস'। এইভাবে কালিদাস রায় আমাদের মধ্যে বেঁচে রয়েছেন। এই বছর কবিশেখরের ১২৫ তম জন্মদিন উপলক্ষে ৭ আষাঢ় করুই গ্রামে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে। সকালে কবিশেখরের আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে। এরপর গ্রাম পরিক্রমা করা হয়। তারপর ঐ গ্রামের দোলতলায় সারাদিন ব্যাপী সাহিত্যচর্চা ও কবিশেখরের স্মৃতিচারণ করেন আগত মানুষজন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কবিশেখর ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক গুরুপ্রসাদ যশ এবং সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত চিকিৎসক অজিত মুখোপাধ্যায়।

তথ্যসূত্র

১. চন্দ্রগোপাল ঘোষ (সম্পাদিত), 'কালিদাস সংখ্যা', ৭ আষাঢ়, ১৪১৯, ২২ জুন ২০১২
২. সুস্নাত চৌধুরী, 'কে সি নাগ', রবিবাসরীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ জুলাই ২০১৩
৩. সুধীরচন্দ্র দাঁ, *বর্ধমানের বড় মানুষ*, বর্ধমান, ১৯৯৯
৪. *অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন : স্মরণিকা*, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ
৫. 'বাংলার কবিশেখর', আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ আষাঢ়, ১৪১৩
৬. নিজস্ব ক্ষেত্রসমীক্ষা, ৭ আষাঢ়, ১৪২০

With best compliments of

Ratan Dutta

ASSOCIATED ENGINEERS

MECHANICAL CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIER

Specialist in

Tool Room, Gear, Penion Shaft & Maintenance Works

Sagarbhanga Colony, Durgapur-713211, Dist. Burdwan

Phone : 9932244082, 8001762157

Sl. No. 140

With best compliments of

G. S. SIDDIQUIE

CONTRACTORS & LABOUR SUPPLIERS

SURESH COMPANY
Station Road, Durgapur-1

Sl. No. 126

With best compliments of

FRIENDS ENTERPRISE

Durgapur, Dist. Burdwan

Sl. No. 121

দেবীগর্জন : একটি অনাটকীয় পাঠ

তরুণ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যের ছাত্রমাত্রই বিজন ভট্টাচার্য এই নামটির সঙ্গে পরিচিত। তাঁর নাটক পড়া বা দেখা না হলেও তিনি যে নাট্যকার বা অভিনেতা এবং বিশেষভাবে গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তা কারোর অজানা নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি পড়তে ও পড়াতে গিয়ে বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্মের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত হই। অন্য এক দলের অভিনীত বিজনবাবুর নাটকও দেখেছি। তবে 'নবান্ন' না-দেখার ক্ষতি ও খেদ কোনোদিন যাবার নয়। যেমন, শম্ভু মিত্রের 'বহুরূপী'তে 'রক্তকরবী' না দেখার দুর্ভাগ্য আজও স্মরণ করি। তবে সৌভাগ্য এই, ক্যাসেটে এই নাটকটি শোনা যায়। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে।

বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' বহুল প্রচারিত হলেও 'দেবীগর্জন' নাটকটিও গুরুত্বপূর্ণ। কারো মতে, 'গণনাট্যের সার্থকতা দেবীগর্জনে'। বিজনবাবুর নাট্যদর্শন ও নাট্যরীতিকে ''এক প্রাক্-ব্রেশ্‌টীয় 'মহাকাব্যিক' নাট্যকলা'' রূপে দেখেছেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মতে, '' 'নবান্ন' নাটকে (১৯৪৪) যে বীজ উপ্ত হয়েছিল তা 'দেবীগর্জন' (১৯৬৬) নাটকে পরিণত নাট্যশরীর পরিগ্রহ করে।'' নাটকটি কতখানি গণনাট্য ও দেশীয় ভাব-ভাবনা, উপাদানে গঠিত তা অনেক সুধী সমালোচকই বলেছেন। সে-প্রসঙ্গে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। একজন পাঠক ও নাট্যরসিক হিসেবে 'দেবীগর্জন' পড়তে গিয়ে আমার যা মনে হয়েছে তার দু-একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে চাই।

'দেবীগর্জন' নাটকটি পড়তে গিয়ে প্রথমেই খটকা লাগে এর নামকরণে। এর চমৎকার নাম, অথচ প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাই না। নামে কী এসে যায়, শেক্সপিয়রীয় বচন মানলে, নাটকের নাম যা-ই হোক, নাটক কিনা সেটাই বিচার্য। 'দেবীগর্জন' নাটক হিসেবে সফল নিশ্চয়। কিন্তু নামকরণের

নবান্ন নাটকে বিজন ভট্টাচার্য

তাৎপর্য সত্যিই কি মূল নাটকের সঙ্গে যথাযথভাবে মেলে? এ ব্যাপারে স্বয়ং নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য যা বলেন, তা উদ্ধৃত করছি—

> আভিধানিক অর্থে দেবী অর্থাৎ বসুধা গর্জন করছেন। অশান্ত হয়ে উঠেছেন জননী। বাসুকীর ফণায় ধরিত্রীমাতা অস্থির। ভূমিকম্প হচ্ছে।

এছাড়াও লোকায়ত দেশাচার ও বিশ্বাসের কথাও বলেছেন। যেমন, মেঘমুক্ত শরতের আকাশে হঠাৎ গর্জন শোনা যায়। যা নাকি হরগৌরীর ঝগড়া। পুজোয় মা কৈলাস থেকে মর্ত্যে আসবেন। শিব নারাজ। তাই ঝগড়া। অবশেষে রফা হয়। এই সমঝোতার আগে 'মাঝখানে ঐ তাণ্ডব, ঐ অশান্তি—আর দেবীর গর্জন'। নাটকের শেষে স্থির চালচিত্রে মহিষাসুর-বধের ছবিও দেবীগর্জনের অর্থাৎ অসুরনিধনের উল্লাসকে ব্যঞ্জিত করেছে বলেও নাট্যকার মনে করেন।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সেমিনারে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য যে-ভাষণ দেন, সেখানেও 'দেবীগর্জন' নামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, চাষিদের প্রাপ্য আদায়ের চেষ্টা, প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ-ই তাঁর লক্ষ্য ছিল। তাই—

> The violence of their revolt I associated with the Devi's Garjan, the roar of the angry Goddess. (আগস্ট, ১৯৭৭)

লেখকের ভাবনা ও মতকে মান্য করেও প্রশ্ন জাগে, এখানে দেবী কে? কার গর্জনে অশুভশক্তির বিনাশ হলো?

নারীচরিত্র যা পাই, তার মধ্যে রত্না ও গিরি ছাড়া সক্রিয় ও পূর্ণাঙ্গ চরিত্র নেই। বাকিরা গৌণ চরিত্র। সেক্ষেত্রে 'দেবী' কাকে বলব? রত্নাকে সম্ভোগ করার উদ্দেশ্যে প্রভঞ্জন হরণ করলেও, কার্যত সে ধর্ষিতা কিনা বোঝা যায় না। হয় তাকে মেরে ফেলা হয়েছে নয়তো সে আত্মঘাতিনী হয়েছে। নিজের মান-মর্যাদা-যৌবন লম্পটের হাতে তুলে দেয় নি। নাটকের শেষ দৃশ্যে ধর্মগোলা থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। সমবেত উত্তেজিত জনতার কাছে 'মাঠের লক্ষ্মী রত্নাকে' মংলু কোলে তুলে নিয়ে আসে—'সতীর দেহভার নিয়ে এগিয়ে আসে মংলা'। পশ্চাৎপটে মহাকালীর তাণ্ডবনৃত্যের ব্যঞ্জনা, কিন্তু একে 'দেবীগর্জন' বলা যায় কি?

আর এক নারীচরিত্র গিরি। তার মধ্যে আগুন আছে। তীব্র ভাষায় সে কথা বলে। রত্নাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার পর চার দিকে যে বাঘের ডাক শোনা যায়, তাকে কেউ না দেখলেও গিরি দেখে। বলে, ''বাঘটাকে আমি পষ্ট দেখলম অন্ধকারে।'' বাঘকে নিরস্ত করতে সে জানায়, ''এইবার নিজমূর্তি ধরতে হবেক।'' শেষ পর্যন্ত সে 'নিজমূর্তি' ধরল কিনা, তা নাটকে দেখানো হয়নি। সেটা দেখলেও গিরির মাধ্যমে দেবীগর্জনের তাৎপর্য পাওয়া যেতো। ফলে নামটা আলঙ্কারিক হয়েই থাকল। বড় জোর ভেবে নিতে পারি, পৃথিবীতে এত অন্যায়-অবিচারের জন্য বসুমতী অশান্ত হয়ে গর্জন

করছেন—যা নাট্যকারের দাবি।

নাটকে মিথ-পুরাণের প্রয়োগ একালে অভিনব নয়। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর যুগের বুদ্ধদেব বসু, রাম বসু, মনোজ মিত্র প্রমুখ পুরাণের পুনর্নবীকরণ করেছেন তাঁদের নাটকে। বিজন ভট্টাচার্য গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি মানেন, গণনাট্যের সঙ্গে রাজনীতি (বিশেষভাবে কমিউনিজ্‌ম) অঙ্গাঙ্গী জড়িত। তবু যখন কৃষক সমাজের কথা বলেন, তখন তাদের বিশ্বাস, লোকায়ত ভাবনাকে উপেক্ষা করতে পারেন না। যেজন্য 'দেবীগর্জন' নাটকে কালীমূর্তির ছায়া পড়ে। নামকরণে তিনি হরগৌরীর কলহে দেবীর যে গর্জন আকাশে শোনেন (প্রচলিত লোকবিশ্বাস সূত্রে), সে তো দেবীর পিত্রালয়ে যাবার জন্য দশমহাবিদ্যারূপ ধারণ, যেখানে চামুণ্ডা কালীও আছেন। লম্পট প্রভঞ্জন যখন রত্নাকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়, তখন হঠাৎই ভয় পায়। অদ্ভুত এক শঙ্কা ও পাপবোধে সে আক্রান্ত হয়। মনে হয়—

> মহাকালের খাঁড়া লাফিয়ে ওঠে তার মাথার ওপর। প্রভঞ্জন স্পষ্ট দেখতে পায় রুধিরাক্ত একটি খাঁড়া। আঁৎকে ওঠে প্রভঞ্জন।

আর নাটকের শেষে তো প্রভঞ্জন বধ ও মহিষাসুর বধকে সমার্থক করে দেখানো হয়। তৎসত্ত্বেও মনে হয়, এই নাটকে পৌরাণিক ইমেজ যেন কেমন গূঢ়সঞ্চারী নয়। আরোপিত মাত্র।

তবে 'দেবীগর্জন' গণনাট্য হয়েও, আঞ্চলিক ভাষা ও গানের ব্যবহার সত্ত্বেও কোথাও কোথাও লিরিক্যাল মূর্ছনা এনেছে। তা এসেছে সংলাপ রচনায়, উপমা, চিত্রকল্প প্রয়োগে। বিজন ভট্টাচার্য রূঢ় বাস্তবের রূপকার হলেও তাঁর ভিতরে যে একজন রোমান্টিক কবি ছিলেন, তা বোঝা যায়। নইলে, 'দেবীগর্জন'-এর মতো নাটকে তিনি এমন মাধুর্য সঞ্চার করতে পারতেন না।

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে গিরি যে গানটি গেয়েছে সেই গানের ভাব ও কথা ভাবা যাক—

> করি চিরি পাটি-পারি
> খৈছামে ফুল ধরি,
> ফুল পহেরি।
> তখন ভেল খবরি।

(সিঁথি চিরে পরিপাটি করে চুল বাঁধি। খোঁপায় ফুল সাজাই। যে-ফুলের গন্ধে ভ্রমর আসে।) পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রগানের পংক্তিগুলি—

> একলা বসে হেরো তোমার ছবি
> এঁকেছি আজ বসন্তী রঙ দিয়া,
> খোঁপার ফুলে একটি মধুলোভী
> মৌমাছি ওই গুঞ্জরে বন্দিয়া।
> (বীথিকা কাব্য)

উভয় গানে চিত্রধর্ম ও গীতিধর্ম দুইই মেলে।

প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে মংলা রত্নাকে দেখে স্বপ্নে বিভোর হয়। প্রায় স্বগতোক্তির মতো সে যা বলে, তাতে রোমান্টিক প্রেমিক ও কবির মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। রত্নাকে উদ্দেশ্য করে সে বলে—

> দেখছিলম সেদিন একটা ডাহুক;—ডাহুকীটাক আগলে নিয়ে চলেছে জলায় পদ্মপানা পাঁকঠোর উপুর দিয়া।... ডাহুকীটাক তুই বুঝবি, আমার কিন্তুক ডাহুকটার মতন তোক্ ঘিরে কুক্ দিয়া দিয়া নাচতে মন করছে।

কখনো সে হতে চায় রূপকথার রাজপুত্র। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে আনতে চায় রাজকন্যা রত্নাকে। কখনো ডাহুক-ডাহুকীর উপমায় বলে—

> তোক ঘিরে ঘিরে, নেচে নেচে,—কুপ্ কুপ্, কুপ্ কুপ্, কুপ্ কুপ্—ডুবতম আর ভাসতম,—ভাসতম্ আর ডুবতম্ পদ্মঝিলের গহীন জলায়।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নেতা ত্রিভুবন সভায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রকৃতি থেকে তুলনা সংগ্রহ করে। পঞ্চায়েতে সমবেত জনগণকে বলে—

> ...তামাম্ হল্‌দা পাতাগুলাক সবজ্যা করিবার দায়ভার নিয়ে বে, আবার তোরা সবজ্যা হ; আবার তোরা মাথাঝাড়া দিয়ে উঠেক লতায়-পাতায় সবজ্যার সমারোহ নিয়ে, শক্ত গাছের বাকল ফুঁড়্যা।

জনতার রোষের শিকার হওয়া প্রভঞ্জনের অবস্থা বর্ণনায় নাট্যকার লেখেন—

> কিংখাবের জালি পর্দা শিং-এ জড়িয়ে গেছে ঘাইহরিণের—অন্ধকারে পথ না পেয়ে ছুটে পালাচ্ছে।

মংলা ও রত্নার কথোপকথনে সাপ-পদ্ম-শালুক ও ভ্রমরের প্রসঙ্গটি উপভোগ্য। আমরা জানি, নাটক তখনই সার্থক হয় যখন তা মঞ্চস্থ ও অভিনীত হয়। শুধু পাঠ্য হিসেবে অনেক সময় ক্লান্তিকর মনে হতে পারে। তবু 'দেবীগর্জন' পাঠ্য ও অভিনয়ে সফল এইজন্যই যে, নাট্যকার বস্তুর কারবারী না হয়ে বস্তুরস পরিবেষণ করেছেন।

With Best Compliments of

M.M. Bhattacharya

Ukhra, Burdwan

Sl. No. 31

নিশ্চিন্তপুরের মানুষ : এক অনিশ্চিত মানুষী আখ্যান

উদয়চাঁদ দাশ

ছিন্নমূল মানুষ বলতেই সাধারণভাবে ভারত-বিভাগ পরবর্তী নিরাশ্রয় মানুষের স্রোতোধারাকে বোঝায়। যদিও ছিন্নমূল মানুষের প্রব্রজন শুরু হয়েছে সুপ্রাচীন কাল থেকে; স্বাভাবিকভাবেই যার সঙ্গে দেশবিভাগের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এমনকি ভারতের বাইরে এর একটা গ্লোবাল চেহারার কথাও তো নানাভাবে জানি। তবে বৈশ্বিক চেহারার কথা আপাতত মুলতুবি থাক।

এক.

ছিন্নমূল মানুষ বলতে যদিও বয়েসভেদে কিংবা লিঙ্গভেদে আলাদা করে না বুঝিয়ে সার্বিকভাবে সমস্ত নিরাশ্রয় বাস্তুচ্যুত মানুষকেই বোঝায়; তবু, শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সমস্যা-সংকটের শ্রেণি-চরিত্র আলাদা-আলাদা। বিশেষ করে ছিন্নমূল নারী-পুরুষের সমস্যা-দীর্ণ ছবিকে এক ক্যানভাসে ধরানো চলে না। কারণ, দেশবিভাগ ছিন্নমূল প্রায় সমস্ত উদ্বাস্তুর জীবনেই দুঃখ-বেদনা, হতাশা-লাঞ্ছনার অভিজ্ঞতা বয়ে নিয়ে এসেছিল, তবু ছিন্নমূল মানবী জীবনের পক্ষে ওই ভার হয়ে উঠেছিল অসহ্য, দুর্বিষহ। ক্ষমতা দখলের যে-রাজনীতি ও গদির লোভ দাঙ্গা ও দেশবিভাগ ঘটিয়েছিল, সেখানে সাধারণ মানুষের কোনো ভূমিকা ছিল না, আরও বেশি করে মেয়েদের কোনো ভূমিকাই ছিল না। কবির কথার তাৎপর্য খুঁজতে হয় আরেকভাবে—খুকু শুধু তেলের শিশিই ভেঙে বসে, ভারত ভেঙে ভাগ করে, টুকরো করে বুড়ো খোকারা! অথচ সম্পূর্ণ নিরপরাধ হয়েও দেশবিভাগের ফলে সবচেয়ে বড়ো আঘাত নেমে এসেছিল মেয়েদেরই ওপর। ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হবার যন্ত্রণাবোধ, মানসিক ভরকেন্দ্র থেকে বিচ্যুতি সব থেকে বেশি সইতে হয়েছে মেয়েদের। আমরা মানতে না চাইলেও জানি ঘরটা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি মেয়েদের। গৃহাশ্রয়ী জীবনের অন্দরমহলে ঝুরি নামিয়ে দেয় মেয়েরা। আন্তরিক প্রাণের টানে শিকড় নামিয়ে দেয় অনেক গভীরে। অন্যদিকে, লিঙ্গবৈষম্যবাদী সমাজের আওতায়, পুরুষ-প্রভুত্বের চাপে যে-মেয়েরা এতদিন বাধ্যতামূলক অন্তঃপুর-জীবন, সামাজিক-পারিবারিক সুরক্ষা-বেষ্টনীর মধ্যে জীবন কাটিয়ে আসছিল, আকস্মিকভাবে ছিন্নমূল জীবনের মধ্যে এসে পড়ে লোভী পুরুষদের নির্লজ্জ দৃষ্টির সামনে যেন বড়ো উদোম হয়ে পড়েছিল। দাঙ্গা ও দেশবিভাগ পরবর্তী দুর্দশাগ্রস্ত জীবনে ছিন্নমূল মানুষের সাধারণ দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে মেয়েদের প্রায়ই সইতে হয়েছে অতিরিক্ত অসম্মান ও অবমাননা। শারীরিক ও মানসিকভাবে নারীদের ওপর যতভাবে আঘাত নেমে এসেছিল তার তীব্রতা ছিল ভয়াবহ। যেহেতু দাঙ্গা ও দেশবিভাগের মূলে ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের তীব্র বিদ্বেষ, তাই দাঙ্গা আর প্রব্রজনের দিনগুলিতে যে-সম্প্রদায় যেখানে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, সে-ই অন্য সম্প্রদায়ের মেয়েদের ওপরে আক্রমণ হেনেছে। সুরঞ্জন দাশ তাঁর 'Communal Riots in Bengal: 1905-1947'-এ, গার্গী চক্রবর্তী তাঁর 'Coming out of Partition: Refugee Women of West Bengal' গবেষণাগ্রন্থে এবং যশোধরা বাগচী ও শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁদের 'The Trauma and the Triumph: Gender and Partition in Eastern India' যৌথকর্মে দেখিয়েছেন পুরুষপ্রতাপী সমাজে মেয়েরাই যেহেতু সম্প্রদায়গত মর্যাদা এবং অস্তিত্বের সবচেয়ে সুরক্ষিত অংশ, তাই সেই অংশেই বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের আঘাত হানার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। মেয়েদের জীবনে দাঙ্গা এবং দেশবিভাগ যে অতিরিক্ত দুর্দশা-লাঞ্ছনা বয়ে নিয়ে এসেছিল তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখি করে আসছেন উর্বশী বুটালিয়া, ঋতু মেনন ও কমলা ভাসিন, বীণা দাস প্রমুখ। লেখালেখি করার পাশাপাশি মণিকুন্তলা সেনের মতো কেউ কেউ নারী-কল্যাণমূলক কাজকর্মের সঙ্গেও জড়িয়ে ছিলেন। তাঁরাও দেখিয়েছেন, দাঙ্গার সময়ে যেমন দাঙ্গাবাজদের 'soft target' হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মেয়েরা; দেশবিভাগের সময় থেকে দেশত্যাগী ছিন্নমূল মানুষের পরিবারভুক্ত মেয়েদেরও নানাভাবে হেনস্থা-অপমান-অসম্মান করতে থাকে আধিপত্যবাদী বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের পুরুষবর্গ। নারীহরণ, ধর্ষণ, সীমান্তে তল্লাশির নামে নারীত্বের অবমাননা সেদিন যতভাবে ঘটেছিল, তার সামান্য ছবিই সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে উঠে এসেছিল; বরং বাংলা আখ্যানে তার সীমাহীন বিস্তার লক্ষ করা যায়। শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে কুপার্স ক্যাম্প বা মানা ক্যাম্পগুলিতে, এমনকি সরকারি কিংবা বেসরকারি নারী আশ্রয়-শিবির বা হোমগুলিতে মেয়েদের নিরাপত্তাহীন অসহায় বেআব্রু অবস্থার সুযোগ নিয়ে যতভাবে তাদের ওপর লাঞ্ছনা চলে, তার বহুতর ছবি বাংলা আখ্যানের পটে আঁকা হয়ে চলেছে সেই কবে থেকে! অজস্র লেখা, বিচিত্র তার অভিমুখ! এক নারকীয় জীবন পেরিয়ে আসা, পথের মধ্যে যৎসামান্য পুঁজি খুইয়ে বসার চেয়েও দগ্‌দগে ক্ষত তৈরি করেছে দেহের শুচিতা খুইয়ে বসা। স্টেশন-প্ল্যাটফর্মের ঘেয়ো জীবন থেকে ক্যাম্পের নারকীয় জীবন, সেখান থেকে কলোনির বেআব্রু অসহায় জীবন—ঠেকতে-ঠেকতে, ধুঁকতে-ধুঁকতে শেষ হয়ে গেছে জীবনের সব স্বপ্ন-সাধ। না পেয়েছে নতুন দেশ, মাটির আশ্রয়; না পেয়েছে নতুন করে ঘর বাঁধার সুখ! ধর্ষিতা মেয়েদের গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তানেরা যেমন সামাজিক সমস্যার জন্ম দিয়েছে, অপহৃতা মেয়েদের সংসারে ফিরিয়ে দেবার জন্য যখন রাষ্ট্র উদ্যোগী হয়েছে তখন তাদের পারিবারিক পুনর্বাসন নিয়ে তীব্র সমস্যা দেখা দিয়েছে। একদিকে

পরিবারের অন্য মানুষজন যেমন ওই হতভাগ্য মানবীকে নতুন করে গ্রহণ করার কথা ভাবতে পারেনি, অন্যদিকে ওই মেয়েরাও ধর্ষক-অপহারক স্বামী এবং তার সন্তান ফেলে, মেনে নিতে বাধ্য হওয়া নতুন গড়া সংসার ফেলে আর ফিরে আসতে চায়নি। আবার, জীবিকার তাগিদে ছিন্নমূল মানবীর এক বড়ো অংশ বাধ্য হয়ে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করেছে। এমনকি চালপাচারকারীর ভূমিকায় নেমে পড়েছে যারা, কিংবা আয়ার কাজ নিয়েছে যারা; তারাও দেহের শুচিতা রক্ষা করতে পারেনি। লোভী পুরুষের হাত এড়াতে পারা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। যাত্রা-নাটক-সিনেমায় যারা অভিনয়ের দিকে ঝুঁকেছে, তাদেরও এক বড়ো অংশ অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে টিকে থাকতে দেহকে পণ্য করতে বাধ্য হয়েছে। তাই, ছিন্নমূল মানবী-আখ্যানের ধারাটি কিছু আলাদা করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

দুই

দেশবিভাগ এবং তার নানামাত্রিক সমস্যা-সংকট নিয়ে আখ্যান রচনার একটা সংকটের কথা অনেকদিন থেকে বলে আসা হচ্ছে। আখ্যানের অপ্রতুলতার কথাটি নেহাতই চালু হয়ে গেছে। পূর্বার্জিত ধারণাকে যাচাই করে না নিলে অনেক সময় এমন কুহকের ঘের তৈরি হয়। সত্যিটা হল, দেশবিভাগের দগ্‌দগে ক্ষত নিয়ে, ছিন্নমূল জীবনের অজস্রতা দিয়ে, বিচিত্র সংবেদনা নিয়ে অসংখ্য আখ্যান লেখা হয়ে আসছে। পরিশ্রম-বিমুখ সন্ধানীর চোখে মগ্ন মৈনাকের শুধু মাথাতোলা অংশটুকুই নজরে এসেছে।

দেশবিভাগ এবং ছিন্নমূল মানুষকে ঘিরে বাংলা আখ্যানের মগ্ন মৈনাক তথা অপরিচয়ের এক অংশে লগ্ন হয়ে আছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'নিশ্চিন্তপুরের মানুষ'। এ-আখ্যান ছিন্নমূল মানবী মুক্তার আখ্যান। শিয়ালদা স্টেশন-প্ল্যাটফর্ম থেকে এ-আখ্যান গড়াতে শুরু করেছে ছিন্নমূল মানবীর প্রার্থিত এক স্বপ্নের জীবনের দিকে, নিশ্চিন্তপুরের দিকে। আখ্যানে বলাইয়ের পরিসর বেশ খানিকটা জায়গা জুড়লেও মুক্তার ছিন্নমূল জীবনের রেখাগুলি যেমন দগ্‌দগে, তার পাশে বলাইয়ের জীবনের ক্যানভাস বড়ো অস্বচ্ছ। বিশেষ করে, বলাইয়ের জীবনের প্রাক্তন পটভূমিটি শেষ পর্যন্ত ধোঁয়াটেই রয়ে গেছে। উপন্যাসের একেবারে প্রান্তসীমা ছুঁয়ে বলাই যখন পাটখেত নিড়োনোর কথায় তার বাবার নিপুণতার কথা বলে, কিংবা তার ঠাকুরদার মতো ঘরামি ও তল্লাটে ছিল না বলে দাবি করে, তখনই একবারমাত্র ঝাপসাভাবে বলাইয়ের ফেলে আসা দেশ-মাটির ছবিটা ফুটে উঠতে চায়। শিয়ালদার ফিরিওয়ালারও যে অন্য একটা জীবন ছিল, তার আভাস মেলে মাত্র।

পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত কুমিল্লাবাসী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে আসেন ১৯৩৭-এ। উপন্যাস লিখতে এর পরেও বছর-দশেক সময় নিয়েছেন। তবু, দেশবিভাগ নিয়ে, ছিন্নমূল জীবনের সমস্যা-সংকট নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর আখ্যানের দেখা মেলে কই! অথচ, সারাজীবন পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা ছাড়েননি, বেলেঘাটার বারোয়ারিতলা লেনের ভাড়াবাড়িতে পূর্ববঙ্গীয়দের সঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাস করেছেন, দেশবিভাগের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া কিংবা প্রভাব তাঁর ওপরেও নানাভাবে পড়েছিল! উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে, প্রব্রজন নিয়ে একটিই লেখা—'নিশ্চিন্তপুরের মানুষ'। তবে কি মেনে নেব, 'সামাজিক সমস্যাগুলো মুখ্যত তাঁর মনে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি'![১] হয়তো বা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মতো লেখক-কুলের জন্যই এমন অপবাদ উঠে পড়েছিল যে, দেশবিভাগ বিশ শতকীয় জীবনের সবচেয়ে বড়ো সংকট, আঘাত আর ক্ষয়-ক্ষতি বহন করে নিয়ে এলেও বাংলার প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিককুল তার তাৎপর্য অনুধাবনে সচেষ্ট হলেন না।[২] একথা ঠিক, জ্যোতিরিন্দ্রর শক্তিশালী কলমের পরিচয় 'নিশ্চিন্তপুরের মানুষ' পায়নি। শিয়ালদা স্টেশনের গায়ে লেপটে থাকা উদ্বাস্তু জীবনের ঘেয়ো বাস্তবতাও যেন দূর থেকে দেখা; বড়ো নিস্তেজ বিবরণ। একদিকে আখ্যানের শিথিল বাঁধুনি অন্যদিকে কাতকালীয় ব্যাপারের প্রাচুর্য বিশ্বাসযোগ্যতার বাতাবরণকে জমাট করে তুলতে পারেনি। ছিন্নমূল মানুষের বেঁচে-বর্তে থাকার ছবিও বর্ণ-গন্ধহীন, উপরিস্তরের। এমনকি নিশ্চিন্তপুরের ভূমিকাও যৎসামান্য, আখ্যানের শেষাংশে তার জোড়াতাড়া দেওয়া ছবি। দেশবিভাগ এবং নিরাশ্রয় ছিন্নমূল জীবনের কষ্ট-যন্ত্রণা তথা বিশ শতকীয় ওই জটিল সমস্যা এবং বহিমান সময়ের ঘেরটুকু তুলে আনবার দায়বদ্ধতা থেকেই কি কেবল একে বিষয় করে তোলা! শিল্পীর বিবেককে পরিষ্কার রাখা! হয়তো তাই! তবে, ছিন্নমূল মানবী-আখ্যানের দিক থেকে পাঠক-প্রাপ্তি বড়ো কম নয়। অবক্ষয়িত জীবন-জীবিকা-ভ্রষ্টাচার নিয়ে 'নিশ্চিন্তপুরের মানুষ' ছিন্নমূল জীবনের গলি-ঘুঁজিকে তুলে এনেছে। নিরাশ্রয় মানবী-জীবনের পায়ে-পায়ে যে লোভ-লালসা আর কুহকের ফাঁদ পাতা, তার ছবিটিকে অসামান্যভাবে সামনে এনেছেন আখ্যানকার। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কুমিল্লায় বড়ো হয়ে ওঠার সুবাদে পূর্ববঙ্গীয় ভাষা ও আচারের মাধুর্য এবং অকৃত্রিমতা দিয়ে মুক্তাকে যেভাবে গড়েছেন, মুক্তা যেভাবে কুহকের ফাঁদ এড়িয়ে লালসার আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পায়ে-পায়ে নিশ্চিন্তপুরের যাত্রী হয়ে উঠেছে, তাতে অস্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা রক্ষার ওই সংকটের ছবিকে ঘিরে আখ্যানে নভেলনেস দানা বেঁধে উঠছে।

নিশ্চিন্তপুরের মানুষ যতদিনে প্রকাশমুখ দেখেছে[৩] দেশবিভাগোত্তর পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজ ততদিনে দফায়-দফায় ছিন্নমূল মানুষের অজস্র ঢেউয়ে টালমাটাল। ১৯৫০ থেকে নতুন করে দাঙ্গার ফলে নিঃসম্বল অসহায় মানুষজন অবিরাম এদেশে এসে আছড়ে পড়ছিল। লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষর দুঃখ-যন্ত্রণা, কঠিন জীবনসংগ্রামে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রাণপণ প্রয়াস সেদিন যাঁরা চোখে দেখেছিলেন, তাঁদের অনেকেরই মনে দগ্‌দগে হয়ে রয়ে গিয়েছিল ওই জঘন্য জান্তব জীবনের ছবি। বিষ্ণু দে-র মতো কবিকে লিখতে হয়েছিল:

> এখানে-ওখানে দেখ দেশছাড়া লোক ছায়ায়
> হাঁপায়। পার্কের ধারে শানে পথে-পথে গাড়ি-
> বারান্দায়। ভাবে ওরা কী যে ভাবে। ছেড়ে খোঁজে
> দেশ। এইখানে কেউ বরিশালে কেউবা ঢাকায়।[৪]

পোকা-মাকড়ের মতো কোনোক্রমে বেঁচে থাকা অপচয়িত ছিন্নমূল জীবনের বেদনা কবি মণীন্দ্র রায়কে দিয়ে লিখিয়ে নেয় :

> কে দেখেছে জীবনের অপচয় বেশি তার চেয়ে?
> কে সয়েছে এত গ্লানি রাণাঘাটে, ক্যাম্পে ক্যাম্পে, পথে,
> উড়িষ্যার তেপান্তরে, জনহীন দ্বীপান্তরে
> আর হাওড়ার স্টেশনে?[৫]

রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে উদ্বাস্তু ক্যাম্প, পশ্চিমবঙ্গ থেকে উড়িষ্যা-মধ্যপ্রদেশ কিংবা আন্দামান—অপচয়িত জীবনের এক সুবিশাল ক্যানভাসের তুলনায় আখ্যানের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও আখ্যানের সংকট সে-অর্থে নেই। নারায়ণ সান্যালের 'বকুলতলা পি এল ক্যাম্প', 'বল্মীক', 'অরণ্যদণ্ডক', 'দণ্ডকশবরী'; শক্তিপদ রাজগুরুর 'সোনা ফসলের পালা', 'দণ্ডক থেকে মরিচঝাঁপি'; প্রফুল্ল রায়ের 'নোনা জল মিঠে মাটি'; দুলালেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের 'ওরা আজো উদ্বাস্তু'; অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'নির্বাস'—এর বাইরেও রয়েছে ছোটোগল্প এবং নাটকের আখ্যানে স্রোতের শ্যাওলার মতো ছিন্নমূল নিরাশ্রয় জীবনের মর্মন্তুদ ছবি। ছিন্নমূল মানবজীবনের ওই ছবি যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর চোখেও পড়েছিল, তার জোরদার প্রমাণ আছে 'নিশ্চিন্তপুরের মানুষ'-এর মধ্যে। কিন্তু ওই জীবনের ঘেয়ো বাস্তবতা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল! ছিন্নমূল মানুষের জীবন-যন্ত্রণার আখ্যান

নিয়ে সূচনায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যে রাজপথ গড়ে তোলার প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলেন, তা ইচ্ছাপূরণের শুঁড়িপথে হারিয়ে যায়।

আর তখনই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'নিশ্চিন্তপুরের মানুষ' নিয়ে বিরুদ্ধবাদী সমালোচনার সুযোগ তৈরি হয়ে যায় এভাবে :

> সম্ভবত, বাঙালি জীবনের সর্বাধিক মর্মস্পর্শী ঘটনা (দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা)লেখককে আলোড়িত করেছিল এবং একজন সচেতন মানুষ হিসাবে সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি উদ্বাস্তু জীবন ও সমস্যাকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।[৬]

অথচ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে ছিল, তার প্রমাণ আখ্যানের শুরুতেই আছে। শিয়ালদা প্ল্যাটফর্ম এবং স্টেশন সংলগ্ন উদ্‌ভ্রান্ত, দিশেহারা ছিন্নমূল জীবনের যে ছবি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আঁকেন, সে-ছবি যে কতটা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিনির্ভর তার অন্যমাত্রিক প্রমাণ মেলে যদি 'দ্য মার্জিনাল মেন'-এর লেখক প্রফুল্ল চক্রবর্তীর নিজের জীবনের কথায় গিয়ে দাঁড়ানো যায়। ওই জীবনছবিও ১৯৫০-এর গোড়ার দিকের কথা। প্রফুল্ল চক্রবর্তী তখন সবে ফরিদপুর থেকে চলে আসা গোটা পরিবারকে নিয়ে স্রোতের শ্যাওলার মতো ভাসছিলেন। তবে আক্ষরিক অর্থে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর পরিবারকে শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকতে হয়নি; দেশবিভাগের আগেই যেহেতু তিনি কলকাতায় চারুচন্দ্র কলেজে পড়াবার একটা কাজ পেয়েছিলেন। তবু, ১৯৫০-এর দাঙ্গার পর তাঁর বড়োসড়ো গোটা পরিবার যখন সব হারিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে এসে পৌঁছায়, তিনি ভেবে পাননি কোথায় নিয়ে ওদের তুলবেন! তিনি এতদিন থাকতেন একটা মেসে, যেখানে জায়গা হওয়া সম্ভব নয় বলে উদ্‌ভ্রান্তের মতো সবাইকে নিয়ে যাদবপুরের একটা ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে তোলেন। তাঁদের কলকাতার আত্মীয়-স্বজনেরা কেউ দরজা খোলেন নি। আসলে অনেকেরই পক্ষে জায়গা দেওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ সেকালের বাস্তব পরিস্থিতি বলে, উপচে পড়া ওপার বাংলার মানুষজনের চাপে তখন সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। বিশেষ করে, শহর কলকাতার ওপর চাপটা পড়েছিল শোচনীয়ভাবে। প্রফুল্ল চক্রবর্তী লিখছেন :

> শিয়ালদার কালিঝুলিমাখা মানুষগুলির মধ্যে আমি আছি। সরকারি চিড়েগুড় ডোলপ্রার্থী মানুষের লাইনেও আমি। শেয়ালদা স্টেশনের চত্বরে যে স্ত্রীলোকেরা তিনটে ভাঙা ইট পেতে নানারকম আবর্জনা জ্বালিয়ে মাটির হাড়িতে ভাত রান্না করত তারা আমার মা, স্ত্রী বা বোন। আমার গোটা পরিবারই ওদের সঙ্গে এদেশে চলে এসেছিল। আমি যদি দেশ স্বাধীন হবার আগে কলকাতায় একটা কলেজে কাজ না করতাম তাহলে আমাদের গোটা পরিবারকেই শেয়ালদা স্টেশনে দুমুঠো ভাতের জন্য ছুটোছুটি করতে হত।... কিন্তু ভয়ানক অস্বস্তি নোয়াখালির দাঙ্গার পর যখন উদ্বাস্তুর স্রোত আসতে শুরু করে তখন থেকেই এই অস্বস্তি। দেখতাম কীভাবে ট্রেন বোঝাই হয়ে এই সর্বহারারা শেয়ালদা স্টেশনে আছড়ে পড়ছে। কলে পড়া জন্তুর মতো এই মানুষগুলো কয়েক মুঠো চিড়ে গুড়ের জন্য, এক বালতি জলের জন্য, প্লাটফর্মে একটা মাদুর পাতার মতো জায়গার জন্য পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করছে, প্লাটফর্ম ভর্তি মানুষের মধ্যে যুবতী নারী প্রসববেদনায় আর্ত চিৎকার করছে, স্বাধীন ভারতের নাগরিক জন্ম দিচ্ছে।

এর পাশাপাশি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'নিশ্চিন্তপুরের মানুষ'-এর সূচনা অংশটি রাখলে দেখা যায়, ঔপন্যাসিক শুরুই করেছেন তিন ইটের উনুনে আবর্জনা জ্বালিয়ে দুটো ফুটিয়ে খাবার মর্মান্তিক প্রয়াস দিয়ে :

> মনে হবে বিংশ শতাব্দীর এক সভ্য শহরের বুকে আশ্চর্য একটা প্রদর্শনী খুলে দিয়েছে কে। প্রদর্শনী বটে! এখানে দর্শনীয় বস্তু কংকালসার কতকগুলি মানুষের মুখ—ভীত সন্ত্রস্ত বুভুক্ষু দৃষ্টি নিয়ে ওরা তাকিয়ে থাকে। দর্শনীয় বস্তু ছেঁড়া চট মাদুর কাঠের বাকল কি তালপাতার তৈরি তিনহাত পাঁচ হাত সারি সারি ডেরা।... ওরা ঘর বেঁধেছে মানে সেই চট আর শুকনো পাতা আর কাঠের বাকল আর আধখানা উইয়ে খাওয়া আধখানা পুড়ে যাওয়া বাঁশের খুঁটি একত্র করে ডেরা তুলেছে।... কিন্তু সারাক্ষণ যেখানে কাঠের ছাল বাকল, কাগজ, ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে আনা শালপাতা আর পচা তুলো ন্যাকড়া জ্বেলে তিন ইটের উনুনে এই পরিবারের চালের খুদ, ঐ পরিবারের হলদে শুকনো কপির ডাঁটার সঙ্গে কিছু পোকায় খাওয়া বেগুন ও পাটখড়ির মতো সরু ঝনঝনে পাকা সজনে ডাঁটার মিশেল তরকারি, কি আর এক পরিবারের জলের মতো পাতলা টলটলে বিউলি বা খেসারি ডাল সিদ্ধ হচ্ছে, সেখানে সারাক্ষণ কী পরিমাণ ধোঁয়া সৃষ্টি হতে পারে তা কল্পনা করা একটুও কষ্টকর না। কাঠগোলা থেকে কুড়িয়ে আনা গাছের ভেজা ছাল-বাকল অথবা রাস্তার জঞ্জাল থেকে তুলে আনা পচা তুলো ন্যাকড়া শালপাতা যতটা আগুন দেয়, ধোঁয়া ছড়ায় তার আটগুণ বেশি এ তো জানা কথা।

এরপর আখ্যানে চকিতে দেখা দিয়ে গেছে সরকারি চিড়ে-গুড়ের ডোলপ্রার্থী হতাশ্বাস মানুষজন, প্ল্যাটফর্মে এক চিলতে জায়গা নিয়ে চট কিংবা মাদুর পেতে বসা নুয়ে পড়া মানুষ, কলের জলের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা, স্নান-প্রাতঃকৃতের জন্য সকাল থেকে লাইন, ইত্যাদি। স্টেশন প্লাটফর্মের ওই নারকীয় ঘেয়ো বাস্তবতার ছবি আখ্যানে ধারাবাহিকভাবে দেখা দেয়নি সত্যি, কিন্তু ওই ছবির সঙ্গে যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী পরিচিত ছিলেন তা প্রত্যক্ষদর্শী প্রফুল্ল চক্রবর্তীর বিবরণের পাশে রাখলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আসলে মূল আখ্যানের সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং শিরোনামহীন সূচনা-অংশটি যেন একটি আলাদা নিটোল ছোটোগল্প; যেন কেবল ঘটনাক্রমে তা লগ্ন হয়ে আছে মূল আখ্যানের সঙ্গে।

একথা সত্যি, শিয়ালদা স্টেশনের ওই নিরাশ্রয় মানুষের ঢল, উদ্বাস্তু জীবনের পথভ্রষ্টতা, নৈতিকতার অবলুপ্তি, কঠিন জীবনসংগ্রামে সমস্ত মূল্যবোধকে হারিয়ে বসার এমন প্রত্যক্ষ বাস্তবধর্মী ছবি বাংলা আখ্যানে খুব কমই আছে। আর তাই উপন্যাসের শুরুতে একটি বড়ো-সড়ো পাঠক-প্রত্যাশা জাগ্রত হয়ে ওঠে। কিন্তু আখ্যান এরপর মূল উপন্যাস-অংশে প্রবেশ করলে যৌথ জীবনের সুবিশাল ক্যানভাস পিছনে পড়ে গেছে, ছিন্নমূল হতদরিদ্র জীবনের গতিপথ ক্রমশ সূচিমুখ হয়ে বলাই-মুক্তার দ্বৈত জীবনকে আশ্রয় করতে চেয়েছে। তবু, আখ্যানের প্রথম চারটি অধ্যায় পর্যন্ত ছিন্নমূল জীবনের অনিশ্চয়তা আর রুক্ষতা খানিকটা পরিসর পেয়েছে। সদ্যযুবতী সন্ধ্যা লজ্জা নিবারণের জন্য টিকিট-কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলে পয়সার জন্য হাত পাতে; বাসনা কিংবা চাঁপারা দালালের হাত ঘুরে জীবনের কোন্ কানাগলিতে গিয়ে পৌঁছায়, কেউ জানে না; মুক্তার অপরিণত যৌবনকে ফাঁদে ফেলার নানামুখী আয়োজন চলতে থাকে। চূড়ান্ত দারিদ্র্য আর খিদের চোটে অসহায় মুক্তা সুস্থ জীবনের জন্য মরীয়া হয়ে উঠে ফেরিওয়ালা বলাইয়ের ওপর যেভাবে নির্ভর করতে চেয়েছে—সে পর্যন্ত 'নিশ্চিন্তপুরের মানুষ' একভাবে অবক্ষয়িত জীবন ও জীবিকা নিয়ে, পথভ্রষ্টতা নিয়ে, কুহক-লালসা-ভ্রষ্টাচার নিয়ে যৌথ-জীবনকেই ছুঁয়ে ছিল। কিন্তু পঞ্চম অধ্যায় থেকে আখ্যানের ক্যানভাসে ঝাপসা হতে হতে দ্রুত মিলিয়ে গেছে যৌথ জীবনের ছবি। এ-আখ্যান হয়ে উঠেছে মুক্তা নামে এক ছিন্নমূল মানবী-জীবনের আখ্যান।

কিন্তু, এখানেও গোড়ায় গলদ আছে। বাবরিচুলের যে-ফেরিওয়ালার ছায়া পড়ে মুক্তার জীবনে, কিংবা ফেরিওয়ালা বলাই দাসের ছায়ায় বেআব্রু জীবনের প্রাখর্য এড়িয়ে যে স্নিগ্ধ সরসতা শুষে নিতে চায় মুক্তা;—তার জীবনের পশ্চাদ্‌ভূমিটি আখ্যানকার নেপথ্যেই রেখে দিয়েছেন। কে এই বলাই দাস! কবে থেকে সে কলকাতাবাসী! বাদাম-ডালমুট ফিরি করে বেড়ানোর সঙ্গে

মেয়েমানুষের কারবার কি সে আগেও করেছে! মনে তো হয় না! সে কি নিজেও ছিন্নমূল? নিরাশ্রয় তো নিশ্চয়! তা না হলে এঁদো গলিতে দুর্গন্ধময় পরিবেশে রাধাচরণের চোলাই বেচার খুপরিতে রাতটুকু মাথা গোঁজার সুবিধা করতে রাধাচরণের হয়ে চোলাই বেচার ঝুঁকি নিতে হয় কেন! বলাই তো বেশ বোঝে, ধরা পড়লে তার হাতেই হাতকড়া পড়বে; রাধাচরণ বেবাক নির্দোষ থাকবে। বলাইয়ের তৈজসপত্র বলতে কাঁধের থলেটি, একটি চটের বিছানা, তেলচিটে বালিশ আর কেরোসিন কাঠের বাক্স। সম্পদের মধ্যে আর যা আছে তা হল—একটি আয়না-চিরুনি, জলখাবার কুঁজো একটি, দড়িতে টাঙানো দু-একখানি ময়লা কাপড়, আর একটি ভাঙা ছাতা। শিয়ালদা স্টেশনে পড়ে থাকা নিরাশ্রয় মানুষের হতদরিদ্র অবস্থার সঙ্গে বলাইয়ের খুব কিছু তফাৎ নেই। কিন্তু বলাই কোনো কালে ছিন্নমূল ওই মানুষগুলির সঙ্গে লগ্ন ছিল কিনা, ওই জীবনের সঙ্গে কোনো অর্থে তার যোগ আছে কিনা, সে-কথাগুলি পাঠকের পক্ষে অনুমান করে নেওয়া কঠিন নয়। আভাসে-ইঙ্গিতে তেমন কোনো সম্ভাবনার কথা উপন্যাসের প্রতিবেদনে ফুটে উঠতে পায়নি। অথচ বলাইয়ের নীতিহীনতা, নানান দুষ্কর্মে জড়িয়ে পড়া, স্রোতের শ্যাওলার মতো ভেসে চলার উৎসটিকে না জানলে বিশ্বাসযোগ্যতার ঘাটতি হয়। বলাইকে নিয়ে সংশয় কাটতে চায় না এজন্য যে, ঔপন্যাসিক তাকে ঠিক কীভাবে উপন্যাসে হাজির করতে চেয়েছেন তা শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। প্রথম যেদিন ফেরিওয়ালা বলাই তার দু-পয়সা, চার-পয়সার ডালমুট-বাদামের প্যাকেট ফিরি করতে শিয়ালদা স্টেশন সংলগ্ন রাস্তায় জলের কলের কাছে মুক্তার দেখা পায়, সেদিনের প্রথম সাক্ষাৎটিকে ঔপন্যাসিক নেপথ্যেই রেখে দেন। দ্বিতীয় দিনের সাক্ষাতের সূত্রে জানা যায় এ-দিন মুক্তাই তাকে ডেকে এনেছে ডালমুট কিনতে চায় বলে। কিন্তু দু-পয়সা নয়, এক পয়সায় প্যাকেট দিলে মুক্তা একটা প্যাকেট রাখতে পারে। এক পয়সা প্যাকেট বেচলে পোষায় না জানিয়েও বলাই তার হাতে একটা প্যাকেট তুলে দেয়। মুক্তা পয়সা সঙ্গে আনেনি, জল নিতে রাস্তার কলে এসেছিল; তাই সে ফেরিওয়ালাকে ডেকে নিয়ে চলে তার ডেরার কাছে এবং সেখানে পয়সা দিতে গেলে বলাই নেয় না। বলাই কি বিনা পয়সায় ডালমুট দিয়ে মুক্তার কাছাকাছি আসতে চায়, বিশ্বাস অর্জন করতে চায়? তা যদি হবে, তবে পরের দিন বিকেলে বাদাম আর ডালমুটের ঠোঙা ভরতি থলেটা কাঁধে ঝুলিয়ে বলাই স্টেশন বাঁয়ে রেখে হাসপাতালের সামনের রাস্তাটি ধরে হাঁটা দেয় কেন? পথ চলতে তার মাথায় নানান এলোমেলো ভাবনা উঁকি দিয়ে গেলেও মুক্তার ছবি তো তার ভাবনা-বিশ্বে একবারের জন্যও ঠাঁই পায় না। এরই মধ্যে মুক্তা কাঁখে ঘড়া নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসে, বলাইকে ডেকে দাঁড় করায়। মুক্তার সঙ্গে দুটি-একটি কথা বলতে বলতে সঙ্কুচিত ভীরু বলাই পথ হাঁটে; কেউ তাদের লক্ষ করছে কিনা নজর করে দেখে। মুক্তা তাকে অনুসরণ করে আসছে দেখে কিছুটা বিরক্তও হয়। তার ভাবনাবিশ্বে এবার সহজভাবে দেখা দেয় যে কথাগুলি :

> আজও মাগ্‌না ডালমুট খাওয়ার মতলব। ওর দোষ কি। কাল একটা ঠোঙা দিয়ে বলাই লোভ দেখিয়েছে। কিন্তু লোভ দেখানোর জন্য কি দেওয়া, না ওর দুরবস্থার কথা চিন্তা করে বলাই একটা প্যাকেট এমনি ছেড়ে দিয়েছিল? যেন নিজের মনকে বুঝতে না পেরে বলাই অস্বস্তি বোধ করে।

মুক্তার সঙ্গে পথ হাঁটতে হাঁটতে, তার দুঃখের কাহিনি শুনতে শুনতে একটু পরেই বলাইয়ের ইচ্ছে করবে মেয়েটির হাত ধরতে। অসহায় মেয়েটির জন্য কী করার আছে তা যেন বুঝতে না পেরে প্রেমিকের মতো উদাস দৃষ্টি আকাশের দিকে মেলে ধরবে। কিন্তু এই হতদরিদ্র অসহায় মেয়েটিকে ঘিরে কোনো দুর্বুদ্ধি তার মাথায় জেগেছে—এমন ভাবনার আবছায়াও দেখা যায়নি। বরং শার্টের পকেট থেকে একটা দু-আনি বার করে মুক্তাকে বলেছে, 'নাও—আমার কাছে আর বেশি নেই। এটা রাখো।'

বলাইয়ের প্রতি মুক্তার আচরণেও ধোঁয়াশা তৈরি হয়। যে মুক্তা বিচক্ষণতার ভঙ্গিতে বলে—'আমি মাইয়ামানুষ, কুচরিত্তির পুরুষের চউখ দেইখা সব বুঝি, ফেরিওলা'; সেই মেয়েই বাবরিচুলের ফেরিওলা মুক্তার শরীরের কোন্ দিকে চোরা চাউনি হেনে ঢোক গিলছে বুঝেও তাকে প্রশ্রয় দেয়! কোথায় যেন এই মানুষটির প্রতি একটি নির্ভরতা আর আকর্ষণ অনুভব করে। তেজী মেয়ে মুক্তা অল্প-স্বল্প ছলনা আর লাস্যে নিজেও বলাইয়ের চোখে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে চায় যেন! কিন্তু মুক্তার ওই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বলাই যে তাকে লম্পট কুমারেশের হাতে টাকার বিনিময়ে তুলে দেবে, এ-সম্ভাবনা আখ্যানে ইতিমধ্যে কোথাও তৈরি হয়েছিল কি? চরম দারিদ্র্য আর নিরাপত্তার অভাবে অসহায় মেয়েদের ভুলিয়ে পাতাল জগতে ঠেলে দেওয়ার, সর্বনাশ করবার মতো মানুষ তখন সন্ধের অন্ধকারে উদ্বাস্তু শিবিরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াত। দালালের পাল্লায় পড়ে কত অসহায় মানবী যে অবাঞ্ছিত জীবনের মধ্যে গিয়ে পড়েছে তার লেখাজোখা নেই। কিন্তু ওই সুলভ ইতিহাসকে সঙ্গী করতে চাইলেও বলাইয়ের চিন্তাসূত্রে সে-সম্ভাবনাটিকে জাগ্রত করে তোলা প্রয়োজন ছিল। এমনকি মুক্তাকে টাকার বিনিময়ে লম্পটের হাতে তুলে দেবার মতো মনের জোর কিংবা কুকর্মের সাহস বলাইয়ের আছে বলে একবারও মনে হয়নি। মুক্তার সঙ্গে অল্প-স্বল্প আলাপ বাড়িয়ে তোলার সময় বলাইয়ের এরকম কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে যেমন বিন্দুমাত্র আভাস পাওয়া যায় না, বিপরীতে আবেগ-উদ্যোগ তো যা কিছু মুক্তার দিক থেকে! বলাই তো প্রায় প্যাসিভ আচরণ করে গেছে! মুক্তার বিশ্বাস অর্জন করতে হলে তো আগ বাড়িয়ে ভালোবাসার অভিনয় করাই বলাইয়ের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, অনিবার্য ছিল। লম্পট কুমারেশ দত্তর সঙ্গে বলাইয়ের যোগাযোগ-সম্পর্কও খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। একটু জোর করেই যেন দু-জনকে কাছাকাছি আনা হয়েছে। রাধাচরণের ওপর রাগে বলাই যখন চোলাইয়ে জল মিশিয়ে দু-পয়সা নিজের পকেটে পুরতে চায়, তখন কুমারেশ আসবে মনে করে সে গ্লাসটা হাত থেকে নামিয়ে রাখে। বলাই মনে ভাবে :

> না না—আর যাকেই জল মেশানো চোলাই খাওয়াই না কেন, কুমারেশ দত্তকে এ জিনিস দেওয়া চলবে না। বলাই অন্তত কুমারেশ দত্তর সঙ্গে 'অধর্মের কাজ' করতে চায় না।

—তাদের মধ্যে বিশ্বাসের এই ভিত কিসের ওপর দাঁড়িয়ে তা যেমন বোঝা যায়নি, সেই সঙ্গে ওই বিশ্বাসের মর্যাদা দু-জনের কেউ দেয়নি। ট্যাক্সিভাড়ার নাম করে যেমন কিছুটা বেশি টাকা বলাই পথ খরচা হিসেবে কুমারেশের কাছে আদায় করেও মুক্তাকে বেশ কিছুটা হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে, কিছুটা বাসে চাপিয়ে পথ-খরচা থেকে নিজের লাভের অংশটা বাড়াতে চেষ্টা করে, অন্যদিকে কুমারেশও দিচ্ছি-দোব করে শেষ পর্যন্ত বলাইকে আর একটা টাকাও ঠেকায় না, বরং পুলিশের কাছে খবর পৌঁছে দেয় রাধাচরণ-বলাইয়ের চোলাই মদের অবৈধ কারবারের ঘাঁটির। চোলাই বেচার দায়ে বলাইয়ের ঠিকানা হয় থানা-হাজত। অবিশ্বাস্য ঘটনার মিছিলে 'নিশ্চিন্তপুরের মানুষ' গা ভাসায়। নারী-মাংসলোভী লম্পট কুমারেশ দত্ত তার রুগ্ন স্ত্রী প্রভাকে ঝেড়ে ফেলতে নদীতে নৌকাবাসের আয়োজন করে; মুক্তাকেও সঙ্গে নেয়। মাঝনদীতে জোয়ারের সময় প্রভাকে ঠেলে ফেলে দেওয়া মুক্তার চোখে পড়ে যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত হয়ে যায় মুক্তা। সম্বিত ফিরে পেয়ে অনুনয়-বিনয় করে মাঝিকে, প্রভার শাড়ি এখনও ঢেউয়ের মাথায় দেখা যায়, এখনও ঝাঁপ দিয়ে কর্তামাকে টেনে তোলা

যায়! নৌকা ঘুরিয়ে মাঝিকে সেদিকে নিয়ে যাবার জন্য বলে মুক্তা। সব জেনে-বুঝেও মাঝি যখন নির্বোধের ভান করে, মুহূর্তে পরিস্থিতিটা বুঝে নেয় মুক্তা। তাকে নিয়ে নতুন জীবন ফাঁদতে লোভী কুমারেশ ইচ্ছে করে এ-সব ঘটিয়েছে, মাঝির সঙ্গে যোগসাজসে সমস্ত কিছু পরিকল্পনামাফিক! সেই মুহূর্তে মুক্তা ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে। আসল কাজ হয়ে গেছে, তাই নৌকা বাঁধবার জন্য মাঝি ইতিমধ্যেই ডাঙার দিকে নৌকা ঘুরিয়েছিল; পায়ের তলায় মাটি ঠেকে মুক্তার। দু-হাতে জল কেটে ঊর্ধ্বশ্বাসে সে তীরের দিকে ছোটে। এদিকে কুমারেশের হুকুম সত্ত্বেও লক্ষ্মণ মাঝি নৌকা না বেঁধে মুক্তার পিছনে ছুটতে পারে না, নৌকা তবে জোয়ারের জলে ভেসে যাবে! ব্যর্থ আক্রোশে বন্দুক তুলে কুমারেশ যতক্ষণে ফায়ার করে ততক্ষণে মুক্তার ছায়ামূর্তি ঘন গাছপালার মধ্যে প্রায় মিলিয়ে যেতে বসেছে। শরীরে-মনে বিপর্যস্ত মুক্তা জঙ্গলের ভেতর পড়ো বাড়ি, জঙ্গল পেরিয়ে মাঠ, মাঠের ভেতর ইটখোলা পার হয়ে রক্তাক্ত পায়ে বড়ো সড়কে এসে ওঠে। আর সড়কে উঠতেই সড়কের পাশে ছাতিমগাছটার নীচে জিরেন নেওয়া মানুষটার সামনে পৌঁছে মুক্তা আবিষ্কার করে সে-মানুষটা বলাই। সস্তা জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের পক্ষেও মুক্তা-বলাইয়ের এভাবে দেখা হওয়াটা বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় না। অবিশ্বাস্য আর কাকতালীয় ঘটনা ঘটে চলে একের পর এক। হাটের পথে চলা কর্মকার দু-ভাই রতি-মতির সঙ্গে দেখা হয় বলাই-মুক্তার। সরল-অনভিজ্ঞ মুক্তা যেভাবে বলাইয়ের সঙ্গে কাল্পনিক আখ্যান গড়ে তোলে রতি-মতির কাছে, অতখানি স্মার্ট মহিলা মুক্তা কখনোই নয়! রতি-মতির সংসারে মুক্তাকে রেখে বলাই পিঠটান দেয়। এরপর মুক্তাকে ঘিরে রতি-মতির সংসারে যে-জট পাকিয়ে ওঠে তার মনস্তাত্ত্বিক জট-জটিলতার উদ্‌ঘাটনে জ্যোতিরিন্দ্র বড়ো নিপুণ। এই জগতের মধ্যে এসে দাঁড়ালেই তো তিনি সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। মধ্যবিত্তের যৌনতা এবং অবক্ষয় তাঁর আখ্যানে সবচেয়ে বেশি জায়গা করে নেয়। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নিজের কথায়—'ঐ সেক্স এবং অবক্ষয়কে ছাড়িয়ে আমার ভেতরের এক সৌন্দর্যবোধ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।'[৭] রতি-মতি-দামিনী-মুক্তার ওই জীবনের ছবিতে সে-সৌন্দর্যবোধ কোথাও ফুটে উঠতে পেল কি? রতি-মতির সংসারে মুক্তার আশ্রয় পাওয়াটা যেমন অস্বাভাবিক মনে হয়, দামিনীরও ওই সংসারে সুদীর্ঘকালের আশ্রয় বড়ো অবিশ্বাস্য বলে বোধ হয়। কারণ, ওই বোবা-কালা-দামিনীর জন্যই তো রতি-মতির মা গলায় দড়ি দিয়েছিল! তাদের বাবা মনোহর কর্মকার তখন জোয়ান পুরুষ; রাণাঘাটে একটা মামলার সাক্ষী দিতে গিয়ে ভাতের হোটেলে দেখেছিল যুবতী দামিনীকে। রক্তে মনোহরের আগুন ধরে গিয়েছিল। নগদ টাকার বিনিময়ে ঝিয়ের কাজ ছাড়িয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল সংসারের কাজকর্ম করবার দোহাই দিয়ে। কিন্তু পাপ চাপা থাকেনি; স্বামীর অনাদর-অপমানে আর দামিনীর মুচকি হাসিতে অসহ্য বোধ করে অসহায়-অভিমানে রতি-মতির মা রান্নাঘরের কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়েছিল। রতি-মতি তখন না-হয় ছোটো ছিল। কিন্তু সংসারের কর্তৃত্ব এখন তো রতি-মতির হাতে এসেছে! অন্ধ মনোহর এখন অসুখে প্রায় পঙ্গু! অথচ এখনও দামিনীর হাসি, মাছ খাওয়া, সংসারের কাজ-কর্ম, খেতে দেওয়া—এসব কী করে রতি-মতি মেনে নেয়! যে রতি-মতি কিনা মেয়েদের সাজগোজ করা দেখলে বিরক্ত হয়; বিয়ের কথায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে বলে,—'মেয়েমানুষ পাপ, বুঝলে পিসি—মেয়েছেলে হল গে তোমার যাকে কয় আসল নরক!'—সেই রতি-মতিই কেন হাটের পথ থেকে বলাই-মুক্তাকে নিজেদের বাড়ির পথ চিনিয়ে দেয়, সেখানে গিয়ে তাদের হাট থেকে ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে—কিচ্ছু বোঝা যায় না। বয়সকালের মেয়ে, দেখতে-শুনতে ভালো, মুক্তাকে রেখে বলাই চলে যাবে জেনেও তারা মুক্তাকে আশ্রয় দেয়। মুক্তাকে ঘিরে তাদের দু-ভাইয়ের মধ্যে সংঘাত চূড়ান্ত আকার নিলে রতি যখন মুক্তার উদ্দেশে বলে,—'কাল সুয্যি ওঠার আগে ওটাকে তাড়িয়ে দেব'; তখন মতি বলে :

> তাই দাও, তাই দিও—ছি ছি, তুমি জগৎ কর্মকারের নাতি, মনোহর কর্মকারের ছেলে—একটা বাস্তুহারা মেয়ে, চাল নেই, চুলো নেই, বাপ-মার পরিচয় নেই—এইরকম একটা মেয়ে যদি—

কিন্তু, 'জগৎ কর্মকারের নাতি' না হয় বোঝা গেল, 'মনোহর কর্মকারের ছেলে' বলে কোন্ গৌরবের পরিচয় মতি দিতে চাইল? মনোহর কর্মকারের অসংযম এবং অশৈল আচরণের জন্যই তো তাদের সংসারটার এই দশা!

আখ্যানে সবচেয়ে বেশি অবিশ্বাস্য মনে হয় মুক্তার পক্ষে বলাইকে পথের মধ্যে দ্বিতীয় দফায় আবিষ্কার করা! রতির আত্মহত্যা, মতির কখনো তর্জন-গর্জন কখনো হাউ-হাউ কান্নায় অসহায় মুক্তা সে-রাতে শ্রীপুরের আশ্রয় ছেড়ে আবার পথে। পায়ে-পায়ে পার হয়ে এসেছে রাধাবল্লভপুরের হাট, ধূ ধূ মাঠ, মাঠ পেরিয়ে রাস্তা...। নতুন করে নিরাশ্রয়, ছিন্নমূল মানবীর প্রব্রজন শুরু হয়। কিন্তু এই পথেই সুধীরের ছুরিকাঘাতে সাংঘাতিক আহত বলাইকে আবারও আবিষ্কার করে মুক্তা। এত কাণ্ডের পরেও বলাইয়ের ওপর তার নির্ভরতা আর বিশ্বাস যেন অটুট থাকে। তাকে বাঁচাতে পাগলিনীপ্রায় মুক্তা অলৌকিকভাবে দেখা পায় এক ছইওলা গরুর গাড়ি, তার থেকে নেমে আসে এক সুন্দর পুরুষ—সে আসলে রতি-মতির ভাগ্নি সাবির স্বামী শিবকুমার। এই সাবি বা সাবিত্রীর সঙ্গেই শ্রীপুরে পরম সখ্য গড়ে উঠেছিল মুক্তার। দাদু মনোহরকে দেখতে নিশ্চিন্তপুর থেকে রতি-মতির বাড়িতে সাবি এসেছিল যে-গরুর গাড়িতে, সেই গাড়োয়ানই এখন গাড়ি নিয়ে চলেছিল শ্রীপুরে সাবিকে আনতে। এবার শিবকুমারও গাড়ির সঙ্গে চলেছে, যেহেতু রতির আত্মহত্যার মতো একটা দুর্ঘটনা সে-বাড়িতে ঘটে গেছে। গাড়োয়ান নিমেষে যেন চিনে নেয় মুক্তাকে। বলাইকে তুলে নিয়ে গাড়ি ঘুরে যায় বিষ্টুপুরের বাজারের দিকে। সেখান থেকে শিবকুমার বলাইকে মফিজ মিঞার লরিতে চাপিয়ে রাণাঘাট হাসপাতালে নিয়ে যাবে। মুক্তার নতুন ঠিকানা হয় নিশ্চিন্তপুর, সাবিত্রী-শিবকুমারের বাড়ি। সুস্থ হয়ে বলাই কলকাতায় পা রাখলেও এবার নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। কোথাও ঠাঁই না মেলায় এবং পেটের ভাতের জোগাড় করতে না পারায় বলাই নিশ্চিন্তপুরে এসে শিবকুমারের খেত-খামারে কাজ নেয়। কিন্তু সুধীর বলাইকে ছুরি মারল কেন? সেও বড়ো অবিশ্বাস্য কাহিনি! মুক্তাকে শ্রীপুরে রেখে বলাই ইতিমধ্যে ওয়াগন-ব্রেকারের দলে ভিড়েছিল। ওই দলে সদ্য পরিচিত সুধীরের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নিতে গিয়ে সে জখম হয়। জুয়ার আড্ডা থেকে অনেকগুলো টাকা সুধীর পকেট মেরেছিল। টাকাগুলো দেখে থেকেই বলাই লোভে পড়ে যায়। মুক্তার লোভ দেখিয়ে সুধীরকে সে পথে নামিয়েছিল। রাস্তায় সুধীরের কাছে টাকা কেড়ে নিতে যেতেই ওই বিপত্তি। কিন্তু আখ্যানের সূচনায় নিরীহ এক ফেরিওয়ালার যে দেখা মিলেছিল, তার ওই ছিনতাইবাজ, মারকুটে হয়ে ওঠার ছবি বিশ্বাস্য মনে হয় না। বলাইয়ের চারিত্রিক রূপান্তর দেখানোর পথটিকে ঔপন্যাসিক প্রায় উপেক্ষা করে গেছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, এরকম দুঃসাহসিক কাজে চরিত্রকে যুক্ত করতে হলে, তাকে যে-ধাতুতে গড়তে হয়, বাবরি চুলের বলাই দাসের মধ্যে সে-উপাদান কোথায় ছিল?

ছিন্নমূল মানুষকে নিয়ে রাষ্ট্রের যে-সংকট, সে-অভিমুখটির মাথা-তোলা চেহারা আখ্যানে কোথাও দেখা গেল না। একবার মাত্র আখ্যানে ওই প্রসঙ্গের উল্লেখে এমন কথা এসেছে যে, দফায়-দফায় পাকিস্তান ছেড়ে আসা মানুষগুলির জন্য সরকার আর কত করবে!

শুধুমাত্র অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়া যুবসমাজ, অবক্ষয়িত জীবন ও জীবিকা নিয়ে সামান্য যেটুকু উদ্বাস্তু মানুষজনের খোঁজ আখ্যানে এসেছে, তাতে রাষ্ট্রের সংকটাপন্ন চেহারাটি কোথাও স্পষ্ট হল না। বিপরীতে, রতি-মতির আশ্রয় ছেড়ে পথে নামার সময়, একলা রাতে পথ হাঁটতে মুক্তা নিরাশ্রয় মানুষজনকে নতুন উপনিবেশের নিশ্চিন্ত গৃহাশ্রয়ে থিতু হতেই দেখে; পরিপূর্ণ সুখের সংসারে সন্তান জন্মের শুভলগ্নে এয়োস্ত্রীদের উলুধ্বনি শোনে। সাবির মুখেও মুক্তা সরকারি সাহায্যে বাস্তুহারা মানুষগুলির নতুন আশ্রয়, গোরু-বাছুর, চাষের জমি-প্রাপ্তির কথা শুনেছিল।

কিন্তু নিশ্চিন্তপুরের মানুষের খোঁজ মিলল কি? শিবকুমারের শশা খেতের পাশের বাগানে বসে বলাই যদিও সাবির প্রশ্নের উত্তরে বলেছে, 'আমি—নিশ্চিন্তপুরের নতুন মানুষ...'; সে-উত্তর সাবির কাছেও যেন হালকা মনে হয়েছে। চাপা হাসির সঙ্গে সাবি বলেছে, 'হুঁ, নিশ্চিন্তপুরের মানুষ—আমরা তো জানি শিয়ালদার ফেরিওয়ালা—কিষির কাজ শিখল কবে!' খুরপি হাতে সোজা দাঁড়িয়ে উঠে বলাই বলে, 'আমার বাবার মতন অমন চমৎকার পাটক্ষেত নিড়াতে কেউ জানত নাকি—সেই বাপের বেটা আমি।' নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করতে বলাই আরও বলে, 'আর আমার ঠাকুরদার মত এতবড় ঘরামী সেদিন ছিল নাকি আমাদের তল্লাটে—তার নাতি আমি—।' কোথায় চাপা ছিল এ-পরিচয়ের উৎস এতদিন? গোটা আখ্যানে একবারও কি সে পশ্চাদ্‌ভূমিতে প্রোথিত শিয়ালদার ফেরিওয়ালার যাপিত জীবনকে চিহ্নিত করা গেছে? অথচ ছিন্নমূল মানুষের সত্তার গভীরে ওই ছেড়ে আসা জীবনের হতাশ্বাস লগ্ন হয়ে থাকারই কথা। মুক্তাকে যেমন তা ছুঁয়ে গেছে একাধিকবার।

তবু, নিশ্চিন্তির বোধ কি আখ্যান গড়তে পারল? মুক্তার জন্য এর মধ্যে জমে ওঠা টলটলে সহানুভূতির পাশাপাশি বলাইয়ের মন আর মতি নিয়ে কি কোনো সুস্থিরতার আশ্বাস তৈরি হয়? বরং মনে হয়, এরপর বলাই কতদিনে আবার কোনো অবৈধ অথচ সহজ রোজগারের ফিকির খুঁজতে অন্য জীবনের পথে পাড়ি দেবে তা দেখার! কারণ, প্রকৃতি-সান্নিধ্যে বলাইয়ের মনের যে আকস্মিক পরিবর্তন ইন্দ্রজালের মতো আখ্যানের একেবারে শেষে দেখা দেয়, তা আবার মিলিয়ে যেতে পারে বলে ভাবনা হয়। বলাইয়ের মনোগভীরে জমে থাকা ময়লা সাফাইয়ের কাজ আখ্যানকার যেন নিজের হাতে রাখতে সাহস না করে প্রকৃতি-পরিবেশের ওপর চাপিয়ে দেন :

> পুকুরপাড়ের বাসকঝোপ নড়ছে। ঝোপের ভিতর দুটি মুখ। খোঁপায় ফুল। জঙ্গলের জন্য শরীর দেখা যায় না। যেন পাতার ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে সুন্দর মুখ দুটো এদিকে এগিয়ে আসছে। হতভম্ব হয়ে গেল বলাই। ওরা যত এদিকে এগিয়ে আসছে, তার বুকের—মগজের যন্ত্রণাটা কমে যাচ্ছে। এতক্ষণ কী অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছিল মাথার ভিতর। আর তার মনে হল চমৎকার একটা গন্ধে জায়গাটা ভরে উঠেছে! মাটি, ঘাস, কচি শশা, বাতাবিলেবুর পাতা, আর ওই যে ওদের খোঁপার ফুলের গন্ধ মিশিয়ে গন্ধটা।

বুক ভরে সে গন্ধটা নেয়। যেন তার ভিতরের সব ময়লা কেটে যায়, পরিষ্কার হয়ে যায় মন; শরীরটা হাল্কা ঝরঝরে লাগছে।

—বলাই এখন 'দাদামশাই'। সাবির দেওয়া ওই নামেই এখন তার নিশ্চিন্তপুরের নতুন পরিচয়। খুরপি দিয়ে পেয়ারা-চারার চারপাশে মাটি খোঁড়ে এখন বলাই। তার চারপাশে 'যেন পাতার সরসর আর ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই পৃথিবীতে!' সমস্ত অনিশ্চয়তার নটেগাছটি এভাবেই মুড়িয়ে যায় আখ্যানে।

সূত্রনির্দেশ

১. নিতাই বসু, অনুষ্টুপ, প্রাক্ শারদীয় সংখ্যা, ১৪১৬

২. নারায়ণ সান্যালের 'অরণ্যদণ্ডক' উপন্যাসে বীরেন মৈত্র ঋতব্রতকে বলছে :

> ...আশ্চর্য এই উদ্‌বাস্তুদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে কেউ কিছু লিখল না। পঞ্চাশ লক্ষ লোক ঘর-বাড়ি-সমাজ-সংসার ছেড়ে চলে এল। দশ পনের বছর ধরে স্রোতের জলে ভেসে বেড়ালো—শিকড় গাড়ল না কোথাও। নতুন জমিতে, নতুন করে ওরা বাঁচতে চায়—কী তীব্র ওদের বাঁচার আকাঙ্ক্ষা। দরমা-ঘেরা খড়ের ঘরের অন্ধকারে জীবনকে ওরা খুঁজছে। অথচ ওদের সে জীবন-সংগ্রামের কথা দুনিয়া জানল না। আজকের সাহিত্যের দৃষ্টি পড়ল না ওদের দিকে। বাংলাদেশের সাহিত্যিক বৈচিত্র্যের খোঁজ করছেন ইতিহাসের পাতায়—পুরনো কলকাতার নথিপত্রে—সিপাহি বিদ্রোহের ইতিবৃত্তে; লেখবার বিষয়বস্তুর সন্ধানে তাঁরা দেশছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নাগা হিল্‌সে, সিন্ধুপারে।

৩. ১৩৬৭; মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা

৪. 'জল দাও', অন্বিষ্ট, ১৯৫০

৫. 'নক্‌সীকাঁথার কাহিনী', ১৯৫৫

৬. *বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন*, তাপস ভট্টাচার্য, পুস্তক বিপণি, ১৪১১

৭. 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে একটি সন্ধ্যা, সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত, অনুষ্টুপ, প্রাক্ শারদীয় সংখ্যা, ১৪১৬

With Best Compliments of

Lachipur Colliery (R) Employees' Co-op. Credit Society Ltd.

Regd. No. 314, Dated : 25/06/91
P.O. Kajoragram, Burdwan

Sl. No. 33

বঙ্কিম পরিবারের মেয়েদের কয়েকটি চিঠি

কল্যাণী ভট্টাচার্য

২০১৩-তে এসে আমরা বঙ্কিম-জীবনের ১৭৫ বছরে পদার্পণ করেছি। বঙ্কিম মারা গেছেনও বহুবছর হয়ে গেল। এত বছর ধরে বঙ্কিম নিয়ে আলোচনা হয়েছে বিস্তর; লেখালেখিরও অন্ত নেই। এত সেমিনার, এত আলোচনা-চক্র, এত প্রবন্ধ রচনার পরেও কিছু না বলা কথা থেকেই যায়। কখনো কোনো মুহূর্তে চোখে পড়ে বঙ্কিম জীবনের অনালোচিত অধ্যায়কে। তখন তাকে নিয়েই আলোচনা বিচার ও বিশ্লেষণের সিদ্ধান্তে আসা।

সম্প্রতি বঙ্কিম পরিবারের তিনজন নারীর চল্লিশটি চিঠি অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ও পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বঙ্কিমভবন গবেষণাকেন্দ্র কাঁঠালপাড়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদকদ্বয়ের দাবি হল বঙ্কিমভবন গবেষণাকেন্দ্র কাঁঠালপাড়ার দুর্লভ সংগ্রহ থেকে 'একগুচ্ছ অতি পুরাতন জীর্ণ চিঠি তাঁরা উদ্ধার করেছেন। আগ্রহ জাগে, ওই দুর্লভ সংগ্রহের মধ্যে বঙ্কিমজীবনের আরও কোনো অজানা তথ্য লুকিয়ে আছে কিনা।

এই পত্রাবলীর মধ্যে সাহিত্যগুণ আছে কি না তা তর্কসাপেক্ষ। চিঠিগুলি উনিশ শতকের বাংলাদেশের এক খ্যাতিমান পরিবারের মেয়েদের লেখা। এই চিঠিগুলি সেই পরিবারের অন্দরমহলে প্রবেশের হাতছানি দেয়। চিঠি তো শুধু যে লেখে তারই পরিচয় দেয় না, যাকে লেখে তারও পরিচয় দেয়। আবার চিঠির অন্তরালে লুকিয়ে থাকে তৎকালীন সমাজের ছবিও।

সংকলনের প্রথম চিঠি নন্দরাণী দেবীর। বঙ্কিমচন্দ্ররা চার ভাই। শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। তাঁদের যে নন্দরাণী নামে একজন বোন ছিল সে খবর আমরা ক-জন জানি? পিতা যাদবচন্দ্র ও মাতা দুর্গাদেবীর দ্বিতীয় সন্তান হলেন নন্দরাণী। জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণের পর তাঁর জন্ম হয়। নন্দরাণীর বিয়ে হয়েছিল শশিশেখর

মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। যাদবচন্দ্র নিজের বাড়ির কাছে নন্দরাণীর একটি বাড়ি তৈরি করে দিয়েছিলেন। নন্দরাণী বেশির ভাগ সময়েই সেখানে থাকতেন। মাঝে মাঝে স্বামীর কর্মস্থলে যেতেন। নন্দরাণীর ছেলের নাম কৈলাস। মায়ের মৃত্যুর পর কৈলাস বাড়িটি বিক্রি করে দেন। নন্দরাণীর তারিখহীন একখানি চিঠি এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চিঠিটি সঞ্জীবচন্দ্রের একমাত্র পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রকে* লেখা। জ্যোতিশচন্দ্রের স্ত্রী মোতিরাণীর চিঠিতে নন্দরাণীর নাম উল্লেখ আছে। মোতিরাণীর চিঠি থেকে জানা যায় নন্দরাণী, চট্টোপাধ্যায় পরিবারের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সেকালের প্রথা মতো ওপরে 'শ্রীশ্রী দুর্গা' লেখা এবং 'পরম কল্যাণীয়' বলে জ্যোতিশচন্দ্রকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং পত্রের শেষে 'শ্রী নন্দরাণী দেবী' লেখা রয়েছে। চিঠি থেকে জানা যায়, নন্দরাণী মাঘীপূজার আগে কাশীধামে গিয়েছিলেন এবং সেখানে চারমাস কাটিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন। চিঠিতে নন্দরাণী মায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তথ্য-প্রমাণে দেখা যায় বঙ্কিমজননী দুর্গাদেবীর মৃত্যু হয়েছিল ১৮৭৩ সালে। সুতরাং এ চিঠিটি তার আগেই লেখা। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে যাদবচন্দ্র দানপত্র করে তাঁর সম্পত্তি ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দেন। সম্পত্তি পৃথক হওয়ার পরবর্তীকালে চিঠিটি রচিত হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। চিঠিটির মধ্যে একটি কাঁঠাল গাছ ও সজনে গাছের উল্লেখ রয়েছে। এই দুটি গাছকে কেন্দ্র করে অশান্তিরও ইঙ্গিত রয়েছে। চট্টোপাধ্যায় পরিবার পৃথক-অন্ন হলেও ছোটো খাটো কারণে শান্তি ও সম্প্রীতি যে বিঘ্নিত হতো এই চিঠিটি তার সাক্ষ্য দেয়।

দ্বিতীয় পত্র-লেখিকা বঙ্কিমচন্দ্রের পত্নী রাজলক্ষ্মী দেবী। সেকালে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের এগারো বছর বয়সে তাঁর প্রথমবার বিয়ে হয়েছিল, পাত্রীর বয়স পাঁচ বছর, নাম সোহিনী। সোহিনী সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন। এগারো বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হলে বঙ্কিম রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিয়ে করেন। রাজলক্ষ্মী দেবীর বাবার নাম সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা মোহিনী দেবী। রাজলক্ষ্মী দেবী খুব সুন্দরী ছিলেন না, তবে তাঁর নানা গুণ ছিল। বারো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল এবং দীর্ঘ ৩৪ বছর তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ঘর করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র একসময় বলেছিলেন চাকরি তাঁর জীবনের অভিশাপ এবং তাঁর জীবনের আশীর্বাদ হলো বিয়ে করা। নবীনচন্দ্র সেনকে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছিলেন 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের সূর্যমুখীর চরিত্র

*এই নামের বানানটি নিয়ে কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তি আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের চিঠিতে 'যতীশচন্দ্র' বানানটি ব্যবহৃত হলেও বাকি সবাই 'জ্যোতিশচন্দ্র' বানানটিই ব্যবহার করেছেন।

রাজলক্ষ্মী দেবীর আদলে তৈরি। অন্যত্র তিনি আরও বলেছেন, তাঁর জীবনচরিত তাঁর স্ত্রীকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। দুঃখের বিষয়, কোনও বঙ্কিমজীবনচরিত থেকেই রাজলক্ষ্মী দেবী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ৭১ বছর বয়সে রাজলক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু হয়েছিল।

আলোচ্য পত্র সংকলনে রাজলক্ষ্মী দেবীর ৭ খানি পত্র সংকলিত হয়েছে। সবকটি পত্রই জ্যোতিশচন্দ্রকে লেখা। রাজলক্ষ্মী দেবী আর বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁদের তিন কন্যা—শরৎকুমারী, নীলাব্জকুমারী ও উৎপলকুমারী। বঙ্কিম ও রাজলক্ষ্মী দেবী জ্যোতিশচন্দ্রকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন।

প্রথম চিঠিতে রাজলক্ষ্মী দেবী জ্যোতিশচন্দ্রকে 'প্রাণাধিক পুত্র' বলে সম্বোধন করেছেন। চিঠিটি সম্ভবত ১৮৮০ সালের ১লা বৈশাখ লেখা। সম্ভবত বলছি এই কারণে যে সম্পাদকদ্বয় চিঠির উপরে লেখা '১৮৮০' সালকে জিজ্ঞাসার চিহ্নে চিহ্নিত করেছেন। ১৮৮০ সালে বঙ্কিম স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তখন সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী থেকে জানা যায় ১৮৭৯ সালে বঙ্কিম কাঁঠালপাড়ার বাসা ত্যাগ করে হুগলির পাশে চুচুড়ায় একটি বাড়ি ভাড়া করে সপরিবারে বাস করছিলেন। পৈতৃক বিষয় সংক্রান্ত কারণে বঙ্কিম স্বগৃহ ত্যাগ করেন। কিন্তু অন্যত্র বাস করলেও যে কাঁঠালপাড়ার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি রাজলক্ষ্মী দেবীর চিঠি আর একবার সে কথাই জানালো। চিঠি থেকে জানা যায় বঙ্কিমের অফিস বন্ধ থাকবে মনে করে রাজলক্ষ্মী দেবী কাঁঠালপাড়া যাওয়া মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু অফিস বন্ধ না থাকায় কন্যা শরৎকে একা রেখে তিনি যেতে পারলেন না। এই চিঠিটিতে বঙ্কিমের অপর দুই কন্যা নীলাব্জকুমারী বা উৎপলকুমারীর নাম উল্লেখ নেই। চিঠির নিচে 'শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী' লেখা হয়েছে।

দ্বিতীয় চিঠিটির তারিখ ১২৯৮, ১৮৮২, তলায় কোনো স্বাক্ষর নেই। চিঠিটিতে মামুলি কথাবার্তা। রাজলক্ষ্মী দেবীর সংসারে 'কাজের লোকের' কষ্ট, তাই জ্যোতিশকে লোক পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছেন। লোক পাঠানোর খরচ আপাতত জ্যোতিশচন্দ্র দিলেও তিনি যখন কাঁঠালপাড়া যাবেন, হাতে হাতে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তৃতীয় চিঠিটি ১৮৯৩ সালে লেখা। নিতান্তই পারিবারিক চিঠি। সম্বোধনে এবার আর 'প্রাণাধিক পুত্র' নেই, 'পরম কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'। দ্বিতীয় চিঠির পর প্রায় দশ বছর ব্যবধানে এই চিঠি—সময় কি 'প্রাণাধিক পুত্র'কে স্থানচ্যুত করেছে?

চতুর্থ চিঠিটিতে উপরে উল্লিখিত ঠিকানা ৫নং প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়ের গলি। বঙ্কিম-জীবনের শেষ অধ্যায় এই বাড়িতে কেটেছে। চিঠির তারিখ লেখা ১৮৯৭। এখানেও সম্পাদকদ্বয় জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়েছেন। ১৮৯৭ সাল হলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়াণের পরে এ চিঠি রচিত। চিঠিটি বৈষয়িক। এখন আর 'প্রাণাধিক পুত্র' নয়, 'কল্যাণবরেষু'। জ্যোতিশচন্দ্রের বেতনবৃদ্ধির জন্য সন্তোষ প্রকাশ করে লেখা হয়েছে, ''তোমার মুড়োগাছার ১২৫ টাকা লইয়া নলীন রাজনের দেনাশোধ দিয়াছে। নীলমণির কাছে আরও কিছু পাওয়া যাইবে। সে কলকাতায় আসিলে তাহার কাছে সে টাকা চাইব।'' 'মুড়াগাছা' হল বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত একটি মৌজা। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রদের দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল।

৫নং, ৬নং এবং ৭নং চিঠি অতি সংক্ষিপ্ত। ৫নং চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্রের অসুস্থতার কথা উল্লেখ আছে। সে কারণেই জ্যোতিশচন্দ্রের চিঠি পেয়েও বঙ্কিম উত্তর লিখতে পারেন নি। রাজলক্ষ্মী দেবী জানাচ্ছেন বঙ্কিম এখন ভালোই আছেন এবং একটু সুস্থ হলেই তিনি উত্তর দেবেন। ৬নং চিঠিটি এই পত্রাবলীর মধ্যে একটু স্বতন্ত্র। সম্বোধন 'চিরজিবেষু' এবং শেষে তোমার 'সেজখুড়িমা'। এই চিঠিতে 'চিরজিবেষু' বানান ভুলটি চোখে পড়ার মতো। সেকালের দিনে অনেক সময়েই একজনের চিঠি আর একজন লিখে দিতো। শোনা যায় বঙ্কিমের শেষজীবনে বঙ্কিমের সমস্ত চিঠির উত্তর রাজলক্ষ্মী দেবী লিখে দিতেন। বঙ্কিম শুধু স্বাক্ষর করতেন। তবে কি এই চিঠির পত্রলেখিকা সেজখুড়িমা নিজের হাতে এই পত্রটি লেখেন নি? মূল পাণ্ডুলিপি না দেখার কারণে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। ৭নং চিঠিটিও অতি সংক্ষিপ্ত। শুধু জানা গেল জ্যোতিশচন্দ্রকে টাকা পাঠানো হয়েছে। সেই টাকা জ্যোতিশচন্দ্র পেয়েছেন কিনা জানা না থাকায় আরও দশ টাকা পাঠানো হয়েছে। শেষ হয়েছে 'তোমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী রাজলক্ষ্মী দেবী' বলে।

এই সংকলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক সংকলিত ৩২টি চিঠি হচ্ছে জ্যোতিশচন্দ্রের পত্নী মোতিরাণী দেবীর। মোতিরাণী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সঞ্জীবচন্দ্রের একমাত্র পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। জ্যোতিশচন্দ্রের বয়স তখন ১৪ বছর এবং মোতিরাণীর বয়স আনুমানিক ৫/৬ বছর।

মোতিরাণীর পিতৃগৃহ ছিল হাওড়ার সালকিয়াতে। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিয়েতে জাঁকজমক করতে বারণ করেছিলেন। তিনি সঞ্জীবচন্দ্রকে চিঠিতে লিখেছিলেন, ''আমার মতে জ্যোতিশের বিবাহ দুই বৎসর পরেও ভাল, তথাপি ঋণ কর্তব্য নহে।'' কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র কথা শোনেন নি। হাতির পিঠে চড়ে জ্যোতিশচন্দ্র বিয়ে করতে যান। বিয়ের পরেও জ্যোতিশ চাকরি করতেন না। সঞ্জীবচন্দ্রের মতোই তাঁর চাকরি করার ইচ্ছা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রই জ্যোতিশচন্দ্রের একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

এই সংকলনে মোতিরাণীর ৩২টি চিঠি সংকলিত হয়েছে। এই চিঠিগুলিতে এক প্রোষিতভর্তৃকা নারীর ব্যাকুল বিরহবেদনা প্রকাশিত হয়েছে। পাঁচটি সন্তান ও শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে সংসার করার ছবি ফুটে উঠেছে। তৎকালীন যৌথ পরিবারের ছবি এই চিঠিগুলিতে ধরা পড়েছে। এই সব পরিবারের ভাব-ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, স্বার্থপরতা, কলহ-কোন্দল চিঠিগুলিতে সবই আছে। সংকলিত এই চিঠিগুলির তাৎপর্য দূর-প্রসারিত, কারণ এই পত্রাবলী কোনো সাধারণ পরিবারের নয়; ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারের। মোতিরাণীর এই চিঠিগুলিতে ব্যক্তি মোতিরাণীর সুখ-দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবারের অন্দরের কাহিনিও দৃশ্যমান হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাবা যাদবচন্দ্র ছেলেদের পৃথক-অন্ন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পৃথক হলেও তাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কমে নি। চাকুরিজীবনে প্রতিষ্ঠিত বঙ্কিমচন্দ্র যে সঞ্জীবচন্দ্রের পরিবারের কতখানি ব্যয়ভার বহন করতেন, চিঠিগুলি থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ৮নং পত্রে দেখি সঞ্জীবচন্দ্রের পেটের পীড়ার জন্য 'সেজকাকা ঔষধ পাঠাইয়াছেন।' ১২নং পত্রে রয়েছে, 'ইতিমধ্যে একবার সেজকাকা আসিয়াছিলেন, আসিয়া তিনদিন থাকেন। ১ মন কলাই, ২০ সের ময়দা, ৮ সের ঘৃত, ৩ সের লবণ কিনিয়া দেন ও বাবাকে ৬২ টাকা নগত খরচের জন্য দিয়া যান।'' ২৪ নং পত্রেও রয়েছে ''সংসার খরচ সম্পর্কে সেজোকাকাকে সুরেশ পত্র লেখে তাহাতে তিনি সমস্ত দ্রব্য আনাইয়া দিতে লিখিয়াছেন তাহাতে সুরেশ ১০ দিনকার সমস্ত দ্রব্য

আনাইয়া দিয়াছে আর বাজার খরচের জন্য সেজোকাকা ৪ টাকা পাঠাইয়াছেন।''

বঙ্কিমচন্দ্র রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিয়ে করার পরে চাকুরিস্থলের প্রায় সর্বত্রই তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছেন। জ্যোতিশচন্দ্র যে মোতিরাণীকে সঙ্গে নিয়ে যান নি, বঙ্কিমচন্দ্রের তাতে ঘোরতর আপত্তি ছিল। ২০নং পত্রে মোতিরাণী লিখছেন, ''সেজোকাকা কল্য আসিয়াছেন, অদ্য থাকিবেন... তুমি লইয়া যাইতে বিলম্ব করিতেছো তজ্জন্য তাহার অতিশয় রাগ।'' ২৩নং পত্রেও এই বিষয়টি রয়েছে : ''সেজোকাকা পত্র লিখিয়াছেন যে তিনি আর সংসার খরচ দিবেন না তাহার কারণ তুমি আমাদের লইয়া না যাওয়া।'' শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নন, জ্যোতিশচন্দ্রের এই আচরণে সকলেই বিরক্ত : ''ছোটকাকা যাইবার সময় বলিলেন, যে সে ছোক্‌রা লইয়া যাইবে না, সে কাকাদের গলায় ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে।''

এই উদাহরণগুলি প্রমাণ করে যে কর্তব্যপরায়ণ বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের পরিবারকে কতটা সাহায্য করতেন।

তবু তো অভাব ঘোচে না, ৩নং পত্রে মোতিরাণী লিখছেন, ''এখানে সংসার খরচের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। কোনদিন বাজার হয়, কোনদিন হয় না।'' ৪নং পত্রে আছে মোতিরাণীর অসুস্থ পুত্র চিরঞ্জীতকে পুরনো চালের ভাত খাওয়াতে হবে, চালের জন্য মোতিরাণী ছোটখুড়ি অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্রের স্ত্রীকে বললেন, কিন্তু চাল মিলল না। ''সেজঠাকুরপো বলিলেন যে তবে তোমরা আপনারা চাল আনাও অতএব আমি বড়ই আতান্তরে পড়িয়াছি কোথা হইতে চাল আনাইব অদ্য কয়দিন বড়বাবুর বাড়ি হইতে চাল আনাইয়াছি ... কিন্তু কল্য হইতে ত কোন উপায় নাই।'' বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের পরিবারকে সাহায্য করতেন কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণ একেবারেই সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। ২২নং চিঠিতে দেখি : ''মা নিজে গিয়া জেঠামহাশয়ের নিকট তোমার অসুখের কথা সমস্ত বলিলেন, কিন্তু তিনি কোনো মতেই স্বীকার পাইলেন না যে তাহার নিকট টাকা আছে।'' মোতিরাণীর বাস্তব বুদ্ধি ছিল প্রখর। বর্ণনাচ্ছলে তিনি চিঠির মধ্যে একটি বাস্তব সত্যকে তুলে ধরেছেন : ''এবার ঝুলনের সময় সেজোখুড়ি এখানে ছিলেন ... আমি তাহার কথা কোনোমতে কাটাইতে পারি নাই বরং মার কথার অমত হইতে পারি তথাপি সোজেখুড়ির কথার অমত হইতে পারিব না কেননা তাহা হইলে তিনি চটিবেন তাহাকে চটাইলে সেজোকাকাকে চটান হইবে। সেজোকাকা চটিলে আমাদের আর দাঁড়াইবার স্থান নাই।''

মোতিরাণীর পরিবারে অভাব ও দারিদ্র নিত্যসঙ্গী। ''এখানে সংসার খরচের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। কোনদিন বাজার হয় কোনদিন হয় না।'' জ্যোতিশচন্দ্রকে তিনি চিঠিতে অনুযোগ করেছেন, ''তুমি একটু মনে ভাবনা যে বৃহৎ বাড়িতে তিনটি স্ত্রিলোক ... গুলি ব্যয়রামি ছেলে লইয়া কি প্রকারে বাস করিতেছি।''

মোতিরাণীর চিঠিগুলির মধ্যে এক বিরহিনী নারীর বেদনা ও হাহাকার ফুটে উঠেছে : ''আমি তোমাকে ৮ মাস ছেড়ে আছি কিন্তু আর আমাকে এমন করিয়া রাখিওনা যেমন করিয়া পার আমাকে লইয়া যাও'', অথবা ''রাধাবল্লভ জানেন! আমি কিরূপ দিবারাত্রি কাটাইতেছি, আমার একদিনে এক বৎসর হইয়াছে। যদ্যপি ঈশ্বর পাখি হইবার কোন উপায় করিয়া দিতেন আমি পাখি হইয়া তোমার নিকট যাইতাম।''

মোতিরাণীর কাব্যিক মনটিও ধরা পড়ে চিঠিতে : ''তোমার মনে আছে জ্যোৎস্না রাত্রে দুইজনে ছাতে যাইতাম। জ্যোৎস্নার আলোতে তোমার মুখ দেখিতাম। এখনও সেই জ্যোৎস্না। তুমি কোথা... আমি কোথা।'' ''সুখ আমার কোথাও নাই তোমাকে ছাড়িয়া গোলক বৈকুণ্ঠেও নাই।''

আগেকার দিনে এরকম কত প্রোষিতভর্তৃকা নারীর জীবন ছিল হাহাকারে ভরা। চট্টোপাধ্যায় পরিবারের মাতা, এরকম একটি পরিবারের বধূ হয়েও মোতিরাণী তার ব্যতিক্রম ছিলেন না।

বাংলাদেশে শাশুড়ি-বউ-এর খণ্ডযুদ্ধ চিরকালীন ব্যাপার। চট্টোপাধ্যায় পরিবারও তার ব্যতিক্রম নয়। বাঙালি ঘরের এই দ্বন্দ্ব-চিত্রটি মোতিরাণীর চিঠিতে স্পষ্ট। স্বামী জ্যোতিশচন্দ্রকে তিনি লিখছেন : ''আমার জন্য তোমার মা কাশী যাইতেছেন... বোধ হয় এ সম্বন্ধে তোমার বাবাও অদ্য পত্র লিখিবেন... তোমায় এই শেষ পত্র লেখা বাবাকে পর্য্যন্ত এমন করিয়া তুলিয়াছেন যে তিনি পর্য্যন্ত মার সঙ্গে যোগ দিয়াছেন... তোমার মা যদ্যপি যথার্থই কাশি যান তাহা হইলে আমি তোমার নিকট ও জগতের নিকট চিরকলঙ্কিনী হইব।'' এই একই অভিযোগ ২৬নং পত্রেও রয়েছে : ''মা যে সংসারের কি ভয়ানক অবস্থা করিয়াছেন তাহা বলিবার নহে।'' ২৭নং পত্রে লিখছেন, ''আমি কোন কথা বাবাকে বলিতে পারিনা, তাহা হইলে মা ঠিক তাহার বিপরীত করিবেন।''

মোতিরাণীর লিখিত দুটি চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ছোটো মেয়ে উৎপলকুমারীর মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। উৎপলকুমারী দেখতে খুব মিষ্টি ছিলেন। সবাই আদর করে 'পলা' বলে ডাকত। তার বিয়ে হয়েছিল মতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। মতীন্দ্র অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ছিলেন। মোতিরাণীর ১১নং চিঠিতে পলার মৃত্যু সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। সেখান থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল : ''গত কল্য মঙ্গলবার বাঁশতলার বাটিতে পলা গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। সেই নিমিত্ত বুধবার রাত ১১টায় রাখাল বাবাকে বটকৃষ্টকে দিয়া লইতে পাঠাইয়াছিল। সে বলিয়া পাঠায় আমি একলা সেজবাবুকে সামলাইতে পারিব না। পলা মতীন্দ্রের জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সে পিতামাতাকে পত্র লিখিয়া মরে। ঐ পত্র পুলিশে লইয়া যায়। এক্ষণে ঐ পত্র সেজকাকার নিকট পাঠাইয়াছে।''

এ প্রসঙ্গে ২৯নং পত্রে মোতিরাণী আবার লিখছেন, ''সেজকাকা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন পলার মৃত্যু কিরূপে হইয়াছে জানিতে ... পলা গলায় দড়ি দিয়া মরে নাই। ... সে মরিবার পর ডাক্তার সাহেব আসিয়া তাহাকে কাটিয়া দেখিয়াছিল সে বিষ খাইয়া মরিয়াছে।'' মোতিরাণীর চিঠি থেকে আরও জানা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের পত্নী রাজলক্ষ্মী দেবীর বারো হাজার টাকার গহনা পলার কাছে ছিল। দুশ্চরিত্র মতীন্দ্র সেই গহনা নিতে চাইলে পলা দিতে অস্বীকার করে। সে কারণেই পলাকে মরতে হল। মতীন্দ্রর বাড়ির কাছে যে বিনোদ ডাক্তার আছে মতীন্দ্র তার কাছ থেকে বিষ নিয়ে ওষুধ বলে পলাকে খাইয়েছে।

বঙ্কিমকন্যা উৎপলকুমারীর মৃত্যু সে যুগে রীতিমত চাঞ্চল্যকর ঘটনা হয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে বঙ্কিম মতীন্দ্রকে আইনের চক্ষে দোষী সাব্যস্ত করেন নি। শোনা যায় মতীন্দ্রর পিতামহর অনুরোধেই তিনি এ কাজ করেছিলেন। কিন্তু শুধুই কি তাই? পারিবারিক সম্মান রক্ষাও কি বঙ্কিমের মনে স্থান পায় নি? বঙ্কিম জীবনীকার লিখছেন, ''পরে ব্যথিত পিতার কণ্ঠে অনেকবার শোনা গেছে তাঁর কন্যার বিষপানে মৃত্যুর কথা। বলতেন, আমিই কুন্দনন্দিনীকে বিষ খাইয়ে মেরেছি, আর আমার অদৃষ্টে আমার মেয়ে বিষ খেয়ে মরেছে।''

এই পত্রাবলী থেকে যেমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় তেমনি অনেক কৌতুকের ছবিও চোখে পরে। ১৭নং পত্র থেকে জানা যায় সঞ্জীবচন্দ্রের পরিবারে রোজ ৬ সের দুধ বরাদ্দ কিন্তু তার

অধিকাংশই সঞ্জীবচন্দ্র খান। মোতিরাণীর ভাষায়, ''বাবা খান দেড়সের, মা খান আধসের বাকি দুধ ছেলেরা খায় আমি দুই চারিদিন অন্তর ১ পোয়া করিয়া খাই।'' মজা শুধু এখানেই নয়, আরও মজার কথা হল : ''বাবার পেটের অসুখ বেশ সারিয়াছিল আবার কল্য হইতে পুনরায় পীড়া দেখা দিয়াছে তাহার কারণ অদ্য দিন আষ্টেক হইল আবার দুধ খাইতেছেন... এই কয়দিন হইতে একেবারে দুই সের করিয়া দুধ খাইতেছেন তাহাও ক্ষীর করিয়া না হইলে খান না।''

পুত্রবধূর বিরহযন্ত্রণা লক্ষ করে সঞ্জীবচন্দ্রের উক্তি আরও কৌতুককর : ''বাবা আমাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়াছেন, তিনি আমাকে বলিলেন যে সেজকাকার নাম করিয়া সে বই লিখিয়াছে তাহার মাথা লিখিয়াছে এই কথায় আমি অতিশয় আশ্চর্য হইয়াছি। তিনি এই কথা আমাকে কেন বলিলেন। কৃষ্ণকান্তের উইল পড়িয়াছিলাম তাহাতে ভ্রমরের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল বাবা হয়তো মনে করিয়াছেন যে আমি তাহার নকল করিতেছি।''

সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্রবধূর প্রতি স্নেহশীল হৃদয়েরও পরিচয় পাওয়া যায় ৩২নং পত্রে। বধূমাতা দুধ খায় না বলে তিনিও দুধ খেতে চান না। ৩২নং পত্রে রয়েছে, ''আমি দুধ খাই না বলিয়া তিনিও দুধ খান না।''

৩২নং পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্রের শ্রাদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায় : ''ঠাকুরদাদার শ্রাদ্ধে নৈহাটি, ভাটপাড়া, কাঁটালপাড়া ব্রাহ্মণ খাইয়াছে সব সমস্ত ব্রাহ্মণ হইয়াছিল লুচি, ছোলার ডাল, কপি বেগুণ খাদ্য তালিকায় ছিল।''

এই আলোচনার শেষে এসে পৌঁছে মনে হয় এই চিঠিগুলি শুধু নানা তথ্যের আকরই নয়, চিঠিগুলি আমাদের নতুন করে ভাবায়ও। এ কোন মেয়েদের আমরা দেখি যাদের বাক্য বিন্যাসে বিরতি চিহ্নের ধারণা নেই, যারা বানান ভুল সম্পর্কে অবহিত নন। উনিশ শতকের মধ্যভাগে সাধারণ পরিবারের গৃহবধূদের ক্ষেত্রে এই অজ্ঞতা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই চিঠিগুলি যাঁরা লিখেছেন তাঁরা তো সাধারণ পরিবারের গৃহবধূ নন। তাঁরা এমন একটি পরিবারের যে পরিবারে শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বুদ্ধিজীবীরই অবস্থান নেই, যেখানে রয়েছেন একাধিক জ্ঞানী-গুণী মানুষ। যাদবচন্দ্র ডেপুটি রেজিস্ট্রার। শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র সকলেই সরকারি চাকুরির উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। আবার বঙ্কিমচন্দ্র শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে নন, উনিশ শতকের বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতিতে, চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র নারী-পুরুষের সাম্যের কথা বলেছেন। 'সাম্য' প্রবন্ধে তিনি একাধিক বার নারী-পুরুষের সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন : ''মনুষ্যে মনুষ্যে সমান অধিকার বিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে কাজে পুরুষের অধিকার আছে স্ত্রীগণেরও সেই কাজে অধিকার থাকা সঙ্গত।'' নারী পুরুষের অধিকারের সাম্য নিয়ে সে যুগে বঙ্কিমের মতো কে ভেবেছেন? শুধু অধিকারের সাম্য নয়, নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তিনিই আবার নিজগৃহে অন্তঃপুরচারিণী নারীদের সম্পর্কে এত নীরব কেন? একখানি বইও তিনি জননী, জায়া, ভগিনী অথবা দুহিতাকে উৎসর্গ করেন নি। যে বঙ্কিম মেয়েদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁর পরিবারের মেয়েরা কেন অন্তরালে রয়ে গেলেন? প্রদীপের নিচে এত অন্ধকার কেন? বঙ্কিম পরিবারের মেয়েরা অন্তঃপুর-জীবনের সুখ-দুঃখ, ভাব-ভালোবাসা, কলহ-কোন্দল নিয়ে শুধুই ব্যস্ত কেন? অন্তঃপুরের বাইরের বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের কোনো খবরই তাঁদের উতলা করতে পারে নি।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক। তাঁর কাঁঠালপাড়ার বাড়ি থেকে 'প্রচার' ও 'ভ্রমর' নামে আরও দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। বঙ্কিম পরিবারের কোনো মেয়ের কোনো লেখাই এই সব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদকদ্বয়ের সঙ্গে বঙ্কিমের হৃদ্য সম্পর্ক। চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনীর উচ্চশিক্ষার সাফল্যে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দিত এবং গর্বিত। কিন্তু নিজের পরিবারের মেয়েদের তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। মেয়েদের তিনি পারিবারিক প্রথামতো বাল্য বিবাহ দিয়েছিলেন। বঙ্কিম পরিবারে সদর ও অন্দরের বিভাজন স্পষ্ট। এই বিভাজনকে দূর করে জীবনের রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের আলোয় মেয়েরা বেরিয়ে আসতে পারেননি।

বঙ্কিম জীবনীকার ও সমালোচক শিশিরকুমার দাশ তাঁর গ্রন্থের শিরোনামে তাকে চিহ্নিত করেছেন 'শৃঙ্খলিত-শিল্পী' হিসেবে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন জীবনসত্য সন্ধানী বঙ্কিমের শিল্পীসত্তা সমাজের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ভালো-মন্দ ঔচিত্য-অনৌচিত্য, বিধি-নিষেধের লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করতে গিয়েও শেষপর্যন্ত বার বার পিছিয়ে এসেছে। ব্যক্তি-বঙ্কিমের ক্ষেত্রেও এরকম হওয়া আদৌ অসম্ভব নয়। আসলে শিল্পীসত্তা তো আর ব্যক্তিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই শত আমি-র আবরণ। পারিবারিক ঐতিহ্য সময় সময় মানুষের সামাজিক অবস্থানকে নিয়ন্ত্রণ করে। এমনও হতে পারে ব্যক্তি বঙ্কিম তাঁর সময়ের সামাজিক অনুশাসনের বাইরে যেতে আদৌ রাজি ছিলেন না। ধর্মতত্ত্বের গুরুরূপী বঙ্কিম তো একদিনে গড়ে ওঠেননি। এই পত্রগুচ্ছ আর একবার সেই কথাই মনে করায়।

সহায়ক গ্রন্থ

১. *বঙ্কিম পরিবারের মেয়েদের চিঠি*, সম্পাদনা অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমভবন গবেষণা কেন্দ্র, কাঁঠালপাড়া, নৈহাটি, জানুয়ারি ২০১৩

২. *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, চতুর্থ মুদ্রণ ১৩৭৬

৩. *বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী*, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৯১

পত্রপত্রিকা

১. 'অনুষ্টুপ', সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা, বর্ষ ৪৭ দ্বিতীয় সংখ্যা ২০১৩

বাঙালি মুসলিম নারীর প্রগতিচিন্তার প্রতীক ‘বেগম’ পত্রিকা

আমিনুল ইসলাম

মুসলমান লেখকদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ কিছুটা বিলম্বিত, কিন্তু সেটাকে খুব বেশি বিলম্ব বলা যায় না। মীর মশারফ হোসেনের ‘রত্নাবলী’ (১৮৬৯) প্রকাশিত হয়েছিল প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ (১৮৫৮) প্রকাশিত হবার এক দশকের মধ্যেই। ‘রত্নাবলী’-কে রম্য উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও হাসির উপাদান খুব কম ছিল। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনাসমূহ অনেকটা সেই গোত্রের। তাছাড়া স্মরণ করা যেতে পারে, বাংলা ভাষায় সাময়িক পত্রের সম্পাদক হিসেবে যার নাম আমরা প্রথম মুদ্রিত হতে দেখি তিনি গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। ‘বাঙ্গাল গেজেটি’ নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। পত্রিকাটি ১৮১৮ সালের ১৫ মে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকাটি প্রকাশের বারো বছর পরে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় শেখ আলিমুদ্দিন সম্পাদিত ‘সমাচার সভারাজেন্দ্র’। এটি ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল। তাহেরুন্নেসা ছিলেন প্রথম মুসলমান মহিলা লেখক যিনি আধুনিক গদ্য লিখেছেন। তাঁর দীর্ঘ চিঠির ধরনে লেখা ‘বামাগণের রচনা’ ১৮৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যা ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহেরুন্নেসা তাঁর রচনায় নারীশিক্ষার আবেদন জানান। তিনি বোদা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি আর কিছুই জানা যায় না। ১৮৯৭ সালে ‘বামাবোধিনী’-র জুন সংখ্যায় লুৎফুন্নেসা নাম্নী আরো একজন মুসলমান মহিলা লেখকের কবিতা ছাপা হয়, যিনি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে পাস করেছিলেন। কবিতাটির নাম ছিল ‘বঙ্গীয় মুসলমান মহিলাদের প্রতি’।

তবে আধুনিক মুসলিম সমাজের প্রথম প্রজন্মের কবি ছিলেন মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (১৯০৬-১৯৭৯) এবং সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)। তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী মহিলা কবি যেমন কমিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩), প্রিয়ংবদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৪) এবং লজ্জাবতী বসু (১৮৭৩-১৯৪২)-র মতো ঐতিহ্যের কবিতা রচনা করে গেছেন। বাক্যরীতিতে হিন্দু এবং মুসলিম ভদ্রমহিলারা ছিলেন খুব নিকটবর্তী। এক্ষেত্রে বস্তুত দুটি নিকটবর্তী সংস্কৃতি একস্থানে এসে মিলেছে। কিছু সাংস্কৃতিক উপাদান হয়তো ভিন্ন ছিল। যেমন সুফিয়া কামাল যেখানে ঈদকে স্বাগত জানাচ্ছেন অথবা ব্যবহার করছেন ‘তসলিম’, কামিনী রায় সেখানে ব্যবহার করছেন ‘নমস্কার’। কিন্তু রচনারীতিতে, আবেগে, কল্পনায়, বিষয় নির্বাচনে অধিকাংশ কবিতাই ছিল একই গোত্রের।

এইভাবে কিছু ভদ্রমহিলা যখন কবিতার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশে সচেষ্ট, তখন কিছু মহিলা তাঁদের শ্রম নিয়োজিত করেছিলেন পত্রিকা প্রকাশ এবং সম্পাদনায়। তবে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলিম ভদ্রমহিলাদের চেয়ে ব্রাহ্ম ও হিন্দু এবং উত্তর ভারতীয় মুসলিম মহিলাদের সাফল্য অনেক বেশি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই মহিলাদের জন্য তাঁরা উচ্চমানের পত্রিকা প্রকাশ করতেন, যেমন—বঙ্গমহিলা, বামাবোধিনী, মহিলা, অবলা-বান্ধব, খাতুন, তাহজিবুন নিশওয়ান, পর্দানশীন ও ইসমত প্রভৃতি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : ‘‘কেবলমাত্র গ্রন্থ-রচনাতেই নয়, সাময়িকপত্র-সম্পাদনেও বঙ্গ মহিলারা ধীরে ধীরে কম কৃতিত্ব অর্জন করেন নাই। বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর হইতে দেশে সর্বত্র ক্রমশ স্ত্রীশিক্ষা প্রসার পাইতে থাকে। মহিলাকুলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি নিমিত্ত, তাঁহাদের রচনাবলী প্রকাশের জন্যও বটে, স্ত্রী পাঠ্যবিষয় সম্বলিত পত্র-পত্রিরাও ক্রমশ দেখা দিতে লাগিল। এগুলির মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত ‘মাসিক পত্রিকা’ (আগস্ট ১৮৫৪), মজিলপুর নিবাসী উমেশচন্দ্র দত্তের মাসিক ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’ (আগস্ট ১৮৬৩) ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত পাক্ষিক ‘অবলা-বান্ধব’ (২২ মে ১৮৬৯) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীর আরও কয়েকখানি সাময়িকপত্র : রেঃ এস.সি. ঘোষ সম্পাদিত ‘জ্যোতিরিঙ্গণ’ (মাসিক), জুলাই ১৮৬৯। ঢাকা হইতে প্রকাশিত ‘নারী-শিক্ষা পত্রিকা’ (মাসিক), অক্টোবর ১৮৭০। বরিশাল হইতে প্রকাশিত ‘বালারঞ্জিকা’ (সাপ্তাহিক), এপ্রিল ১৮৭৩। ‘হেমলতা’ (পাক্ষিক) অক্টোবর ১৮৭৩। ডা. ভুবনমোহন সরকার সম্পাদিত ‘বঙ্গ মহিলা’ (মাসিক), এপ্রিল ১৮৭৫। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত ‘পরিচারিকা’ (মাসিক), মে ১৮৭৮। ... মহিলা-সম্পাদিত প্রথম সাময়িকপত্র ‘বঙ্গ মহিলা’ নামে একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র, খিদিরপুর-নিবাসিনী জনৈক মহিলার সম্পাদনায় ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭০) প্রকাশিত হয়। শুনিয়াছি, ইনি ...মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়।’’[১]

উনিশ শতকে এরপর প্রকাশিত বাঙালি মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকার তালিকা দিয়েছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেগুলো হচ্ছে : ‘অনাথিনী’ (১৮৭৫), ‘হিন্দু ললনা’ (১৮৭৮), ‘ভারতী’ (১৮৭৭), ‘বঙ্গবাসিনী’ (১৮৮৩), ‘সোহাগিনী’ (১৮৮৪), ‘বালক’ (১৮৮৫), ‘বিরহিনী’ (১৮৮৮), ‘পুণ্য’ (১৮৯৭), ‘অন্তঃপুর’ (১৮৯৮)। এই পত্রিকাগুলোতে নারীকণ্ঠে নারীর অভাব-অভিযোগ, কর্তব্য এবং অধিকারের কথা ফুটে উঠেছিল। এসব পত্রিকার মাধ্যমেই বাংলার মহিলাদের বক্তব্য প্রচারিত হতে থাকে।[২]

তারপর বিশ শতকে বাঙালি নারীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়ে পত্রিকার যে জগৎ উন্মোচিত হয়েছিল তার মধ্যে ধর্মীয় রীতি-নীতি আদর্শ ও ভাবধারার ভিন্নতা পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালি নারীকে অধিকারহীন, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকা, অবরোধের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকা, পারিবারিক-সামাজিক প্রথাগত নির্যাতন সহ্য করতে হয় বলে তাদের সম্পাদিত পত্রিকায় নারীমুক্তির লক্ষ্যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ সার্বিক নারীমুক্তির মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়েও বিভিন্ন ধর্মীয় সমাজের নারী সম্পাদকরা তাঁদের পত্রিকায় নিজ নিজ সমাজের নারীপ্রগতির বাধাগুলো, নিষেধাজ্ঞাগুলো আলোচনা করেছেন।

১৯০৫-এর সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয় বিশ শতকের প্রথম মহিলা সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'ভারতমহিলা'। সরযূবালা দত্তের (১৮৮০-১৯৬৩) সম্পাদনায় মুদ্রিত চব্বিশ পৃষ্ঠার পত্রিকাটির বার্ষিক মূল্য ছিল তিন টাকা। মুদ্রক কার্তিকচন্দ্র দত্ত। বাঙালির দেশপ্রেম বিস্তৃতির যুগে প্রকাশিত দেশচেতনাভিত্তিক এই পত্রিকাটি চলেছিল তেরো বছর। মেয়েদের উন্নতিবিধানই ছিল পত্রিকার লক্ষ্য তথা উদ্দেশ্য। সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল—"...নারীকে উন্নত করিয়া নারীকে সঙ্গে লইয়াই পুরুষকে অগ্রসর হইতে হইবে। এই সুমহৎ দুষ্কর কর্মে কদাচিৎ সাহায্য করিবার জন্য 'ভারতমহিলা'-র জন্ম।" প্রতি সংখ্যার নাম-পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হতো 'মনু সংহিতা'-র শ্লোকাংশ : 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে / রমন্তে তত্র দেবতা।'

মহিলাদের চিন্তনশক্তি, জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক প্রবন্ধ, বিখ্যাত জীবনী ছাপা হতো এই পত্রিকায়। থাকত সমাজের সকল স্তরের মেয়েদের সম্পর্কে আলোচনা। ব্রতকথার সঙ্গে স্থান পেত স্বাস্থ্য আর বিজ্ঞানভিত্তিক রচনা। মুদ্রিত হতো দেশসেবকদের আখ্যান। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধে প্রাধান্য পেত স্বদেশ ভাবনা। উল্লেখ্য রচনা : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫) কৃত স্বরলিপিসহ রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' গানটির মুদ্রণ। নিয়মিত লিখতেন প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫), সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-১৯২৯), রমাকান্ত রায় (১৮৭৩-১৯০৬), সীতানাথ তত্ত্বভূষণ (১৮৫৬-১৯৪৫) প্রমুখ।

বাঙালি নারী সম্পাদিত পত্রিকার একটি শাখা হিসেবে বাঙালি মুসলিম নারী সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকার আলোচনা সুবিন্যস্ত করাই

বেগম রোকেয়া

যুক্তিসঙ্গত। বাঙালি মুসলিম নারীর জাগরণ ইতিহাসের ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিশেষ দৃষ্টিতে বিচার্য বিষয়। জাগরিত বাঙালি মুসলিম নারী সম্পাদিত পত্রিকার বিষয়ে আলোচনাও খুব প্রাধান্য পায়নি। বাঙালি নারী সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকার মূল ধারায় বাঙালি মুসলিম নারী সম্পাদকদের অবদানের বিষয়টি অবহেলিত রয়ে গেছে। 'বাঙালি মুসলমান নারী সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা' বলতে ব্যপক অর্থে বোঝাতে চাইছি ব্রিটিশ যুগের (১৯৪৭ পর্যন্ত) পশ্চিমবাংলা এবং পূর্ববাংলার, ১৯৪৭ পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানের ও পশ্চিমবাংলার এবং ১৯৭২ থেকে ২০০০ পর্যন্ত বাংলাদেশের ও পশ্চিমবাংলার বাঙালি মুসলমান মেয়ের পত্রিকার জগৎ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাঙালি মুসলিম সমাজে ইংরেজি ভাষাভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা আর তজ্জনিত চেতনামুক্তি এসেছিল একটু দেরিতে। মুসলমান মেয়েদের পড়াশোনাও শুরু হয় বিলম্বে। তাই তাঁদের পত্রিকা-সম্পাদক হিসেবে দেখতে পাওয়া যায় অনেক পরে। পত্রিকার সাথে মুসলিম মহিলার যোগসূত্রতার শুরু ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন করিমন্নেসা খাতুন 'আহমদী' (১৮৮৬) নামক পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন। ফরজুন্নেসা ছিলেন আরো সৃষ্টিশীল পত্রিকা 'ইসলাম প্রচারক' (১৮৯১)-এর পৃষ্ঠপোষক।

এক্ষেত্রে অবশ্য পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। তিনি মুসলিম মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করেন ১৯০৯ সালে। তারপরে তিনি গড়লেন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' সমিতি। মেয়েরা পড়তে এল সে স্কুলে, সভ্য হল সমিতির। মূলত রোকেয়ার প্রয়াসে মুসলিম মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জাগল আত্মবিশ্বাস। কিন্তু প্রথমে তাঁরা পৃথক পত্রিকা সম্পাদনায় অগ্রসর হননি। বিশ শতকের প্রথম দুই দশক মুসলিম মেয়েদের কোনো স্বতন্ত্র পত্রিকা ছিল না। তাঁরা লিখতেন কলকাতার মুসলমান পুরুষ সম্পাদিত পত্রিকাগুলিতে। 'নবনূর' (সৈয়দ এমদাদ আলীর সম্পাদনায়, মে ১৯০৩), 'দ্য মুসলমান' (আবুল কাসেমের সম্পাদনায়, ১৯০৬), 'আল্-এস্লাম' (মোহাম্মদ আকরাম খাঁ এবং পরে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী-র সম্পাদনায়, ১৯১৫), 'সওগাত' (মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের সম্পাদনায়, ডিসেম্বর ১৯১৮), 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা' (মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায়, ১৯১৮), 'সাধনা' (আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ এবং আবদুর রশীদ সিদ্দিকির সম্পাদনায়, এপ্রিল ১৯১৯), 'সহচর' (১৯২২), 'ধূমকেতু' (কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায়, আগস্ট ১৯২২), 'শিখা' (আবুল হোসেনের সম্পাদনায়, এপ্রিল ১৯২৭), 'নওরোজ' (মোহাম্মদ আফজাল্-উল-হক্, জুন ১৯২৭), 'মাসিক মোহাম্মদী' (মোহাম্মদ আকরাম খাঁর সম্পাদনায়, নভেম্বর ১৯২৭), 'মোয়াজ্জিন' (সৈয়দ আব্দুর রবের সম্পাদনায়, ১৯২৮), 'জাগরণ' (এস.আহমদ আলীর সম্পাদনায়, এপ্রিল ১৯২৮) ইত্যাদি পত্রিকায় হিন্দু-মুসলিম নারীদের লেখা প্রকাশিত হতো।

এসব পত্রিকার মধ্যে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন (১৮৮৮-১৯৯৪) সম্পাদিত 'সওগাত' শুরু করেছিল মেয়েদের জন্য পৃথক বিভাগ 'জেনানা মহ্ফিল'। তারপর পত্রিকাটি প্রকাশ করতে থাকে মহিলা সংখ্যা—'মহিলা সওগাত'। ১৯২৯ থেকে ১৯৪৫—এই সময়পর্বে মোট ছটি মহিলা সংখ্যা বের হয়েছিল। এর উদ্দেশ্যই ছিল অন্তঃপুরবাসিনী বাঙালি মুসলিম মহিলাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ করে দেওয়া।

১৯৪৭-এ সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)-এর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'বেগম' কলকাতা থেকে বের হয়। 'বেগম' পত্রিকাটি ছিল সচিত্র পত্রিকা। প্রকাশক ও মুদ্রক ছিলেন 'সওগাত' সম্পাদক মোহম্মাদ নাসিরউদ্দিন। ১১ ওয়েলেসলি স্ট্রিট-এর ক্যালকাটা আর্ট প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত হতো। দ্বাদশ সংখ্যা (২ অক্টোবর ১৯৪৭) থেকে সম্পাদক হন মোহম্মাদ নাসিরউদ্দিনের মেয়ে নূরজাহান বেগম, সহ-সম্পাদক লায়লা সামাদ। ১৯৫০ থেকে পত্রিকাটি ঢাকার ৬৬ লয়াল স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত হতে থাকে।[৩]

'বেগম'-এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম মহিলাদের অবস্থার সর্বতোমুখী উন্নয়ন আর মানসিক আর মানবিক সচেতনতা বৃদ্ধি। গল্প-

সুফিয়া কামাল

প্রবীণ সাংবাদিক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন-এর সঙ্গে কন্যা নূরজাহান ('বেগম' সম্পাদক) পটুয়াটুলির দপ্তরে কর্মরত।

কবিতা-প্রবন্ধ-রম্য নিবন্ধ, ব্যঙ্গ-কৌতুক রচনা ভিন্ন 'বেগম' মেয়েদের বিবিধ সমস্যা, তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি, নারী-সংগঠন সম্পর্কিত খবর প্রকাশ করত। দেশ-বিদেশের মেয়েদের কাজকর্মের সংবাদের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলন ও মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের খবর প্রকাশ গুরুত্ব পেত 'বেগম'-এ। রান্না, রূপচর্চা, চলচ্চিত্র আলোচনা বিষয়ে নিবন্ধ আর আলোচনা প্রকাশিত হতো 'বেগম'-এ। অর্থাৎ সমাজ আর দেশের সকল সমস্যা-সংকট সম্পর্কে সচেতন ছিল 'বেগম', আর মেয়েদের মধ্যে এ সচেতনতা সঞ্চারে সচেষ্ট ছিল পত্রিকাটি।

ঢাকা থেকে এখনও তা প্রকাশিত হয়ে চলেছে। সম্পাদনার কাজ চলিয়ে যাচ্ছেন নূরজাহান বেগম, এই ৮৬/৮৭ বছর বয়সেও। দুই বাংলাতে মহিলাদের নিজস্ব পত্রিকার সংখ্যা কম নয়। কর্পোরেট ছোঁয়ায় অনেক পত্রিকা ঝাঁ চকচকে। কিন্তু ঐতিহ্য ও অবদানে 'বেগম' এখনও অমলিন।

এই বঙ্গে 'বেগম' প্রকাশিত হয়েছিল তিন বছর। প্রায় ৩৬টা সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ১৯৫০ সাল হতে তা স্থানান্তরিত হয় ঢাকায়। চোখের বাইরে চলে যাওয়া মানে মনের বাইরে চলে যাওয়া। 'বেগম'-এর ক্ষেত্রে কার্যত তাই হয়েছিল। সেই তিন বছরে এই বাংলায় 'বেগম' যে ভূমিকা পালন করেছিল, তা কম নয় বললে কিছুই বলা যাবে না। মনে রাখতে হবে সময় এবং প্রেক্ষাপটকে। বেগম রোকেয়া স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ছাত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। বিত্তবান এবং শিক্ষিত বহু মুসলিম পরিবার ছিল। কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসন তখন এমনই ছিল, মেয়েদের ঘরের বাইরে বার করে স্কুলে পাঠাবেন, এমন সাহস ছিল না। তবু কিছু মুক্তবুদ্ধির মানুষ ছিলেন সমাজে, যাঁরা সাহস দেখিয়েছিলেন। 'সওগাত'-এর সম্পাদক মোহম্মদ নাসিরউদ্দিন ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

'সওগাত' তখন মধ্যগগনে। সওগাত-এর মাধ্যমে নাসিরউদ্দিন পিছিনে থাকা মুসলিম সমাজকে ধাক্কা দিচ্ছেন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি বুঝেছিলেন শুধু পুরুষ দিয়ে একটা পিছিয়ে পড়া সমাজকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয়। রান্নাঘর থেকে আঁতুড়ঘর যেন নারীর পরিক্রমা কক্ষ, সেখান থেকে নারী সমাজকে হিঁচড়ে টেনে নতুন কক্ষপথে সংস্থাপন করতেই হবে। নারীদের অর্ধেক আকাশে পরিণত করতে হবে। তাই মেয়েকে আনতে চাইছিলেন কলকাতায়। সে কাজে সফল হলেন। মেয়ে নূরজাহানকে সেইভাবে গড়ে তুলতে লাগলেন। মেয়ের বয়স তখন সাড়ে চার বছর। তাকে ছেড়ে কী করে থাকবেন বলে নাসিরউদ্দিনের স্ত্রী ফাতেমা বেগম কান্না জুড়লেও, অবিচল নাসিরউদ্দিন মেয়েকে বেগম রোকেয়ার স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। মেয়ের হৃদয়ে আলোর পরশ না লাগলে, তার মধ্যে মুক্তবুদ্ধির জন্ম হবে কীভাবে?

এক সাক্ষাৎকারে নূরজাহান বেগম বলেছেন, ''স্কুলে অনেক বাচ্চা একসঙ্গে দেখে খুব ভাল লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েক জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। কলকাতার বাসায় একা থেকে হাঁফ ধরে গিয়েছিল। শুরু হয়ে গেল হাসি, গল্প। ...আমরা লেখাপড়া শিখতাম, গান-বাজনা করতাম। পাশাপাশি হাতের কাজ, ছবি আঁকা শিখতাম। খেলাধুলোও করতাম।'' নাসিরউদ্দিন এমনটাই চেয়েছিলেন। বড় দায়িত্ব ঘাড়ে চাপাবেন যার ওপর তার কাঁধটা তো শক্ত করতেই হবে।

১৯৪২-এ নূরজাহান ম্যাট্রিক পাস করে লেডি ব্রেবোর্নে ভর্তি হন। ১৯৪৬-এ ইন্টারমিডিয়েট পাস করলেন। নাসিরুদ্দিন বুঝলেন এবার সময় হয়েছে। নূরজাহান বেগম জানাচ্ছেন, ''বাবা একদিন বললেন মেয়েদের জন্যে আলাদা বিভাগ নয়, একটা গোটা পত্রিকা করা উচিত। মেয়েরা লেখাপড়া, শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে না এলে সমাজের উন্নতি হবে না।'' জন্ম হল 'বেগম'-এর। ১৯৪৭-এর ২০ জুলাই। তখনকার জনপ্রিয় কবি সুফিয়া কামাল, তাকে কার্যকরী সম্পাদক করে, মেয়েকে করলেন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। নাসিরুদ্দিন ও সুফিয়া কামাল পরিকল্পনা ও রূপায়ণ করেন। নূরজাহান সহযোগিতা করেন। 'সওগাত' সম্পাদনার কাজে বাবাকে সাহায্য করার সুবাদে কাজটা তার কাছে অজানা ছিল না। প্রধান উদ্দেশ্য মুসলিম নারীদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করা। একইসঙ্গে তাদের নানা বিষয়ে শিক্ষিত করা, পারদর্শী করা, নৈতিক পুষ্টি দান করা। বিদেশের নারী আন্দোলন কোন পথে এগোচ্ছে তার খবর প্রকাশ এবং কৃতী নারীদের বিবরণও প্রকাশ করা হতো 'বেগম'-এ।

১৯৪৫ সালে এই কাজগুলো সহজ ছিল না। হাতের কাছে ইন্টারনেট ছিল না। বিদেশি পত্র-পত্রিকা আজকের মতো সহজলভ্য ছিল না। সর্বোপরি তথ্য সংগ্রহ ও তা সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপিত করার দক্ষ ও প্রয়োজনীয় লেখকের অভাব ছিল। তবু দমেননি নাসিরুদ্দিন। সেই তাড়না থেকে যাতে মুসলিম সমাজের নারী জাগরণ ত্বরিত হয়।

সমস্যা হল মেয়েদের ছবি ছাপা নিয়ে। সমালোচিত হতে হবে—এই ভয়ে প্রতিবেদনের সঙ্গে মহিলাদের ছবি দিতে রাজি নন অনেকেই। নূরজাহান বেগম জানাচ্ছেন,

''তখন কেউ পত্রিকায় ছবি ছাপতে চাইতেন না। বন্ধু-বান্ধবের স্ত্রীদের ছবি ছাপাতেন বাবা। নজরুল দিয়েছেন স্ত্রী প্রমীলাদেবীর ছবি; বাবা ছেপেছেন মায়ের ছবি, আবুল মনসুর দিয়েছে স্ত্রীর ছবি। আমরা কলেজ পাস করার পর বাবা বড় বড় করে গ্রুপ ছবি ছেপেছিলেন। ১৯৪৭ সালে সুফিয়া খালা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেলে আমি সম্পাদক হলাম। এর মধ্যে দাঙ্গার আগুন, অশান্তিতে অস্থির হল দেশ। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সেইসব হিন্দু বোনদের প্রতি, যারা দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যেও 'বেগম'-এ লেখা পাঠাতেন।''

স্বাধীনতা প্রপ্তির পর পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত মুসলিমদের বড় একটা অংশ চলে গেলেন পূর্ব পাকিস্তনে। 'সওগাত'-এর বিক্রি কমে গেল। এছাড়া নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছিল। নাসিরুদ্দিনের পক্ষে অন্য কোনও পেশা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তাই অনেক ভেবেচিন্তে 'সওগাত' ও 'বেগম'-এর ঠিকানা বদল করতে হল নাসিরুদ্দিনকে। 'বেগম'-এর সম্পাদক জানাচ্ছেন, ''বাবা সব সময় বিষয় বৈচিত্র্য নিয়ে ভাবতেন। প্রথম প্রকাশের সময় বাবা কয়েকটা বিভাগ ঠিক করে দিয়েছিলেন। কেবল উচ্চশিক্ষিত নয়, স্বল্প শিক্ষিত মহিলাদের কথা ভেবেও বিষয় নির্বাচন করা হতো। বাবা বলতেন, যুগের পরিবর্তনটা সবসময় মেনে চলবে। সব সময় মনে রাখবে আজ যেটুকু হচ্ছে, আগামীতে তা আরও উন্নত হবে। শিশুদের জন্যেও একটা বিভাগ ছিল। জনপ্রিয় ছিল চিটিপত্র বিভাগ। বিভিন্ন জেলা থেকে কত চিঠি আসত। ঠিকঠাক করে তা ছাপা হত। সেই চিঠি ছাপা হলে এলাকাজুড়ে মানুষ পড়তেন। একটা সংখ্যা একশো-দেড়শো হাত ঘুরত। এভাবে স্বল্পশিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে লেখালিখি ও পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলেছিল 'বেগম' পত্রিকা। একদিন বাবা বললেন চিঠিপত্র বিভাগটা বড় একঘেঁয়ে হয়ে যাচ্ছে। একটু বৈচিত্র্য আনো। আলেয়া ফেরদৌস ছিলেন রসিক মহিলা। তাকে বলা হল, মজা করে চিঠির উত্তর দিতে। তার নাম দেওয়া হল মহুয়া। খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল বিভাগটি। রসিয়ে বসিয়ে তিনি উত্তরে দিতেন। মহুয়ার নামে কত চিঠি আসত। কত তথ্য জানতে চাইতেন মহিলারা। বহু কষ্ট করে সেসব তথ্য আমরা জোগাড় করতাম।

''ছবি পাওয়ার সমস্যা মেটাতে এবং মহিলাদের মুখোমুখি হওয়ার প্লাটফর্ম তৈরি করতে গড়া হয়েছিল 'বেগম ক্লাব'। সভাপতি হয়েছিলেন শামসুন্নাহার মাহমুদ। আমাকে করা হল সম্পাদক। প্রথম অধিবেশনে মাত্র ১২-১৫ জন উপস্থিত হয়েছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে আলোচনা হতো। প্রবীণ লেখিকা ও সমাজসেবীদের সঙ্গে এভাবে মিলন ঘটেছিল নবীনাদের। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হতো। তার সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হতো। নানা সূত্র ধরে সেসব দেশ-বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এভাবে একটা আন্তর্জাতিক সম্পর্কও তৈরি হয়েছিল। 'বেগম' পত্রিকার কলকাতা ছাড়া উপলক্ষে এক অশ্রুসজল অনুষ্ঠান হয়েছিল। তাতে গান গেয়েছিলেন হেমন্তবাবু এবং তালাত মাহমুদ।

''ঢাকায় স্থানান্তরের পর 'বেগম' আরও বেশি জনপ্রিয়তা পেল। ঢাকায় এতই জনপ্রিয় ছিল যে পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল 'বেগম' ক্লাব। 'বেগম' ক্লাবের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ হল 'বিবাহ ও পারিবারিক আইন' পাস করানো। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এই বিষয়ে বহু লেখালিখি, আন্দোলন হয়েছে। কাজের কাজ কিছু হচ্ছিল না। মাঝখান থেকে মহিলারা নির্যাতিত বঞ্চিত হচ্ছিলেন। ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে গেলাম আইয়ুব খানের সঙ্গে দেখা করতে। আইয়ুব খান বললেন, বিপক্ষ মতাবলম্বী তথা কট্টরপন্থীরা খুব শক্তিশালী। তাই তোমাদের জোরালো সমর্থন দরকার। ফিরে গিয়ে তাড়াতাড়ি আবেদন জমা দাও। সপ্তাহ খানেক পর অধিবেশন। আমরা দ্রুত ওয়ারি মহিলা সমিতি, গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি, নারিন্দা মহিলা সমিতিসহ বিভিন্ন সংগঠনকে ডেকে গণদরখাস্ত করে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। অধিবেশনের দ্বিতীয়দিনে তা পাশ হয়ে গেল।''

সমাজের বহু নারী-পুরুষ 'বেগম' ও 'বেগম ক্লাব' পরিপূরক শক্তি হিসেবে অবরোধবাসিনী, অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের প্রকাশ্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক সু-পরিবেশের রসদ সরবরাহ করেছে। বটচ্ছায়া বিস্তার করেছেন 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন। 'বেগম' পত্রিকার সূচনাকালে বাঙালি মুসলিম মেয়েদের অন্তঃপুরবাসিনী ও অবরোধবাসিনী পরিচয় কেমন ছিল তা আমরা যতটা জানতে পারি ততটা জানি না তাদের এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসার ইতিহাস। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তি নারী সমাজের পশ্চাৎপদ, অবরুদ্ধ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকার বঞ্চিত অসহায় অবস্থার কথা ভেবে এর প্রতিকারের পথ খুঁজেছিলেন। এক্ষেত্রে যাঁদের অবদান রয়েছে তাঁরা হচ্ছেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৮), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৭), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৭), আবুল হুসেন (১৮৯৭-১৯৩৮), আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), লীলা নাগ (১৯০০-১৯৭০), শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৯-১৯৬৭), প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১-১৯৩২), সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), দৌলতউন্নেসা খাতুন (১৯২২-১৯৯৭)। এঁদের অনেককে সম্মিলিত করেছিলেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন তাঁর 'সওগাত' পত্রিকায়। এঁদের আহ্বানে নারী সমাজের মধ্যে জাগরণের সূচনা ঘটেছিল তাঁদেরই অন্তঃপুরে, বৃহত্তর সংসারে। কিন্তু 'সওগাত' পত্রিকার পুরুষ প্রাধান্যের পরিবেশে ব্যাপক নারীদের সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়নি। কিভাবে জাগ্রত নারী সমাজের অংশগ্রহণ সম্ভবপর করা যায়—তা ভেবে, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন পথ বের করলেন সচিত্র 'মহিলা সওগাত' সংখ্যা প্রকাশ করে। 'সওগাত' পত্রিকায় সাহিত্যচর্চা করতেন প্রভাবতী দেবী (১৮৯৬-১৮৭২), রাধারাণী দেবী (১৯০৩), মিসেস এম. রহমান (১৮৮৯-১৯২৯), রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী (১৯০৭-১৯৩৪) প্রমুখ।

'বেগম' পত্রিকা ও বেগম ক্লাব-এর সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন আরও অগণিত কৃতী পথিকৃৎ : সারা তৈফুর, শামসুন্নাহার মাহমুদ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, নুরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী, জোবেদা খাতুন চৌধুরানী, হুসনা বানু খানম, তাহমিনা বানু, নাসিমা বানু, মঞ্জুলিকা দাশগুপ্ত, প্রতিভা গাঙ্গুলি, সেলিনা দোজা পন্নী, রাজিয়া মজিদ, হোসনে আরা, রাজিয়া মাহবুব, রাবেয়া খাতুন, জাহানারা আরজু, লায়লা সামাদ, হাসিরাশি দেবী, বেদম আজিজ এন মোহাম্মদ, নুরুননাহার, মাজেদা খাতুন, সৈয়দা সুফিয়া সাহিত্যরত্ন, আশাপূর্ণা দেবী, সৈয়দা সুফিয়া বানু, শামন রশীদ, নীলিমা ইব্রাহিম, সাইদা খানম, মাফরুহা চোধুরী, জুবাইদা গুলশান আরা, মকবুলা মঞ্জুর, সেলিমা রহমান, হামিদা খানম, মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, বেগম মীজানুর রহমান, সৈয়দা ফাতেমা সাদেক, মোহসীনা আলী, লুলু বিলকিস বানু. মালেকা পারভীন বানু, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, মিসেস জাকিয়া রশীদ, সারা খাতুন, আনোয়ারা বেগম, মমতাজ খানম, লুৎফুন্নেসা আব্বাস, রিজিয়া রহমান, রাজিয়া খান আমিন প্রমুখ।[৪]

পশ্চিমবঙ্গ 'বেগম'-এর আতুড়ঘর, এখানে থাকার সময়ও বেগম নানা প্রতিকূলতা ও হুমকির মুখে কাজ করেছিল, তা আজ কিংবদন্তী। এই পত্রিকার মাধ্যমে সব সম্প্রদায়ের মহিলারা মন খুলে ভাবের

আদানপ্রদান করতে পেরেছিলেন। মুসলিম সমাজও উপকৃত হয়েছিল। তবে এর নেপথ্যে নাসিরউদ্দিন সাহেব যে সাহস ও ভাবনার পরিচয় রেখেছিলেন তার জন্য কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।

অবিভক্ত ভারতবর্ষে তখন ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা-স্বদেশী সংগ্রামের শেষ পর্যায় চলছিল। এই সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়ে 'বেগম' গুত্বের সঙ্গে সচিত্র সংবাদ, সম্পাদকীয়, আলোচনা ছাপিয়েছে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বাংলাদেশের লীলা নাগ (১৯০০-১৯৭০), প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১-১৯৩২) ও কল্পনা দত্ত (যোশী) (১৯১৩-১৯৯৫)-এর জীবনপণ সংগ্রাম ১৯৪৭-৪৮ সালের 'বেগম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। দেশভাগের ফলে নারী সমাজের ওপর যে রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক চাপ সৃষ্টি হতে থাকলো সেসব বিষয়ে সম্পাদকীয়, আলোচনা, সংবাদ, মহিলা জগত, হালচাল ও চিঠিপত্র বিভাগে মুক্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবিরোধী সংগ্রামে নারী সমাজের গৌরবময় অংশগ্রহণের ঐতিহ্যিক ধারাবাহিকতায় তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা বাংলা ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-৫২) এবং মুক্তিযুদ্ধ (১৯৬৯-৭১) স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী সমাজের অংশগ্রহণের বিবরণ, যুদ্ধ-নির্যাতন, যুদ্ধ-শিশু এসব বিষয়ে নারী সমাজের ভাবনা-চিন্তা-মতামত ও কর্মকাণ্ডের খবর 'বেগম' পত্রিকায় ইতিহাসের যথাযথ সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাছাড়া সে সময় নারীদের জন্য পাঠ্যসূচি কী হবে সে বিষয়ে বিতর্ক-আলোচনা চলেছিল পরিবারে-সমাজে-শিক্ষাকেন্দ্রে। সেসব মুক্ত আলোচনা 'বেগম' করেছে। সেই সঙ্গে এই রক্ষণশীল চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ঘটাবার জন্য প্রগতিশীল ইতিবাচক ভূমিকাও গুরুত্বের সঙ্গে পালন করেছে। ৬৫ বছরের বেশি সময় ধরে নারীশিক্ষার যাত্রাপথটি সহজ হলো না কেন সেই তথ্যও 'বেগম' পত্রিকায় পাওয়া যায়। বর্তমানে নারীশিক্ষা-বয়স্কশিক্ষা-সাক্ষরতা-সহশিক্ষা-শিশুশিক্ষার সঠিক চিত্রটি যেমন নিরাশাব্যঞ্জক তেমনি আশাব্যঞ্জকও বটে। এই আশার ক্ষেত্র সন্ধানে 'বেগম'-এর কলম-যুদ্ধ যখন দৃশ্যমান হয়ে ওঠে তখন জানা যায় অবরোধ মুক্তির পথে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের আদর্শ অনুসারী হয়ে ঘরে ঘরে কীভাবে শিক্ষার দীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিল 'বেগম'।

সমকালীন বিশ্বের নারী সমাজের কৃতিত্ব, জীবনধারা ও অন্যান্য বিষয় 'বেগম' পত্রিকার মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের নানা স্তরের নারী সমাজের চিন্তা-চেতনার বিকাশকে প্রভাবিত করেছে। ইসলামসহ প্রাসঙ্গিক নানা দেশ-কৃষ্টি-সংস্কৃতির নারীসমাজের ইতিহাস সংকলিত হয়েছে 'বেগম' পত্রিকায়। আমরা জানি 'বেগম' থেকে দেশ-বিদেশের কৃতী মহিলাদের জীবন অবসানে শোক প্রকাশের খবর। দেশবিভাগের আগে ও পরে 'বেগম' পত্রিকায় যাঁদের অবদান আলোচিত হয়েছে, নারীপ্রগতির বিকাশে-আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন ও অংশ নিয়েছেন, সাহিত্য-সংস্কৃতি-নাট্য-ক্রীড়াচর্চায় নিবেদিত ছিলেন, সংগঠন-ক্লাব-রাজনীতি-আন্দোলনে-পেশায় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তাঁদের জীবন অবসানে শুধুমাত্র পারিবারিকভাবে নয়, জাতীয় ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শোক প্রকাশের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে রেজিনা বেগম 'বেগম' পত্রিকার বিষয়ে এম.ফিল. (১৯৯৫) করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে 'বেগম' বিষয়ে এম.ফিল. করেছেন আফরোজা বুলবুল (২০০৫)। 'স্টেপ্‌স টুওয়ার্ডস' প্রতিষ্ঠানের (ঢাকা) সহযোগিতায় 'বেগম'-এর বিষয়ে প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করেছেন রিবন খন্দকার। 'বেগম' বিষয়ে এই সকল গবেষণা, চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্‌যোগ সাক্ষ্য দিচ্ছে 'বেগম' কেবল পত্রিকাই নয়, সমাজ বিনির্মাণের প্রতিষ্ঠানরূপেও স্বীকৃত।[৫]

'বেগম' পত্রিকার ইতিহাস যে নারীর সত্তা-স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতির ইতিহাস—সে সত্য স্পষ্ট হয়ে যায় এ আলোচনা থেকে। এ স্বীকৃতি শুধু বহির্জগতের নয়—নারীর অন্তর্জগতেও জাগ্রত হয়েছিল এ চেতনা। মেয়েরা বুঝেছিলেন আপনাদের মূল্য। তাই পুরুষও তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল বলেই পত্রিকা-পৃষ্ঠায় সত্য ভাষণের সাহস দেখিয়েছিলেন মেয়েরা। আবার 'বেগম'-মাধ্যমে ঘর আর বাইরের সমস্যা সমাধানের প্রয়াসে মেয়েদের চিন্তন-ক্ষমতার গভীরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'বেগম'পত্রিকার ইতিবৃত্ত এভাবেই হয়ে উঠেছে মেয়েদের নবীন চেতনায় আপন শক্তিতে বিশ্বাস-বিকাশের ইতিকথা।

সূত্রনির্দেশ

১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাময়িক পত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী*, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, কলকাতা, ১৩৫৭, পৃ. ১
২. ঐ, পৃ. ১-১০
৩. সাজেদ কামাল (স.), *সুফিয়া কামাল রচনাসমগ্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, ভূমিকা, পৃ. ১০
৪. মালেকা বেগম, বাঙালি মুসলমান নারী সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১১৩ বর্ষ, সংখ্যা-৪, মাঘ-চৈত্র ১৪১৩, কলকাতা
৫. ঐ

With Best Compliments of

M/s. BAKSHI ENTERPRISE

Khandra, Burdwan

Sl. No. 30

With Best Compliments of

M.B. ENGINEERING

MECHANICAL & ELECTRICAL CONTRACTOR

E-mail : mb.engineering@rediffmail.com

CORRESPONDENCE
J-128, Sagarbhanga Colony, Durgapur-713211
Dist. Burdwan, W.B. Fax : 0343-2559073

WORKS
Gopinathpur, Durgapur-713219, Dist. Burdwan, W.B.
Cell : 9474119114, 8670055660

Sl. No. 127

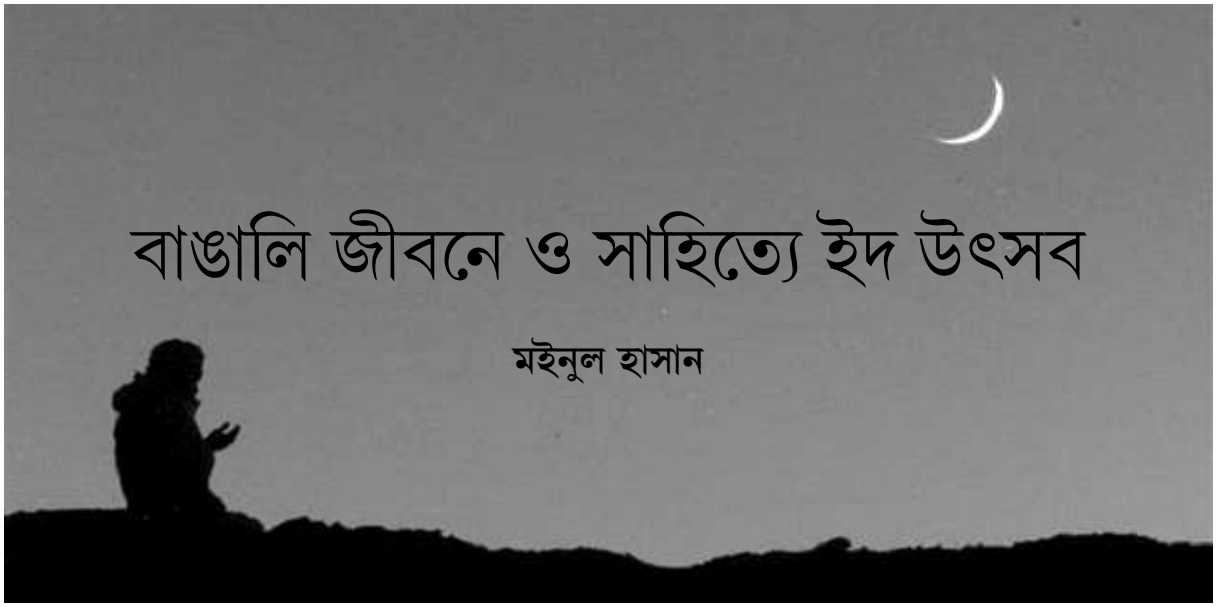

বাঙালি জীবনে ও সাহিত্যে ইদ উৎসব

মইনুল হাসান

মুসলমান জীবনে ইদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। অন্যতম প্রধান উৎসব। পৃথিবীর সমস্ত ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে ইদ পালিত হয়। বছরে দু-বার ইদ আসে। একবার ইদ-উল-ফিত্‌র এবং অন্যবার ইদুজ্জোহা। একমাস রমজানের উপবাস পালন করে আসে ইদ-উল-ফিতর। এখন ইদ ধর্মের বাঁধাধরা গণ্ডি পেরিয়ে উৎসবের আকার ধারণ করেছে। আমার আলোচনা বাঙালিদের মধ্যে ইদ উৎসব এবং তার পরম্পরা নিয়ে।

প্রথমে কয়েকটা সাদামাটা কথা বা আমার ছোটোবেলার কথা দিয়েই শুরু করতে চাই। কথা বা ঘটনাগুলি আমার, কিন্তু আরও অনেকের সঙ্গে একই রকম হবে।

একমাস রোজা। কৃচ্ছ্রসাধন চলতো বাড়িতে। ছোটোরা বাদে সবাই রোজা রাখতো। ইফতারের সময় এক থালা খাবার নিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা—সরবত, ছোলা সেদ্ধ, হাতে গড়া রুটি, একটা তরকারি। ইফ্‌তার শেষে নামাজ। তারপর আর একদফা খাওয়া দাওয়া। বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেমন একটা উৎসব উৎসব মনে হতো। পাশাপাশি সব বাড়িই আমাদের আত্মীয়বাড়ি। সুতরাং এক বাড়ির রান্না অন্য বাড়িতে যেতো—সেটা বাঁধাধরা ছিল। আর একটা বিষয় ছিল—বাইরের বাড়িতে অনেক অতিথি-র ইফ্‌তারের ব্যবস্থা থাকতো। সরবত নিয়ে একটা বিষয় এখনও আমার মনে আছে। চিনির সরবত কাগজি লেবু দিয়ে খুবই ভালো লাগে। কিন্তু আমি আবার গুড়ের সরবত পছন্দ করতাম। সেটা বোধহয় আমার মা চিনি খরচ বাঁচানোর জন্য আমজনতার জন্য করতেন। এক একটি রোজা এভাবেই কেটে যেতো। এখনও যে আলোচনা হয় তখনও তাই হতো—রোজা কটা হবে ২৯ অথবা ৩০টা। মুসলমান মাস নিয়ে রোজা হয়—রমজান মাসে। সওয়াল মাসের প্রথম দিন ইদ হবে। মুসলমান পঞ্জিকায় কোনো মাস ৩০ দিনের বেশি হবে না এবং ২০ দিনের কম হবে না। ফলে রোজা কম বেশি হবে—হতে পারে। মুসলমান পঞ্জিকানুযায়ী সন্ধ্যা নামলেই নতুন দিন শুরু হয়ে গেল। ইংরাজি মতে রাত্রি ১২টার পর নতুন দিন—এসব নয়। রোজা যখন শেষ পর্যায়ে তখন থেকে ইদের চাঁদ দেখার জন্য প্রস্তুতি। নির্দিষ্ট দিনে সবাই তাকিয়ে আকাশের দিকে। কে আগে দেখতে পাবে। মানুষকে ধোঁকা দিতে কোনো জুড়ি নেই। দেখা দিতেই চায় না। হঠাৎ চিৎকার শোনা যেতো ঐ ঐ ঐ ঐ...। খুশির বন্যা বয়ে যেতো। চলো ইফ্‌তারে—কাল ইদ। কিন্তু বিষয়টা এত সহজে বার বার হয় না। মেঘ বৃষ্টি ঝড় জল আছে। চাঁদ দেখার কোনো সুযোগ নেই। এবার চলো রেডিও শুনি। দিল্লির জামা মসজিদ, কলকাতার নাখোদা মসজিদ-এর ইমামগণ কী বলছেন। আমাদের আবার দেখতে হতো রাজশাহী বেতার থেকে কী বলছে তার দিকে। রাজশাহী তো ঘরের কাছে। আর দিল্লি বা কলকাতা সে তো প্রায় বিদেশ।

ইদের দিনের সকালবেলা এখনও আসে। কিন্তু ছোটোবেলার সেই মজা আর পাই না। হয়তো আমরা পাল্টে গেছি। সকালে উঠে এদিক ওদিক খানিকটা ঘুরে স্নান করা হতো। যত্ন করে কেউ চোখে সুরমা পরিয়ে দিতো। নতুন ঝক্‌ঝকে পোষাক, এক টুকরো তুলোতে নিতাম হালকা সুগন্ধের আতর। গায়ে একটু মেখে সেটা আবার কানে গুঁজে রাখা হতো। ভালোমন্দ খাবারের কোনো কমতি নেই। পায়েস, সুজি, ফিরনি, আমার মায়ের হাতের বিশ্ববিখ্যাত আলুভাজা দিয়ে ঘিয়ে জবজব করা মোটা তিনকোণা পরোটা অথবা জোড়া রুটি। ঘিয়ের গন্ধে গোটা বাড়ি ম ম করছে। বেরুবার সময় সবাইকে বলে যেতে হবে—যাচ্ছি। আব্বার কাছ থেকে পাওনা হতো ২ টাকা এবং একটা নতুন রুমাল। অনেকদিন পরে সেটা ৫ টাকা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আব্বাকে তাঁর নাতি-নাতনিদের ১০০ টাকা করে দিতে দেখেছি। আমরা তখন তালিকা থেকে বাদ। প্রায় ২ কিলোমিটার হেঁটে ইদ্‌গাহ। নামাজ তো সামান্য সময়ের। রঙিন কাগজের শিকল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয় ইদগাহ। আমার আবার ইদ শুরুর আগে কোরান পাঠ থাকতো। সুতরাং তার জন্য কিছুটা প্রস্তুতি থাকতো। ইদগাহ-র চতুর্দিকে মেলা। পাঁপড়, জিলিপি, খোরমা সহ নানারকম মিষ্টি, বেলুন, নানারকম খেলনার সমাহার। এলাকার সব বাচ্চাদের ভিড়। ভেঁপুতে ফুঁ দিয়ে বাচ্চারা তাদের উল্লাস প্রকাশ করছে। বাড়ি থেকে নতুন করা হতো—এখনও হয়। অনেক বাড়ি থেকেই হয়। যারা একটু অবস্থাপন্ন মানুষ তাদের এটা করতে হয়। তাতে ইদের দিনে সবার মুখে হাসি ফোটে। দুপুরে আমাদের বাড়িতে হয় উৎকৃষ্ট ভুনাখিঁচুড়ি। নানারকম মাংস। তার নানা পদ রান্না। আমাদের ছোটোবেলাতে খাবারের প্রতিযোগিতা ছিল। যে বাড়ি ইদের শুভেচ্ছা বিতরণ করতে যাবো সেখানেই খেতে হবে। এই বয়সে সেটা আর হয় না। তবে হঠাৎ সেদিন আমাদের ২ কন্যা সেজেগুজে পরীর মতো মতো বেরিয়ে গেলো। যাবার সময় মা এবং দিদিমাকে বলে গেল আজ আর

তোমাদের খাচ্ছি না। অন্যদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাবো। সত্যি তারা যখন বিকেলে ফিরলো তখন খাদ্যভারে তারা এত অবনত যে হাঁটতে পারছে না। বিছানায় ধুপুস্। কৈশোরের ধর্মই তাই।

এখন কিন্তু আগের সেই নিটোল শান্ত ব্যবস্থা আর নেই। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে অনেক কিছু পাল্টে গেছে। কিছুটা মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। সবাই না হলেও বুঝতে পারছেন—ইদ ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও একটা উৎসব। বাঙালি বরাবরই হুজুগপ্রিয়। আর উৎসব পেলে তো কোনো কথাই নেই। সুতরাং ইদ উৎসব পালন করে। আমাদের মুর্শিদাবাদ হল মুসলমান প্রধান জেলা। গঞ্জ এলাকায় তো বটেই, প্রত্যন্ত গ্রামের মোড়েও বড় বড় গেট করা হয়। সেই গেটে বিখ্যাত পোষাক বিক্রেতা, গহনা বিক্রেতা, আতর বিক্রেতার বিজ্ঞাপন থাকে। আসলে এটা তারাই তৈরি করে দেয়। আর ইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বড় বড় হোর্ডিং রাজনৈতিক নেতারা দিচ্ছেন, সরকার দিচ্ছেন, ক্লাবগুলো দিচ্ছে। এবার দেখলাম পুলিশের থানাগুলো থেকে দেওয়া হচ্ছে। আসলে প্রতি বছর জাঁকজমক করে কালীপুজো করার পর বোধ হয় মনে হয়েছে অন্য ধর্মের মানুষও এখানে বাস করে।

ইদ এবং সংস্কৃতি নিয়ে এখন চর্চা অনেক। বিখ্যাত চলচ্চিত্র মুক্তি পাচ্ছে ইদের দিনে। এবারই 'চেন্নাই এক্সপ্রেস' বলে একটা সিনেমা মুক্তি পেল এবং এটা বিজ্ঞাপন দিয়ে যে ইদের দিন মুক্তি পাচ্ছে। ইদের দিনে বাড়িতে বসে টিভিতে সিনেমা দেখাটা বড়ই ম্যাড়মেড়ে ব্যাপার। সুতরাং হাউস ফুল। সপরিবারে সিনেমা হল গমন। এরই সঙ্গে রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গানবাজনার আসর বসানো হচ্ছে। শিক্ষামূলক কুইজ প্রতিযোগিতা হচ্ছে। একটা গ্রামে ইদের কয়েকদিন আগে মিটিং করতে গেছি—একটা বিজ্ঞাপন দেখে মজা লাগলো—ইদ উপলক্ষে ৮০ ঘণ্টা সাইকেল (একনাগাড়ে) চালানোর প্রদর্শনী। দুটোর যে কী সম্পর্ক তা জানি না। কিন্তু হচ্ছে। যাত্রাগান, পালা গানের তো কথাই নেই। ধর্মীয় আঙ্গিকের সীমানা ছাড়িয়ে উৎসবের তালিকায় ঢুকে গেছে ইদ। রোজার সময়েই দৈনিক খবরের কাগজগুলো দেখলেই বোঝা যাবে। ইদ উপলক্ষে কী কী বাজার করবেন এবং কোথায় করবেন তার মনোমুগ্ধকর বিজ্ঞাপন। আর ইদ উপলক্ষে রাজ্য সরকারের তন্তুজ ও তন্তুশ্রী—যারা পোষাক বিক্রি করে তারা কিছুটা বাড়তি ছাড় দিতো। এখন সবাই ছাড় দেয়। বিখ্যাত কোম্পানির ঘড়ি বিক্রেতা, হীরের গহনা, মাইক্রোওভেন আর পোষাকআশাক তো আছেই। ছাড় না দিলে তো এখন কিছু বিক্রি হয় না। এখন ক্রেতা আগেই দেখে, বিশেষ করে বাঙালি, 'ফিরি' কী পাওয়া যাচ্ছে।

আসলে ইদ এখন একটা বড় 'বাজার'। আর মুসলমানদের সংখ্যা বিরাট। শুধু পশ্চিমবাংলায় ২ কোটির বেশি মুসলমান বাস করে। ইউরোপের ২/৩টে দেশের সমান। একটা অংশ যদি ইদের জন্য সওদা করতে বাজারে নামে তাহলেই রমরম করবে দোকানপাট। সুতরাং বাজার ধরো, ক্রেতা ধরো।

মুর্শিদাবাদ জেলার বাগড়ি এলাকায় আমার বাড়ি। পাট এই এলাকায় একমাত্র অর্থকরী ফসল। পাটের দাম পেলে কৃষকের মুখে হাসি আর ধরে না। টাকা কী করে খরচ করবে সেটাই বুঝতে পারে না। চাহিদা তো খুব বেশি নেই। এই ফাঁকে একটা পুরনো কথা বলি। যে বছর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী খুন হলেন তার পরের বছর পাটের দাম হয়েছিল ১ হাজার টাকা কুইন্টাল। সবাই তাজ্জব। এমনও হতে পারে! বহরমপুর শহরের কোনো মিউজিক সেন্টারে একটাও রেডিও পড়ে ছিল না। সাইকেল ছিল না। কৃষকের অবসর বিনোদনের জন্য রেডিও শোনাটাই ছিল একমাত্র মাধ্যম।

এখন ইদ উৎসব আরও জমকালো হচ্ছে কেন? গ্রামবাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। মুর্শিদাবাদ, মালদা, দুই দিনাজপুর মুসলমান অধ্যুষিত জেলা। অবশ্যই বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও বীরভূমে মুসলমান সংখ্যা যথেষ্ট। রাজ্যের ১২টা জেলাতেই মুসলমানের বসবাস অনেক। মুর্শিদাবাদ থেকে প্রচুর মানুষ বছরে ধান কাটার সময় বর্ধমান ও নদীয়ায় চলে যেতেন। রাজ্যের ধান্যগোলা বর্ধমান। গরিব চাষিদের দৌড় ছিল বর্ধমান পর্যন্ত। সেটাই ছিল তাদের কাছে 'হাজার ক্রোশ'। কিন্তু আজকে সেটা একেবারে পাল্টে গেছে। মুর্শিদাবাদ, মালদহের বিরাট অংশের গ্রামীণ শ্রমিক অন্য রাজ্যে—বিশেষ করে মুম্বই, কেরালা সহ দক্ষিণের প্রত্যেকটা জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। জঙ্গীপুর এবং লালগোলার রাজমিস্ত্রি পাওয়া যাবে না এমন কোনো রাজ্য নেই। দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে মজুরি ভালো। ৪০০ থেকে ৬০০ টাকা রোজ। খাওয়া-দাওয়া, থাকা সব নিজের। কেরালার শ্রমিকরা চলে গেছে মধ্যপ্রাচ্যে আর মুর্শিদাবাদের লোকেরা সেখানে গিয়ে কাজ করছে। প্রধান কারণ হলো যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি। যেখানেই যাক, মুঠোফোনে মা পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনছে, স্বামী স্ত্রীর, বাবা ছেলে-মেয়ের—সবাইকে 'বিশ্বগ্রামের' বাসিন্দা করে দিয়েছে। বাড়ি ফিরছে ইদের সময়। সুতরাং ইদ এবং ঘরে ফেরার আনন্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। তাই ডোমকলের বাজার থেকে ১২০০ টাকা কেজি দরে পদ্মার ইলিশ কিনে বাড়ি ফিরতে বাবার মুখে হাসি ঝরে পড়ছে—কারণ ছেলে ফিরেছে কেরালা থেকে হাতে বেশ কিছু টাকা নিয়ে। সুতরাং ইদের আনন্দ গ্রামীণ মুসলমানের জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করে দিয়েছে।

শুধুমাত্র পারিবারিক ব্যাপারগুলো পাল্টে দিয়েছে তাই না—এলাকার পরিবেশও পাল্টে গেছে। বাইরে কাজ করা এই ছেলেরা ছোটো ছোটো সংগঠনও গড়ে তুলছে পাড়ায়। প্রথম কাজ এলাকার মসজিদ বড় করা, ফ্যান ঝোলানো, ২/৩ জায়গায় শীতাতপ যন্ত্র বসতে দেখেছি, কবরখানা খোলা। এক জায়গায় দেখলাম ইদের দিনে সর্বসাধারণের জন্য একটা অ্যাম্বুলেন্সের উদ্বোধন হল। উদ্যোক্তাদের আমি সাধুবাদ দিয়েছি এই কাজে। কেউ নির্দেশ দেয়নি কিন্তু এই ছেলেগুলোই উদ্বোধক ঠিক করেছে গ্রামের সবচাইতে প্রবীণ মানুষটিকে। এই রাস্তা ধরেই ইদের সময় কয়েকদিন আগে থেকে মসজিদগুলোকে আলোকমালায় সজ্জিত করো হয়। সব জায়গায় এটা হয় না। খানিকটা রক্ষণশীলতা কাজ করেই। তবে রঙিন কাগজের শিকলি, দেবদারু পাতার গেট তো আছেই। ১০০ দিনের কাজ সারা দেশে সাড়া ফেলে দিয়েছে। মানুষের হাতে কিছু পয়সা এসেছে। কিন্তু ইদের উৎসব তার উপর নির্ভর ততটা করছে না, যতটা করছে অন্য রাজ্য থেকে আনা মজুরির ওপর। উৎসবের রকম পাল্টে যাচ্ছে। ধর্মীয় অনুষঙ্গ অবশ্যই বড়, কিন্তু সামাজিক অনুষঙ্গটিও কম বড় নয়।

ইদ মিলন উৎসব এখন একটি প্রচলিত অনুষ্ঠান। অনেকটা দুর্গাপূজার পর বিজয়া সম্মিলনীর মতো। এখানে ধর্মের বিষয়গুলো আলোচনা হয়ই, সামাজিক বিষয়, দেশের ও বিদেশের অবস্থা আলোচনা হয়। আলোচনা হয় হজরত মহম্মদ (সঃ)-এর জীবন ও কাজ সম্পর্কে। শুধুমাত্র মুসলমানরাই অংশগ্রহণ করে না, অমুসলমান সাধারণ ও বিদ্বৎজনেদের দাওয়াত দেওয়া হয়। সবাই ভাগ করে নেন ইদের আনন্দ। এখানে কড়া আলোচনা বা পবিত্র কোরান পাঠ যেমন হয় তেমনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। গান, গজল, নাটক—সবই হচ্ছে। মানুষের সাংস্কৃতিক চিন্তার বিকাশ তো হয়েইছে। সবচাইতে বড় ব্যাপার মুসলমান জীবনে মধ্যবিত্তের আগমন ঘটেছে। সুতরাং ইতিবাচক পদক্ষেপে ইদ এখন সবার অনুষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে।

এখন তো মোবাইল ফোনের যুগ। ফোনেই 'মেসেজ' করে ইদ মোবারক জানানো হয়। আমার মতো অনেকেরই ফোনেই ইদের দু-দিন আগে থাকতেই এই শুভসংবাদ আসতে থাকে। আমার মেয়ে তো আমাকে ঠাট্টা করে বলে ''বাবা, তোমার ফোনে ঠিক ঠাক চার্জ দিয়ে দাও নইলে মেসেজ আসতে পারবে না।'' রাস্তাঘাটে বাসে ট্রেনে সবাই

সবাইকে ইদ মোবারক দিচ্ছেন। এখন আবার হয়েছে 'ফেসবুক' বা বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল নেটওয়ার্ক। সেখানে এ-ব্যাপারে চলছে জোর আলোচনা। কয়েক বছর থেকে দেখছি অনেকেই ইদের আগের সন্ধ্যায় 'সব বন্ধুকে ইদ মোবারক' এই কথাটি লিখে ফেলছেন। আসলে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ইদ ব্যাপারটা ঢুকে গেছে। কিন্তু এই ফেসবুকেই আমি পেয়েছিলাম এতদিনের পাওয়া শ্রেষ্ঠ অনুভবটি : '' একজন মুসলমান একজন মুসলমানকে ইদ মোবারক জানাচ্ছেন খুব ভালো, একজন অমুসলমান একজন মুসলমানকে ইদ মোবারক জানাচ্ছেন আরও ভালো, একজন মুসলমান একজন অমুসলমানকে ইদ মোবারককে জানাচ্ছেন আরও আরও ভালো, কিন্তু একজন অমুসলমান একজন অমুসলমানকে ইদ মোবারক জানাচ্ছেন তার চাইতে আর ভালো কিছু হতে পারে না।''

ইদের খাওয়াদাওয়ার কথা আগে বলেছি। তবুও ইদানীং একটা পদ সম্পর্কে না বললে বিষয়টা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। শুধু কলকাতা নয়, মফস্বল শহর বা আধা শহরে আমি বড় বড় হোর্ডিং দেখেছি এখানে উৎকৃষ্ট 'হালিম' পাওয়া যায়। আমার কাছে অনেকেই এটা কী জানতে চেয়েছেন। তাতে মুসলমান অমুসলমান সবাই আছেন। আরবি হালিম মোঘল বাদশাদের হাত ধরে অনেক আগে বঙ্গদেশে প্রবেশ করেছে। হায়দ্রাবাদ হলো হালিমের রাজধানী। নবাব বাদশাদের মন কাড়ার পন্থা ছিল উৎকৃষ্ট হালিম। এখন আমদরবারে এসে হাজির। ১০/১২ রকম ডালের সঙ্গে মাংসের মিশ্রণ এটি। সুষম খাদ্য। ক্যালোরির রাজা। কাঠের আগুনে উৎকৃষ্ট হালিম তৈরি করে। তবে যে রান্না করবে তার হাতযশ অবশ্যই থাকতে হবে। ঐ যে বলে না, তারের মধ্যে সব সুরই ঘুমিয়ে আছে—নিখিল ব্যানার্জী, রবিশঙ্কর, আমজাদ আলিরা বাজিয়ে নিতে পেরেছেন, আমরা পারিনি। মানুষের হাত এমনই। সমস্ত ইফতার পার্টিতে হালিম এখন অপরিহার্য। মুসলমান অমুসলমান বাছবিচার নেই। কতজন যে এবারও আমাকে বলেছেন, '' জানো, পার্ক সার্কাস-এর রাস্তার ধারে বড় কড়াইতে তৈরি হালিম আমার শ্রেষ্ঠ খাবার। তুমি কি একবার আসবে!'' অবশ্যই সে মুসলমান বাড়ির নয়। আগ্রহ করে বলে, ''চলো একদিন যাই।'' আমি হাসি। ও জানে না! ডাল এবং মাংস খাওয়ার কোটা আমার অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। এ জীবনে আর হলো না হালিম পাতে নেওয়া। তবে আনন্দে মন ভরে ওঠে। কাজী নজরুল ইসলামের কথা একটু ঘুরিয়ে সত্যি হয়ে উঠেছে ''একই 'হালিমে' দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।'' উভয়েরই নয়নের মণি এখন হালিম। বাঙালি মুসলমানের জীবনে এটা কম বড় প্রগতি নয়। উৎসব মানুষকে মেলাবে। ধর্ম থাকুক। কিন্তু মানুষ আর মানুষে কোলাকুলি বন্ধ হতে দেবে না উৎসব। ইদ উৎসব।

ইদুজ্জোহা বা ইদ-উল-আজহা আর একটি ইদ। পশু কোরবানি করা হয়। ত্যাগের উৎসব। ছাগল, গরু, উট, দুম্বা—সবই উৎসর্গ করা হয়। আমরা সবাই এই উৎসবে মিলিত হই সমান আনন্দে। আমার অমুসলমান বন্ধুরা কিছুটা হালকা করে বলেন 'এটা আসলে মাংস খাবার ইদ'। কার্যকারণে সেটা তাই-ই। কিন্তু ইসলামে বর্ণিত ঘটনাটি বেশ করুণ। হজরত ইব্রাহিম আল্লার উদ্দেশে সবচাইতে প্রিয় পশু কোরবানি করতে যান। কিন্তু তা গৃহীত হয়নি। তখন তাকে বলা হয় সে তার প্রিয় জিনিসকে উৎসর্গ করছে না। হতভম্ব তিনি। হঠাৎ তার শরীর কেঁপে ওঠে। তার অত্যন্ত প্রিয়—তার পুত্র হজরত ইসমাইল। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁকেই চোখ বেঁধে কোরবানি করেন। কিন্তু দেখা গেল ইসমাইল পাশে দাঁড়িয়ে আর একটি পশু জবাই অবস্থায় পড়ে আছে। বিষয়টি রূপক। কিন্তু মূল বক্তব্যটা ধরতে অসুবিধা হয় না। আমাদের দেশের স্বাধীনতায় নিজের জীবন তো কোরবানি করছেন বীর সেনানীরা।

সেইজন্য বলা হয় আসলে একটা পশু কোরবানি করা নয়—আমাদের ব্যক্তিজীবনের সব বদগুণগুলো বিসর্জন দেবার উৎসব এটা। একইভাবে সকালে ইদগাহের দিকে যাওয়া হয়। একইভাবে সাজানো হয় ইদগাহ। কিছু না খেয়েও নামাজ পড়তে যাওয়া যায়। কারণ ফিরে মাংস রান্না করে খাবার ব্যবস্থা থাকছে। কোরবানির পশুর মাংস ইচ্ছামতো ব্যবহার করা যায় না। তিনভাগের ১ ভাগ প্রাপ্য। বাকি দু-ভাগ আত্মীয় স্বজন, দুঃখী, আতুরদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। সবাই যাতে এদিন কিছুটা মাংস পান। আর দিতে হবে জাকাত। জাকাত আসলে এক ধরনের কর প্রদান। মোট সম্পত্তির মূল্যের ৪০ ভাগের ১ ভাগ বিতরণ করতে হবে। যার আয় আছে, সামান্য হলেও সম্পত্তি আছে, তাকেই জাকাত দিতে হবে। আমাদের দেশে ইচ্ছামতো জাকাত বিলি করা যায়। অথবা কোনো কোনো জায়গায় সব জাকাত এক জায়গায় করে গরিব মানুষকেও দেওয়া হয় আবার নানা ধরনের উন্নয়নের কাজেও লাগানো হয়। এখন অনেকেই এই সমস্ত টাকাপয়সা শিক্ষা প্রসার সহ অন্যান্য অনেক কাজে ব্যবহার করেন। তবে ইসলামি দেশগুলোতে জাকাতের জন্য রীতিমতো মন্ত্রী এবং তার দপ্তর আছে। জাকাত সেখানেই জমা দিতে হবে। কেন্দ্রীয়ভাবে সেগুলো বিতরণ করা হয়।

ইদানীং কোরবানি করার প্রবণতাও বেড়ে গেছে। আগেই বলেছি কিছুটা আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। একাধিক কোরবানি তো দেওয়া হয়নি। প্রতি বছরই খবর হয় কোন জায়গায় সবচাইতে বেশি দামে দুম্বা বিক্রি হয়। কোটি কোটি টাকা তার দাম। আসলে পশুটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা হয়। তারপরই এটা ঘটে।

আমাদের বাড়িতে দুপুরের সেদিনের খাবার যত না ধর্মপালন, তার চাইতে বেশি আনন্দ উৎসব। সবার বাড়িতেই এমন উৎসব আসে। আত্মীয়স্বজন তো বটেই বন্ধুবান্ধবদেরও নিমন্ত্রণ করা হয় এদিনে। মুসলমানদের এদিন ডেকে কোনো লাভ নেই। কারণ সবার বাড়িতেই মাংস। কেউ আসতে চায় না। সুতরাং অমুসলমান বন্ধুদের ডাকো। সেটাই ডাকা হয়। ছোটোবেলায় আমার স্কুলের বন্ধুরা এসে ভরিয়ে দিতো। আমার মাস্টারমশাইরা আসতেন। একটা ছোটো ঘটনা মনে পড়ে—সেটা এই ইদুজ্জোহার দিন। আমার এক সহপাঠী ঝোঁক তুললো সেও আমার মতো ইদ পড়তে যাবে। বাড়ির সবাই তটস্থ। এ কী! আমার মা বললেন কিচ্ছু হবে না—যাক্। আমার এক সেট নতুন জামাকাপড় পরে দিব্যি চললো। আমার পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো। আমি যা করছি সে তাই করছে। কোনো অসুবিধা হল না। বাড়িতে ফিরে এলাম। সবার কী হাসি। আর তখন ও ব্যাটা তো ভি.আই.পি.। আজও তাকে আমি খুঁজি। ফেসবুক তোলপাড় করি। মনে হয় কোনোদিন কোনো বিমানবন্দর বা রেল স্টেশনে পিছন থেকে ডেকে উঠবে 'মইনুল'! আমি প্রদীপের সেই ডাকের অপেক্ষায় আছি। এরকমই ছিল ইদের দিনে আমাদের উৎসব।

আজ সময় পেরিয়ে গেছে অনেক। উৎসবের মেজাজও ফিরে আসছে বারবার। বাঙালির উৎসবগুলির মধ্যে ইদ জায়গা করে নিয়েছে। যেমন নিয়েছে বড়দিন। আমার বহরমপুরের পাড়াতেও কোনো খ্রিস্টান মানুষ নেই। কিন্তু ২০ ডিসেম্বর থেকে ১০ খানা কেক বিক্রির নতুন দোকান বসে যায়। বাঙালির তুলনা মেলা ভার। ইদকেও আপন করে নিয়েছে। তবে উদার ও সহনশীল আচরণ সম্পর্ক দৃঢ় করবে। আমরা আশা করতে দ্বিধা করবো না।

বাঙালির সাহিত্যেও ইদ উৎসবের বর্ণনা নানাভাবে এসেছে। যদিও আমাদের পশ্চিমবাংলায় নামি-দামি পত্রিকা বা সাময়িকীগুলো পুজোর সময় পুজো সংখ্যা বা শারদ সংখ্যা প্রকাশ করে কিন্তু ইদসংখ্যা তেমন প্রকাশিত হয় না। মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি পত্রিকা সেটা

করে। কয়েক বছর ইদ ও শারদোৎসব প্রায় একই সময়ে হওয়ার কারণে বিশেষ সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশও করেছে। আবার অনেকের পুজো বা ইদ কোনোটাতেই সায় নেই। সেই কারণে 'উৎসব সংখ্যা' পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে। সাকুল্যে ইদ নিয়ে বিশেষ প্রকাশ করে কয়েকটি। যে-কোনো সময়ের শারদসংখ্যা পত্রিকাগুলোতে কমপক্ষে ২০০টি উপন্যাস প্রকাশ পায়। মুসলমান সমাজ বা তাদের উৎসবগুলি নিয়ে কোনো উপন্যাসে বর্ণনা কিছু থাকে বলে মনে হয় না। ৪/৫ বছর আগে আমি একবার শারদ সংখ্যাগুলির উপন্যাস খুঁটিয়ে পড়তে থাকি। প্রায় ৫০টা উপন্যাস। মাত্র তিনজনের লেখায় মুসলমান জীবনের বর্ণনা পেয়েছি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—মুসলমান কিন্তু লন্ডনে বাস করে। প্রফুল্ল রায়—পার্ক সার্কাস এলাকার মুসলমান মধ্যবিত্ত পরিবার। দ্বৈপায়ন সেন—হায়দরাবাদের মুসলমান পরিবার। বাংলার তমিজুদ্দিন অথবা আব্দুল করিমের কী হলো কারও কাছে জানা যায় নি। তবে হ্যাঁ, এমনই একবার একটা শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল মতি নন্দী-র 'বিজলীবালার মুক্তি' উপন্যাসটি। লেখাটি বই আকারে প্রকাশ হওয়ারও কয়েক বছর পর আমার এক স্নেহভাজন অধ্যাপিকাকে লেখাটার কথা বলার পর সে আশ্চর্য হয়ে বলেছিল মতি নন্দী—উনি তো খেলার কাগজে লেখেন! কী আর বলবো। এই লোকটার হাত দিয়ে বেরিয়েছে 'সাদা খাম'-এর মতো উপন্যাস।

যাই হোক, বাংলা সাহিত্যে ইদ এসেছে নানা বর্ণনায়। সেটা আরও খানিকটা বিস্তারিত ভবে বলতে চাই। ১০০ বছরেরও আগে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে লেখেন ''ব্রাহ্মণগণ প্রথমত ভাষা-গ্রন্থ প্রচারের বিরোধী ছিলেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে ইঁহারা 'সর্বনেশে' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুরাণ অনুবাদকগণের জন্য ইহারা রৌরব নামক নরকে স্থান নির্ধারিত করিয়াছিলেন।... আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বহুভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মুসলমানগণ ইরান, তুরান প্রভৃতি হইতে যে স্থান হইতেই আসুন না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণ রূপে বাঙালি হইয়া পড়িলেন। তাহারা হিন্দু প্রজামণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেবমন্দিরের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল, মহরম, ইদ, শবেবরাত প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব প্রভাব মুসলমান সম্রাটগণ লক্ষ্য করিলেন। এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাস-নিবন্ধন বাঙ্গালা তাহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল।''

মোদ্দা কথা হল, মুসলমানরা যেখান থেকেই আসুন না কেন তারা মধ্যযুগেই বাঙালি হয়ে উঠেছিল। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করছিল। সাহিত্যচর্চাও তারা করেছে। শাহ মহম্মদ সগীর থেকে মীর মোশাররফ হোসেন পর্যন্ত সাহিত্য চর্চার নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গেছে। সৈয়দ এমদাদ আলী-র কবিতার বই 'ডালি'-র দ্বিতীয় সংস্করণে ইদ নামে দুটো কবিতা আছে। এটাই বোধ হয় ইদ সম্পর্কে প্রথম কবিতা। 'ডালি' বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। কিন্তু এই বইতে কবি-র একটি মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, ''১৯০৩ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রথম বর্ষ নবনূরের ইদ-সংখ্যার প্রকাশিত। ইহাই মুসলিম বাংলার প্রথম ইদকবিতা।

কুহেলি তিমির সরায়ে দুরে
তরুণ অরুণ উঠিছে ধীরে
রাঙিয়া প্রতি তরুর শিরে।
আজ কি হর্ষভরে
আজি প্রভাতের মৃদুল বায়
রঙ্গে নাচিয়া যেন কয়ে যায়
মুসলিম জাহান আজি একতায়।
দেখ কত বল ধরে।

বেগম রোকেয়া ইদ সম্পর্কে 'নবনূর' পত্রিকাতেই একটি প্রবন্ধে লেখেন, ''আর এক কথা। শুভদিনে আমরা আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃবৃন্দকে ভুলিয়া থাকি কেন? ঈদের দিন হিন্দু মুসলমান আমাদের সহিত সম্মিলিত হইবেন, এরূপ আশা কি দুরাশা? সমুদয় বঙ্গবাসী একই বঙ্গের সন্তান নহেন কি? অন্ধকার অমানিশার অবসানে যেমন তরুণ অরুণ আইসে তদ্রূপ আমাদের এখানে অভিশাপের পর এমন আশীর্বাদ আসুক; ভ্রাতৃবিরোধের স্থানে এখন পবিত্র একতা বিদ্যমান থাকুক। আমিন।''

এই পত্রিকাতেই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্ত (১৮৬৯-১৯২৭) ১৩১১ সংখ্যায় 'ইদজ্জোহা' নামে প্রবন্ধ লেখেন। জীবেন্দুকুমার দত্ত লেখেন 'ইদ সম্মিলন' কবিতা।

বিখ্যাত কবি কায়কোবাদ লেখেন 'ইদ আবাহন' কবিতা।

আজি এ ঈদের দিনে হয়ে সব এক মনঃপ্রাণ,
জাগায়ে মোশ্লেম সবে গাহ আজি মিলনের গান।
ডুবিবে না তবে আর ঈদের এ জ্যোতিষ্মান রবি,
জীবন সার্থক হবে, ধন্য হবে এ দরিদ্র কবি।

মোজাম্মেল হক এই সময়ের আর একজন শক্তিশালী কবি। (শান্তিপুর, ১৮৬০-১৯৩৩)। 'ঈদ' কবিতায় লিখছেন—

মুসলেমের আজ ঈদ শুভময়
আজ মিলনের দিন,
গলায় গলায় মাখামাখি
আমি ফকির হীন।
আজ সবারই হস্তপুত
ধোওয়া স্বরগ নীরে?
তাই যে চুমোর ভিড় লেগেছে
নম্র নত শীরে।

আরও দু-জন কবি শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) ও গোলাম মোস্তাফা (১৮৯৭-১৯৬৪) ইদ বিষয়ক কবিতা লিখেছেন। শাহাদাৎ হোসেন-এর কবিতার বিষয়ে ও প্রকাশে তাঁর স্বভাবশোভন ধ্রুপদী বিন্যাস। গোলাম মোস্তফা অনেক বেশি কাহিনিধর্মী।

সকল ধরা মাঝে বিরাট মানবতা সুরভি লভিয়াছে হর্ষে
আজিকে প্রাণে প্রাণে যে ভাব জাগিয়াছে, রাখিতে হবে সারা বর্ষে,
এ ইদ হোক আজি সফল ধন্য
নিখিল-মানবের মিলন জন্য।
শুভ যা জেগে থাক, অশুভ দূরে যাক খোদার শুভাশিস স্পর্শে।

তারপরেই বাংলায়, বাংলার সাহিত্যজগতে ধূমকেতুর আবির্ভাব। নজরুল ইসলাম। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে, কাজী নজরুল ইসলাম-ই (১৮৯৯-১৯৭৬) ইসলামি বিষয়বস্তুর আসাধারণ সাহিত্যিক রূপ দান করেছিলেন। তাঁর লেখাতে বিষয়, বক্তব্য ও বিন্যাসের আশ্চর্যজনক মিলন ঘটেছে। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে নজরুল ইসলাম বলতে পেরেছিলেন, ''আমি মনে করি, বিশ্বকাব্যলক্ষ্মীর একটি মুসলমানী ঢং আছে।'' আরবি ফারসির এমন সুন্দর এবং দুঃসাহসিক ব্যবহার বাঙালির কল্পনার বাইরে ছিল। এ ব্যাপারে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধের কয়েকটি লাইন এইরকম : ''এই আরবি ফারসি শব্দ প্রয়োগ কবিতায় আমিই শুধু করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি করে গেছেন।... ঐ একটু শোনাবার লোভেই ঐ একটি ভিনদেশী কথার প্রয়োগে অপূর্ব রূপ ও গতি দেওয়ার আনন্দেই আমিও আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করি।... আমি শুধু 'খুন' নয়—বাংলার চলতি আরো অনেক আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। আমি মনে করি, বিশ্ব-কাব্যলক্ষ্মীর একটি মুসলমানী ঢং আছে। ও-সাজে তার শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই।... আজকের কলালক্ষ্মীর প্রায় অর্ধেক অলংকারই তো মুসলমানি ঢঙের। বাইরের এ ফর্মের প্রয়োজন ও সৌকুমার্য সকল